মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।

৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা; ফাল্গুন, ১৩০৯ সাল।

মুক্তা।

(লেখক—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।)

সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নিকট সমুদ্রের এ পারে ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কূলে ও অপর পারে সিংহলের উত্তর-পূর্ব্ব কূলে যে মুক্তা জন্মে, তাহাই ভারতের মুক্তা বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই মুক্তা নানা দেশে প্রেরিত হইয়া আসিতেছে, আর এখন পর্য্যন্ত ইহার যত আদর, সে আদর অন্য মুক্তার নাই। ভারতবর্ষের যে স্থানে লোক মুক্তা উত্তোলন করে, তাহার নাম টুটিকোরিণ। সিংহলের যে স্থানে লোক মুক্তা সংগ্রহ করে, তাহার মধ্যে প্রধান আরিপু নামক স্থান।

মুক্তা-ঝিনুক সমুদ্রের কিনারা হইতে অধিক দূরে থাকে না; পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে থাকে। সমুদ্রের ভিতর যে স্থানে মুক্তা-ঝিনুক বাস করে, সে স্থানের জল ৫০।৬০ হাতের অধিক গভীর নহে। সমুদ্র হইতে যে-সে ব্যক্তি মুক্তা তুলিতে পারে না, কারণ ইহা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। পূর্ব্বে সিংহল ও টুটিকোরিণে এই সম্পত্তি ওলন্দাজদিগের ছিল, এক্ষণে ইহা ইংরাজের হইয়াছে। কেন, ঠিক বলিতে পারা যায় না, ঝিনুকের সংখ্যা এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। সে জন্য মুক্তা-উত্তোলনকার্য্য এখন প্রতি বৎসর হয় না। শিশু ঝিনুকের ভিতর মুক্তা জন্মে না, ঝিনুকের বয়ঃক্রম অন্ততঃ পাঁচ বৎসর হইলে, তবে তাহার ভিতর মুক্তা জন্মিবার সম্ভাবনা হয়। যে স্থানে সমুদ্রের ভিতর মুক্তা-ঝিনুকগণ একত্র দলে দলে বাস করে, গবর্ণমেণ্টের লোক প্রথম সেই স্থানে জাহাজে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে,—ঝিনুক অধিক আছে কি না, ও তাহারা উত্তোলনের উপ-যোগী হইয়াছে কি না। যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়া দেন যে, অমুক তারিখ হইতে মুক্তা-উত্তোলনকার্য্য আরম্ভ হইবে।

কাত্তন মাসে এই কার্য্য আরম্ভ হয়, এক কি দেড় মাসের অধিক এ কাজ চলে না। অন্য সময়ে এ স্থানের সমুদ্র-কিনারা জনশূন্য বালুকাময় প্রান্তরের ন্যায় পড়িয়া থাকে। রাত্রি দিন বজ্র-নিনাদে পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ আসিয়া সেই বালির উপর সবলে পড়িতে থাকে। অন্য বৎসরের রাশি রাশি শুষ্ক ঝিনুকের খোলা স্তূপাকারে স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে, তাহা ব্যতীত মুক্তার চিহ্ন আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। কিন্তু মুক্তা তুলিবার সময় এই জনশূন্য বালুকাময় মরুভূমি লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়ে। তাল অথবা নারিকেল পত্র দ্বারা আবৃত শত শত কুটীর মন্ত্রবলে যেন ভূমিভেদ করিয়া সহসা উত্থিত হয়। দাঁড়ি, মাঝি, ডুবুরি, তামিল, তেলুগু, সিংহলী, গুজরাটী, মারহাটী, আরবী, পারসী, ইহুদী, দোকানি-পসারি, ক্রেতা-বিক্রেতা প্রভৃতি নানা দেশের ও নানা ব্যবসায়ের লোক দ্বারা স্থানটী পরিপূর্ণ হয়। তাহা ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের তাঁবু, পুলিসের তাঁবু, হাঁসপাতালের তাঁবু, মুক্তা জমা করিবার স্থান,—যাহাকে কোটু বলে, এইরূপ অনেকগুলি শিবিরও সেই কয়দিনের জন্য বালুকার উপর সংস্থাপিত হয়। এ অঞ্চলের অধিবাসিগণ অধিকাংশ রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। এই অল্প দিনের জন্য তাহাদের উপাসনার নিমিত্ত একটী গির্জ্জাও সংস্থাপিত করিতে হয়। ফলকথা, এই অল্প দিনের জন্য সেই সমুদ্রকূলের বালুকাময় মরুভূমি লোকে লোকাকীর্ণ হইয়া ঘোর কোলাহলে পরিপূর্ণ হয়। মুক্তা তুলিবার সময় হাঙ্গরের উৎপাত সময় সময় বড়ই হইয়া থাকে।

সমুদ্রের ভিতর যে স্থানে ঝিনুকগণ দলে দলে একত্র বাস করে, সে স্থানটী অধিক বিস্তৃত নহে,—ছয় ক্রোশ দীর্ঘে, দুই তিন ক্রোশ প্রস্থে। যে স্থানটী হইতে যে বৎসর ঝিনুক উত্তোলিত হইবে, গবর্ণমেণ্টের লোক পূর্ব্ব হইতে সে বৎসর সেই স্থানের চারিদিক বয়া দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখেন। বয়ার বাহিরে গিয়া ঝিনুক তুলিবার অনুমতি নাই। যাহাতে লোকে এই আজ্ঞা লঙ্ঘন না করে, তজ্জন্য এবং অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত, গবর্ণ-মেণ্টের তরফ হইতে এই স্থানে একখানি জাহাজ নঙ্গর করিয়া থাকে। নৌকা করিয়া ডুবুরিগণ এই স্থানে আসিয়া জলে অবতরণ করে। তিন শত কি চারি শত মণের নৌকা এই কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। প্রতি নৌকায় বার তের জন মাঝি মাল্লা ও দশ জন করিয়া ডুবুরি থাকে। যে দিনের

প্রাতঃকালে মুক্তা-উত্তোলনকার্য্য আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্ব্ব রাত্রি দুই প্রহরের সময় গুড়ুম করিয়া একটী তোপ হয়। সেই সময় মাঝি মাল্লার কচকচিতে সমুদ্র-তরঙ্গের শব্দ বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। অনেক বকাবকি ঝকাঝকির পর, তীর হইতে দূর সমুদ্র অভিমুখে নৌকা সকল গমন করিতে থাকে। সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে নৌকা সকল মুক্তা উত্তোলনের চিহ্নিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ভারতের ডুবুরিদিগের সামান্য একটু কৌপীন ভিন্ন অন্য সাজসজ্জা কিছুই নাই। বিলাতের ডুবুরিগণকে উপর হইতে নলপথে নিশ্বাস লইবার নিমিত্ত বিশুদ্ধ বায়ু প্রদত্ত হইয়া থাকে। সে জন্য তাহারা অনেকক্ষণ জলের ভিতর থাকিয়া কাজ করিতে পারে; কিন্তু দেশী ডুবুরিগণকে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কাজ করিতে হয়। তাহারা এক মিনিটের অধিক জলের ভিতর থাকিতে পারে না। কে কতক্ষণ জলের ভিতর থাকিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মাঝে মাঝে ডুবুরিদিগের লড়াই হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক কষ্ট করিয়াও দেড় মিনিটের অধিক কেহ জলের ভিতর থাকিতে পারে না। জলের ভিতর থাকিয়া এক কি দেড় মিনিট্ কালকে অতি দীর্ঘ কাল বলিয়া তাহারা অনুভব করে। উপরে উঠিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হয়, আর বলে যে,—"এত অল্প সময় আমরা জলের ভিতর ছিলাম! আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, দুই ঘণ্টা কাল আমরা সেই স্থানে অতিবাহিত করিয়াছি।" কখন কখন কোন কোন ডুবুরি, "আরও ঝিনুক সংগ্রহ করিব," এইরূপ লোভে পড়িয়া ক্ষমতার অতিরিক্ত কাল পর্য্যন্ত জলের ভিতর কাজ করিতে থাকে। অবশেষে সে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, তাহাকে তুলিবার অভিপ্রায়ে দড়ি টানিবার জন্য উপরের লোককে আর সে ইঙ্গিত করিতে পারে না। নিশ্বাস রোধ হইয়া সে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দাঁড়ি মাঝি ব্যতীত প্রতি নৌকায় দশ জন করিয়া ডুবুরি থাকে। সচরাচর দুই জন ডুবুরি এক সঙ্গে ভাগে কাজ করে। এক এক জোড়া ডুবুরির নিমিত্ত পনর ষোল সের ওজনের একখানি পাথর থাকে। দীর্ঘ একগাছি রজ্জু দ্বারা পাথরখানি বাঁধা থাকে। আর একগাছি সেইরূপ রজ্জুতে ঝিনুক রাখিবার নিমিত্ত একটী ঝুড়ি অথবা জাল বাঁধা থাকে। যে দুই ডুবুরি এক সঙ্গে কাজ করে, তাহাদের মধ্যে একজন পাথরের উপর পা রাখিয়া জলে অবতরণ করে, অপর জন দড়ি ধরিয়া নৌকার উপর বসিয়া থাকে।

জলে নামিবার সময় ডুবুরি সবলে একটী নিশ্বাস গ্রহণ করে। তাহার পর অমনই নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সে জলে নিমগ্ন হয়। নাক বন্ধ করিবার নিমিত্ত কোন কোন ডুবুরির ধাতু নির্ম্মিত একটী যন্ত্র থাকে। অন্য সময়ে সূতা বাঁধিয়া যন্ত্রটী সে গলদেশে ঝুলাইয়া রাখে। প্রতি নৌকা হইতে এইরূপে এক সঙ্গে পাঁচ জন ডুবুরি জলে নিমগ্ন হয়। পাথরের ভারে ডুবুরি সত্বর নামিয়া সমুদ্র-গর্ভে ভূমি স্পর্শ করিতে পারে। দড়ি আল্‌গা দেখিয়া উপরের লোক তাহা বুঝিতে পারে। উপরের লোক তখন পাথরখানি নৌকার উপর তুলিয়া লয়। কিন্তু অপর রজ্জুতে ঝিনুক রাখিবার নিমিত্ত যে জাল বাঁধা থাকে, ডুবুরি তাহা আপনার নিকট রাখিয়া দেয়। যখন শত শত নৌকা হইতে এক সঙ্গে শত শত লোক জলে নিমগ্ন হয়, তাহার পর যখন জলের উপরিভাগে আর তাহাদের চিহ্নমাত্রও দৃষ্ট হয় না, দর্শকের মন তখন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়। সময় এক মিনিট বটে, কিন্তু সেই সময়টুকুকে অতি দীর্ঘকাল বলিয়া বিবেচনা হয়। মনে হয় যে, এই শত শত লোক আর বুঝি কখন জলের উপর উঠিবে না।

ভূমি স্পর্শ করিয়া ডুবুরি শয়ন করে ও দক্ষিণ হাতে চারিদিক হাতড়াইয়া ঝিনুক সংগ্রহ করিতে থাকে ও সংগৃহীত ঝিনুক জালের ভিতর রাখিতে থাকে। জালের দড়ি সে বাম হাতে ধরিয়া থাকে। দক্ষিণ হস্ত ব্যতীত দুই পা দ্বারাও ডুবুরি ঝিনুক সংগ্রহ করিতে পারে। এইরূপে এক মিনিট কাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া যখন তাহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, তখন সে দড়িটী টানিয়া নৌকায় উপবিষ্ট সঙ্গীকে ইঙ্গিত করে। তাহার জুড়িদার দড়ি টানিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে উপরে তুলিতে থাকে। সেই সময় ডুবুরি নিজেও দড়ি বাহিয়া যথাসাধ্য উপরে উঠিতে থাকে। জলের উপর উঠিয়া ডুবুরি যখন নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার সঙ্গী সংগৃহীত ঝিনুকসম্বলিত ঝুড়ি অথবা জালও নৌকার উপর তুলিয়া ফেলে। তাহার পর জাল হইতে ঝিনুকগুলি বাহির করিয়া নৌকার এক পার্শ্বে পৃথক করিয়া রাখিয়া দেয়। এখন প্রথম ডুবুরি নৌকার উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে ও পূর্ব্বের ন্যায় দড়ি ধরিয়া থাকে। এবার তাহার সঙ্গী জলে অবতরণ করে। তাহার সঙ্গী শ্রান্ত হইয়া উপরে উঠিলে প্রথম ডুবুরি জলে নিমগ্ন হয়। এইরূপে তাহারা পাল্‌টা-পাল্‌টী করিয়া কার্য্য করে। যে স্থানে অর্থ, সেই স্থানেই

বাদ-বিসম্বাদ। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মার্টিন নামক এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে,—"কোন কোন ডুবুরি এরূপ দুর্ব্বৃত্ত যে, সমুদ্রতলে থাকিয়াই সে অন্য দ্বারা সংগৃহীত ঝিনুক বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে। সে জন্য সমুদ্রের ভিতরেই ডুবুরিতে ডুবুরিতে অনেকবার মারামারি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে।" ইংরেজের আমল হওয়া অবধি, কিন্তু এরূপ দুর্ঘটনা কখন ঘটে নাই। টুটিকোরিণে দুই প্রহরের সময় কিছুক্ষণের নিমিত্ত কাজ স্থগিত থাকে, তাহার পর অপরাহ্ণ চারিটার সময় সে দিনের মত কাজ একবারে বন্ধ হইয়া যায়। আরিপুতে বারটা পর্য্যন্ত কাজ হইয়া সে দিনের নিমিত্ত বন্ধ হয়। কাজ বন্ধ করিবার নিমিত্ত সেই সময় আবার একটী গুড়ুম করিয়া তোপ হয়। জলের ভিতর থাকিয়া কাজ করা অতি কঠিন কাজ, মানুষ অল্পেই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। এক এক জন ডুবুরি সমস্ত দিনে সাত আট বারের অধিক জলে নামিতে পারে না। সমস্ত দিন কাজ করিয়া এক এক জন দেশী ডুবুরি দুই হাজার ঝিনুকের অধিক উত্তোলন করিতে পারে না। সে জন্য নব আবিষ্কৃত সাজসজ্জা পরিহিত বিলাতী ডুবুরি এই কার্য্যে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত একবার পরামর্শ হইয়াছিল। বিলাতী ডুবুরি জলের ভিতর কতক্ষণ থাকিতে পারে ও কত কাজ করিতে পারে, মাদ্রাজ বন্দরে তাহার একবার পরীক্ষা হইয়াছিল। মাদ্রাজের সম্মুখে সমুদ্রে মুক্তা ঝিনুক নাই, সেই জন্য যে দুই জন বিলাতী ডুবুরি দ্বারা এই পরীক্ষা হইয়াছিল, ঝিনুকের পরিবর্ত্তে প্রস্তরখণ্ড তুলিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে আজ্ঞা করা হইয়াছিল। এক দিন চারি ঘণ্টা কাজ করিয়া তাহাদের প্রতি জন ১৮০০০ প্রস্তরখণ্ড তুলিয়াছিল। তাহাতে হিসাব হইল যে, এক জন বিলাতী ডুবুরি নয় জন দেশী ডুবুরির তুল্য কাজ করিতে পারিবে। এইরূপ অনুমান করিয়া এক বৎসর টুটিকোরিণে মুক্তা-ঝিনুক উত্তোলন করিবার নিমিত্ত বিলাতী ডুবুরি নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া তাহারা যেরূপ বাহাদুরী করিয়াছিল, প্রকৃত ঝিনুক তুলিতে তাহারা সেরূপ বাহাদুরী দেখাইতে পারে নাই। ফলকথা, বিলাতী ডুবুরির কাজে খরচ অধিক পড়িয়াছিল। সে জন্য টুটিকোরিণে বিলাতী ডুবুরি আর কখন নিযুক্ত হয় নাই। পূর্ব্বে অনেক আরব ডুবুরি পারস্য উপসাগর হইতে আসিয়া আরিপুতে কাজ করিত। যাহা হউক, প্রচুর পরিমাণে ঝিনুকের অভাব বশতঃ আজ কয় বৎসর

আরিপুতে কাজ বন্ধ ছিল। কিন্তু এবার পুনরায় এই কার্য্য আরম্ভ হইবে, এই বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। শুনিতেছি, এবার গবর্ণ-মেণ্ট আরব ডুবুরিদিগকে এ স্থানে আসিতে দিবেন না। চীনে ও জাপানি ডুবুরিও এ কাজ উত্তমরূপে করিতে পারে। সুলু ও অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের মুক্তা উত্তোলনকার্য্যে চীনে ও জাপানী ডুবুরি সচরাচর নিযুক্ত হয়।

ঝিনুকের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যায় কেন? অবশ্য প্রতি বৎসর যে লক্ষ লক্ষ ঝিনুক উত্তোলিত হয়, সে ঝিনুকগুলি বধ করিয়া তাহার উদরে মুক্তা অন্বেষণ করিতে হয়। ঝিনুকের সংখ্যা হ্রাস হইবার সে এক কারণ বটে। তাহার পর কেহ কেহ অনুমান করেন যে, জেলে মালাগণ মৎস্য ধরিবার ছলে অসময়ে এই স্থানে আসিয়া চুরি করিয়া অনেক ঝিনুক উত্তোলন করে। কিন্তু এ অনুমান বোধ হয় সত্য নহে। কারণ সমুদ্র হইতে মুক্তা তুলিয়া, তাহার ভিতর হইতে মুক্তা বাহির করা চোরের দ্বারা চুপি চুপি সম্পন্ন হইবার নহে। তাড়াতাড়ি ছুরি দিয়া খোলা খুলিয়া মাংসের ভিতর অন্বেষণ করিলে অনেক মুক্তা মানুষ দেখিতে পায় না। ঝিনুক পচাইয়া ও ধুইয়া অন্বেষণ করিলে কাজ ভালরূপ হয়। কিন্তু পচা ঝিনুক হইতে এত দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, ধরা পড়িবার ভয়ে চোর এ কাজ করিতে পারে না। কঠিন বর্ম্ম দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত হইলে কি হয়! যেমন সকল জীবের শত্রু আছে, জলের ভিতর ঝিনুকেরও সেইরূপ শত্রু আছে। এক প্রকার কীট ঝিনুকের খোলা ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে মাংসের ভিতর প্রবেশ করে; সে এক শত্রু। তাহার পর সুবন নামক এক প্রকার শামুক, কিলিকে নামক এক প্রকার সামুদ্রিক জীব, রে নামক এক প্রকার মৎস্য, এইরূপ অনেক শত্রু শিশু ঝিনুকের কোমল খোলা ভাঙ্গিয়া, তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া শুক্তিকুলকে নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করে। এই সমুদয় শত্রুই বোধ হয়, ঝিনুকের সংখ্যা হ্রাস করিবার প্রধান কারণ। যে স্থানে শত্রুদিগের উপদ্রব অধিক হয়, ঝিনুকগণ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে।

অপরাহ্ন চারিটার সময় কাজ বন্ধ হইলে, নৌকা সকল কূলে প্রত্যা-গমন করে। নৌকার প্রতীক্ষায় সেই সমুদ্র-তটে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া থাকে। তরঙ্গ দ্বারা তাড়িত হইয়া নৌকা সকল সবলে কূলে নিক্ষিপ্ত হয়। তখন আর একটী তরঙ্গ আসিয়া পুনরায় তাহাকে

ভাসাইতে না ভাসাইতে, যে স্থানে জোয়ারের জল যায় না, মালাগণ এমন স্থানে তাহাকে তুলিয়া ফেলে। পূর্ব্বে ঝিনুক-উত্তোলন-কার্য্য গবর্ণমেণ্ট ঠিকা দিয়া দিতেন। প্রতি বৎসর ঝিনুক তুলিবার অনুমতি ঠিকাদার নীলামে ডাকিয়া লইত। তাহার পর লাভালাভ তাহার অদৃষ্টে যেরূপ থাকিত, তাহাই হইত। এখন গবর্ণমেণ্ট এ কাজ আপনার খাসে রাখিয়াছেন। প্রতিদিন যত ঝিনুক উত্তোলিত হয়, গবর্ণমেণ্ট এখন তাহার এক অংশ গ্রহণ করেন। ঝিনুক বিভাগের নিমিত্ত চারিদিক বেষ্টিত একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে। তামিল ভাষায় সে স্থানকে কোটু বলে। নৌকা সকল তীরে উপনীত হইলে, ডুবুরিগণ আপন আপন ঝিনুক লইয়া কোটুতে গমন করে। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই দিনের সংগৃহীত ঝিনুককে তাহারা তিন ভাগ করে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ তাহার এক ভাগ ডুবুরিকে প্রদান করেন। অবশিষ্ট দুই ভাগ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হয়। ডুবুরিগণ আপন আপন অংশ লইয়া তৎক্ষণাৎ সমুদ্রতীরে বালুকার উপর গিয়া উপবিষ্ট হয়। ক্রেতাগণ তৎক্ষণাৎ সে ঝিনুক তাহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে। পনর হইতে চল্লিশটী ঝিনুক এক টাকায় বিক্রীত হয়। কিন্তু যে বৎসর ঝিনুকে ভালরূপ মুক্তা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া লোক বুঝিতে পারে, সেবার এক একটী ঝিনুক চারি আনায়ও বিক্রীত হয়। গবর্ণমেণ্টের দুই অংশ কর্ম্মচারিগণ গণনা করিয়া ভাগা দিতে থাকে, —এক এক ভাগায় এক এক হাজার করিয়া ঝিনুক থাকে। সন্ধ্যাবেলা এক এক ভাগ ঝিনুক নীলামে বিক্রীত হয়। ক্রেতাগণকে নগদ মূল্য দিতে হয়, মূল্য না দিয়া কেহ ঝিনুক কোটুর বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।—বঙ্গবাসী।

ফটোগ্রাফি।

ফটোগ্রাফি—বাঙ্গালায় ইহাকে আলোকচিত্র বলে। ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা ইদানীং বহু প্রকারের হইয়াছে। এই ক্যামেরাকে ছবি তুলিবার বাক্স বলা যাইতে পারে। কলিকাতায় হোয়াইট-ওয়ে-লেডলর বাটীতে এক প্রকার ছোট ক্যামেরা পাওয়া যায়, মূল্য ৭৷৵০ আনা। সরঞ্জামাদি সহিত

২৫৲ টাকা ব্যয় করিলে, ইহা দ্বারা বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করা যায়। অভ্যাস করিলে ইহা দ্বারা ভাল রূপে ছবি তোলা যাইতে পারে; নচেৎ এরূপ ক্ষুদ্র ক্যামেরা দ্বারা অস্পষ্ট ছবি উঠিয়া থাকে। এই ক্যামেরার সুবিধা এই যে, ইহা ক্ষুদ্র বলিয়া ট্রেণে অথবা গাড়িতে সঙ্গে রাখা চলে, ইহার ভিতর সাত খানা প্লেট এক সঙ্গে রাখা চলে এবং এরূপ যন্ত্র এই বাক্সের গায় সংলগ্ন আছে যে, প্রত্যেক প্লেটে ছবি তুলিয়া তাহা ভিতরে ফেলিয়া দেওয়া চলে।

প্লেটের গুণেই ছবি উঠে। ইহা বিলাতী প্রস্তুত ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র ক্যামেরার উপযুক্ত প্লেটকে (The Netta Dry Plates) নেটা-ড্রাই-প্লেট বলিয়া চাহিলে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। মূল্য সস্তা, ১২ খানা প্লেট ৸৵০ আনা, এবং ১৮ খানার দাম ১।০ আনা। ইহাতে আলো লাগিলে নষ্ট হয়। এই জন্য ইহা ক্যামেরায় পরাইবার সময় অন্ধকার ঘরে রুবি ল্যাম্প জ্বালাইয়া পরাইতে হয়। ইহা পরানও সহজ। প্লেটের মাপে একখানি টিন, ইহার দুই মাথা অল্প মোড়া, এই মোড়াতে প্লেটের কাচখানির যে দিকে মসলা আছে, অর্থাৎ যে দিক খস্‌খসে, সেই দিকটা আলোক লাগিবার দিকে রাখিয়া ক্যামেরায় সংলগ্ন করিতে হয়। ক্যামেরা এবং প্লেট দেখিলেই সংলগ্ন করিবার উপায় সহজে বুঝা যায়। রুবি ল্যাম্প অর্থাৎ লাল আলোর লণ্ঠন। মূল্য ১২৲ টাকা। কিন্তু অনেকে ইহা না ক্রয় করিয়াও অন্ধকারে প্লেট পরাইয়া থাকেন। ছবি ডেভেলপ করিবার সময়ও রুবি-ল্যাম্পের প্রয়োজন হয়, কিন্তু তাহাও অনেকে অন্ধকারে আন্দাজী করিয়া থাকেন। লাল কাচের লণ্ঠন ঘরে করিয়া লইলেও কাজ চলে এবং দামও সস্তা হয়।

তাহার পর উক্ত বাক্সের উপর এক খণ্ড কাচ আছে। সেই কাচ দিয়া দেখিয়া হস্তের উপর ক্যামেরাটী রাখিয়া, যাহার ছবি তোলা হইবে, তাহা স্থির করিয়া উহার ভিতর আসিয়াছে বুঝিয়া, উক্ত বাক্সের গাত্রস্থিত একটী কড়া ঘুরাইয়া দিলেই বাক্সের সম্মুখস্থিত ক্ষুদ্র লৌহ-চাকৃতি দ্বারা আবরিত চাকৃতি সরিয়া গিয়া সে স্থানটা গর্ত্ত হয়। এই গর্ত্ত দিয়া আলোক প্লেটে গিয়া উপস্থিত হইয়া এক্সপোজের কার্য্য শেষ হয়। ২।৫ সেকেণ্ড গর্ত্তটী খুলিয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিতে হয়। হস্ত কিংবা যাহার ছবি উঠিবে, তিনি নড়িলে ছবি নষ্ট হইয়া যায়, ভাল উঠে না।

রৌদ্রের তারতম্যে গর্ত্তটি ২ হইতে ৫ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত খোলা রাখা হয়। ক্যামেরায় দূরে দাঁড়াইলে ছবি ছোট হয়, এবং নিকটে দাঁড়াইলে অপেক্ষাকৃত বড় হয়। স্মরণ রাখিবেন, ইহা ছোট ক্যামেরা, ইহার ছবি স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র। বড় ক্যামেরায় যাঁহার ছবি তোলা হইবে, তিনি নড়িলে যেরূপ অব্যবহার্য্যরূপে ছবি নষ্ট হয়, ইহাতে ততটা হয় না।

ছবি এক্সপোজ হইলে ক্যামেরাটী অন্ধকার গৃহে আনিয়া উহা হইতে প্লেটখানি বাহির করিবেন। সাবধান! প্লেটের মসলা লাগান পিঠে যেন হস্ত না লাগে। এ জন্য সেই টিনের আচ্ছাদনটী ধরিয়া উহাকে কাচের বা তাদৃশ কোন পাত্রে (কেবল ধাতুর পাত্রে নহে) সলিউসন দিয়া ধৌত করিতে হয়। সলিউসন দুই প্রকার।

১ম প্রকার যথা,——

Pyrogallic Acid	১৬০ গ্রেণ।
Potass Bromide	১৬ গ্রেণ।
Potass Metabisulphite	১২ গ্রেণ।
Water (Boiled or Distilled)	২০ ঔন্স।

ডিষ্টিল্ড্ ওয়াটারের পরিবর্ত্তে বৃষ্টির জল কিম্বা আমরা সচরাচর কলিকাতার কলের জল ব্যবহার করি। যাহা হউক, দ্বিতীয় প্রকার সলিউসন যথা,—

Sulphite of Soda	২ ঔন্স।
Caronate of Soda	২ ঔন্স।
Distilled Water	২০ ঔন্স।

প্লেটখানি বাহির করিয়া প্রথম প্রকার সলিউসন উহাতে ঢালিয়া, প্লেটের গায়ে চারিদিকে উহা লাগিয়াছে বুঝিতে পারিলে, উহা জলে ধৌত করিয়া, তাহার পর দ্বিতীয় প্রকার সলিউসন উহাতে ঢালিয়া নাড়িলেই ছবি ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে। কিন্তু আমরা উক্ত দ্বিবিধ সলিউসন পর পর ঢালিয়া দিয়া দেখিয়াছি, তাহাতেও ছবি ফুটিয়া বাহির হয়, অথচ জলে ধৌত করিতে হয় না। সলিউসন পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত করিয়া দুইটী বোতলে রাখিতে হয়। কেবল পাইরোগ্যালিক এসিড ১নং মিশ্রে মিশাইয়া রাখা হয় না, উহা ছবি ডেভেলাপ করিবার সময় প্রত্যেক ছবিতে ৩ গ্রেণ করিয়া মিশাইয়া লওয়া হয়। সলিউসনের দ্রব্যগুলি প্রত্যেক ডাক্তারখানায় ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, মূল্যও শস্তা।

প্লেটে ছবি ফুটিয়া বাহির হইলে, তৎপরে (Soda Hydosulphite) সোডা হাইড্রোসলফেট, ইহার একটী দানা ১ ঔন্স জলে গুলিয়া তাহা ঐ প্লেটে ঢালিয়া দিলে ছবির উপর কালি পড়িয়া যায় ; তৎপরে এই জল শুকাইলে ছবি আলোকে বাহির করিলে আর নষ্ট হয় না। ইহাই নেগেটিভ ফটো। ইহা প্রায় অব্যবহার্য্য। এইবার উহাকে কাগজের উপর আনিতে হইবে। এই কাগজকে ইলফোর্ট পেপার P. O. P. বলে। একখানা এই কাগজের মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র। এই একখানা কাগজে প্লেটের মাপে অন্ততঃ ৫০ খানা ছবি উঠে। ইহাও বিলাতী-প্রস্তুত, ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। প্লেটের মাপে ইহার এক টুকুরা কাগজ কাটিয়া লইয়া, প্লেটের মসলা মাখান দিকে এই কাগজ দিয়া প্লেটখানি ফ্রেমে আঁটিয়া দিতে হয়। এই ফ্রেম কিনিতে পাওয়া যায়, মূল্য ।৶০ আনা মাত্র। ফ্রেমে আঁটিয়া প্লেটখানি রৌদ্রে ১০।১২ মিনিট রাখিলেঃ পূর্ব্বোক্ত কাচের প্লেট হইতে ছবি এই কাগজে উঠিয়া থাকে। এখন ছবিখানি পরিষ্কার দেখায়। ফ্রেম দেখিতে আর্সির ফ্রেমের ন্যায়।

শ্রীঃ—

সূতার ব্যবসায়।

কলিকাতায় তিন প্রকারের সূতা পাওয়া যায়। বিলাতী, বোম্বাই এবং দেশী সূতা। ইহার মধ্যে লাল, কালা, সবুজ, জরদ, বেগুনী, বসন্তী এবং সাদা সূতা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক রঙ্গেরই সূতা রঙ্গের বিভিন্নতানুসারে নানাবিধ আছে। কিন্তু সবুজ সূতার মধ্যে দুই প্রকার নাম আছে,—"ধানি সূতা" ও "কাই সূতা"।

বাঙ্গালার কল হইতে যে সমস্ত সূতা তৈয়ারি হয়, তাহাকে দেশী সূতা বলে ; আর বোম্বাই ও আমেদাবাদের কলে যে সমস্ত সূতা তৈয়ারি হয়, তাহাকে বোম্বাই সূতা বলে ; এবং বিলাত হইতে যে সমস্ত সূতা আমদানী হয়, তাহাকে বিলাতী সূতা বলে। ইহা ভিন্ন কানপুর ও নাগপুর অঞ্চলেও কল হইয়াছে, তাহার সূতা সর্ব্বদা কলিকাতায় বিক্রয় হয় না ; যখন হয়, তখন উহাকে ঐ দেশের নাম ধরিয়া অর্থাৎ কানপুরে বা নাগপুরে সূতা বলিয়া থাকে।

অত্যন্ত মোটা সূতাকে As it is বলে। তাহা অপেক্ষা সরুকে ৪ নং হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ যত সরু হইতে থাকিবে, ততই উচ্চ নম্বরের বলিবে; যথা—৬ নং অপেক্ষা একটু সরু ৬৷৷০ নং, ৬৷৷০ নং অপেক্ষা একটু সরু ৮ নং, ৮ নং অপেক্ষা একটু সরু ১০ নং ইত্যাদি।

১২০ হাত লম্বা সূতাকে ১৷৷০ হাত লম্বা পরিমাণে ৮০ তার করিয়া অন্য একটু সূতা দিয়া বাঁধিয়া গুচি হয়; ১০ গুচিতে ১ মোড়া হয়। সূতার নম্বর অনুসারে ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৬৷৷০, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ মোড়ায় এক বাণ্ডিল হয়। এক বাণ্ডিলে ১০ পাউণ্ড ওজন হয়। কোন গাঁট ৩০ বাণ্ডিলে, কোন গাঁট ৪০ বাণ্ডিলে, কোন গাঁট ৫০ বাণ্ডিলে হয়; অতএব ৩০, ৪০ ও ৫০ বাণ্ডিলে এই তিন প্রকার গাঁইট হয়।

দেশী সূতা ও বোম্বাই সূতা প্রায় একই রূপ। ৪ নং সূতার ৪ মোড়ায় বাণ্ডিল হয়, ৬ নং সূতার ৬ মোড়ায় বাণ্ডিল হইবে, ৬৷৷০ নং সূতার ৬৷৷০ মোড়ায় বাণ্ডিল হইবে, এইরূপ যত নম্বর তত মোড়ায় বাণ্ডিল হইবে। মধ্যে মধ্যে উক্ত ১৷৷০ হাত লম্বা পরিমাণের ৮০ তারযুক্ত এক গুচির, ৫ গুচিতে মোড়া বাঁধিয়া যত নম্বরের সূতা তাহার দ্বিগুণ মোড়া করিয়া বাণ্ডিল বাঁধা হয়, ইহাকে আধ্‌লা মোড়া বলে। পূরা মোড়ার বাণ্ডিলে ১০ পাউণ্ড ওজন হইবে, ও আধ্‌লা মোড়ার বাণ্ডিলেও ১০ পাউণ্ড ওজন হইবে। তবে পূরা মোড়ার বাণ্ডিলে যত মোড়া থাকিবে, আধ্‌লা মোড়ার বাণ্ডিলে তাহার দ্বিগুণ মোড়া থাকিবে।

বোম্বাই, আমেদাবাদ, নাগপুর, কানপুর ও বাঙ্গালায় ৪ নং হইতে ৪০ নং পর্য্যন্ত সূতা হইয়া থাকে। নম্বরের পৃথক্ পৃথক্ নাম, যথা—৪ নং, ৬ নং, ৬৷৷০ নং, ৮ নং, ৮৷৷০ নং, ১০ নং, ১০৷৷০ নং, ১১ নং, ১২ নং, ১২৷৷০ নং, ১৩ নং, ১৪ নং, ১৪৷৷০ নং, ১৫ নং, ১৬ নং, ১৬৷৷০ নং, ১৭ নং ১৮ নং, ১৯ নং, ২০ নং, ২০৷৷০ নং, ২১ নং, ২২ নং, ২৪ নং, ২৬ নং, ২৮ নং, ৩০ নং, ৩২ নং, ৩৪ নং, ৩৬ নং, ৪০ নং। কলিকাতায় আমরা এই সকল নম্বরের সূতা প্রায়ই বিক্রয় করি।

বিলাতি সূতা কলিকাতায় ৩০ নং হইতে ২৫০ নং পর্য্যন্ত আমদানী হইয়া থাকে। তবে কেবল মাত্র ২০ নং লাল সূতা আইসে, ইহা ভিন্ন ৩০ নং নিম্নের নম্বর আইসে না।

কলওয়ালারা বা উহাদের এজেণ্টরা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীরূপ দরে বিক্রয় করে। কেহ মোড়ার উপর দর করে, কেহ পাউণ্ডের উপর দর করে, কেহ

বাণ্ডিলের উপর দর করে, কেহ গাঁটের উপর দর করে। যথা ।॰ পাউণ্ড অর্থাৎ ২॥॰ টাকা বাণ্ডিল ; ।॰ মোড়া হইলে, যত নম্বরের সূতা তত মোড়ার হিসাবে দর ধরিয়া বাণ্ডিলের দর পড়তা করিতে হয়। ১৬ নং সূতার ।॰ মোড়া হইলে ৪৲ বাণ্ডিল হয় ; যাহাদের যে নিয়ম আছে, তাহাদের সেই নিয়মেই বিক্রয় হইয়া থাকে। সূতাপটীতে বাণ্ডিল হিসাবে দর হয়। ইহার মধ্যে আর একটা কথা আছে, বাণ্ডিল ৴৫ অর্থাৎ ১০ পাউণ্ড হয় ; কিন্তু অৰ্দ্ধ বাণ্ডিলের বাণ্ডিল বলিয়া দর হয়। মনে করুন, কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ১৬ নং কি দর ? দোকানদার বলিল ২৲, কিন্তু দাম দিবার সময় ৪৲ দিয়া একটা বাণ্ডিল লইল। এই সকল সূতায় এদেশী কাপড়, গালিচা, তোয়ালে ইত্যাদি হয়। আমরা কন্‌ট্রাক্ট করিয়া কল হইতে এবং বিলাতী সূতা হইলে আফিস হইতে মাল লই। টাকা দিবার মুদ্দৎ আছে। এ ব্যবসায়ে ২ শত হইতে ২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত খাটান যায়। সূতাপটীতে ২০।২২ ঘরে ইহার বড় কারবার আছে।

শ্রীঅমূল্যচরণ শ্রীমানী।

সাং সূতাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা।

একথা পূর্ব্বেই ব'লেছি।

আমরা সামান্য নগণ্য প্রজা। বড়লাট বাহাদুরের সঙ্গে আমরা কিছু পরামর্শ করি নাই, অথচ তিনি সেদিন "বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স" নামক জগদ্বিখ্যাত বণিক্-সভায় দেশের লোককে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা বিগত আশ্বিন মাসে (দ্বিতীয়বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মহাজনবন্ধু) বলিয়াছি। "ইংলণ্ড, জার্ম্মনী, আমেরিকা ভারতের শস্য শুষিয়া লইয়া গেল, এ কথায় ভারতবাসী কেহই কর্ণপাত করিও না। কারণ ঐ সকল মহাদেশের মহাজনেরা শস্য ও টাকা শুষিতে আসেন না, তোমাদের উপকার করিতেই আইসেন। বস্তুতঃ, উহাদের সঙ্গে বাণিজ্য না চলিলে ভারতবর্ষ একটা পল্লিগ্রামের মত হইয়া থাকিত। ধান্য, গম ইত্যাদি যে দ্রব্য বিদেশে বাহির হইয়া গেলে, তোমরা বল 'আমাদের সর্ব্বনাশ হইল' উহার মূল্য বৃদ্ধি হইলে উহাই আবার ঐ সকল বিদেশীয় বণিকগণ অন্য দেশ হইতে

তোমাদের আনিয়া দিবেন।" আমাদের বড়লাট কার্জ্জন বাহাদুরও ঠিক ঐ ধরণের কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

Gentlemen, to me the argument that the influx of foreign capital into India, is a source of improverishment, and it drains away the wealth of the country, has always seemed to me a foolish and a dangerous illusion; **foolish, because it** ignores the rudiments of economic science; dangerous, because it is calculated to retard the developments which it has in view.

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—"বিদেশী বণিকেরা এদেশের অর্থ শোষণ করিতেছে, একারণ দেশের লোক দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বোকা বা নির্ব্বোধ এবং তাঁহাদের অতিবুদ্ধি ভয়ঙ্করী। অতিবুদ্ধি, কেননা, তাঁহারা অর্থনীতি শাস্ত্রে যে সুপণ্ডিত, ইহা দেশের লোককে বুঝাইতে যান, কিন্তু ইহা বুঝেন না যে, এরূপ বলাতে ধনাগমের পথ সংকীর্ণ হইয়া যায়; এজন্য আমি এরূপ ভাবকে বিপজ্জনক মনে করি।" সকল শেয়ানার একই কথা। মানুষ সত্য কথা পাইলে সহজেই নত হয়; সত্যের প্রতিবাদ হয় না। এ দেশের কর্ম্মী পুরুষেরা ইহা মনে করেন না যে, ঐ গেল গেল। দেশের সর্ব্বনাশ হইল! বিদেশী বণিকে দেশের শস্য লুঠিয়া লইয়া গেল। অব্যবসায়ী কয়েকখানা সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেরাই উহা প্রচার করেন। এজন্য ভারতের অপরাপর মহাত্মারা দোষী নহেন।

সিপমেণ্ট না হইলে ভারতের কোন কার্য্যই ভাল চলে না। কেবল ভারত কেন, কোন দেশের বাণিজ্য চলে না। এই যে জবাকুসুম তৈল, কুন্তলীন বা বিজয়া বটিকা, এদেশে যাহা বিক্রয় হইতেছে, উহা জর্ম্মণ, আমেরিকা, ইংলণ্ডে চালান দিন, তথায় এজেণ্ট করুন, লক্ষ লক্ষ প্যাকেট উহা পাঠান, দেখিবেন, ঐ সকল কার্য্যেই তখন এদেশী সহস্র সহস্র লোক প্রতিপালিত হইবে— কাজ এত বাড়িবে। মালের কাট্‌তি না থাকিলে চাষারা উহার আবাদ করে না। পূর্ব্বে ভারতে যে গুড় হইত, এখন আর তত গুড় উৎপন্নই হয় না; কেননা, এখন চিনির সিপ্‌মেণ্ট নাই, দেশী চিনির কাট্‌তি নাই, কাজেই উহার চাষ কমিয়াছে। পাটের চাষ বৃদ্ধি হইতেছে, ক্রমে এদেশী শণের চাষও বাড়িবে। কেননা, ইহার সিপ্‌মেণ্ট আছে। সিপ্‌মেণ্টের

কাজ যাহাতে বৃদ্ধি হয়, দেশের লোকের সে পক্ষে চেষ্টা করা আবশ্যক। কাজ না করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেও আমাদের ক্ষতি। এখন আমাদের ক্ষতির দশা! তখন এই ক্ষতিটা দেশের দরিদ্রদিগের বাক্সে তুলিয়া দিই না কেন? লক্ষ লক্ষ শিল্প-সমিতি বা নূতন বাজার বা নূতন হাট বসাইলে কিছুই এদেশের পক্ষে হিতকর হইবে না। বাহিরে আগুণ লাগিয়াছে, আর ঘরের ভিতর চণ্ডীপাঠ করিলে উহা থামিবে না। এখন দম্‌কলের সময়।

দেশের মহারাজা, রাজা প্রভৃতিরা ২।৫ লক্ষ করিয়া টাকা চাঁদা দিউন। কংগ্রেস সমিতির হস্তে এই টাকা থাকুক, অথবা গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইহা রক্ষা করুন। এই টাকা দিয়া এদেশী লক্ষ লক্ষ মুদ্রার সার্ট, জামা, সাবান, দেশালাই, বিস্কুট, খেলানা, পেটেণ্ট ঔষধ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া চলুন, জাহাজে বোঝাই করিয়া জর্ম্মণী লইয়া গিয়া তাহাদের বাজার দর অপেক্ষা শস্তায় বিক্রয় করিয়া আসি। ইহাতে না হয় ২।৫ বার লোকসান দিব, লোকসান না করিলে কোথায় জয়লাভ হয়? ২।৫ বার ক্ষতি দিয়া তাহাদের চমক্ লাগাইয়া না দিলে, এদেশী কাজের—এদেশী ব্যবসায়ের মঙ্গল নাই।

সোনার টাকা।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ফরাসীর সহিত জর্ম্মণের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ফরাসী পরাজিত হইয়া জরিমানা স্বরূপ জর্ম্মণ-সম্রাটকে ২ শত কোটি টাকার স্বর্ণমুদ্রা দিতে হয়। এই স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া জর্ম্মণ-সম্রাট স্বদেশে সোনার টাকা প্রচলিত করেন। শুনা যায়, ইহার পূর্ব্বে জগতে আর কোথাও সোনার টাকার চলন ছিল না। এখন ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই স্বর্ণমুদ্রার আদর হইয়াছে।

ইউরোপ-খণ্ডে স্বর্ণ কাট্‌তি হইবার এই নূতন পথ বাহির হওয়াতে দশ বৎসর মধ্যে পূর্ব্বে যে দর সোনার ছিল, তদপেক্ষা স্বর্ণের দর বা দাম বৃদ্ধি হইল। জগতে স্বর্ণের খনির কাজও বাড়িল। দশ বর্ষের মধ্যে ইউ-রোপে ইহার চলন অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। ইংলণ্ড সোনার টাকায় মজিল। নচেৎ ইহার পূর্ব্বে তাম্র এবং রৌপ্য মুদ্রাই জগতের সর্ব্বস্থানেই প্রচলিত ছিল। এখনও যে নাই, তাহা নহে। এখনও ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা,

অষ্ট্রেলিয়া, জর্ম্মণ প্রভৃতি সকল দেশেই রৌপ্য এবং তাম্রমুদ্রার চলন আছে। আমাদের দেশে যে রৌপ্যখণ্ডকে আমরা আধুলি বলি, বিলাতে উহাকে শিলিং বলে। কিন্তু আধুলিকে আমরা আট আনা ধরি, বিলাতে ঐ আধুলির মত রৌপ্যমুদ্রাকে ৷৵০ বার আনা ধরা হয়। এখানকার ১৫৲ টাকায় বিলাতী ১ পাউণ্ড হয়। ১ পাউণ্ড অর্থাৎ ১ খানা গিনি। আমরা সোনার টাকাকে গিনি বলি, বিলাতে উহাকে পাউণ্ড বা সাভারিণ বলে। তাম্রের পাই উক্ত সকল প্রদেশে প্রচলিত আছে। আমাদের ৪ পয়সায় এক আনা হয়, উহাদের ১২ পয়সায় এক আনা হয়। এই পাই দেখিতে রৌপ্যের দুয়ানির মত ক্ষুদ্র, কিন্তু পুরু এবং তাম্র-নির্ম্মিত। ইহা কলিকাতার প্রায় সমুদয় আফিসেই ব্যবহৃত হয়।

যাহা হউক, পাশ্চাত্যপ্রদেশের টাকা সোনা হইয়া যাওয়াতে সোনার দর বাড়িল, রূপার অনাদর ঘটিল। প্রত্যেক রাজ্যেই রাজা কর্ত্তৃক মুদ্রার দর বাঁধা। কিন্তু মুদ্রা যে রৌপ্য দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহার দর কিন্তু সাধারণের বাজারে! রূপার দর অতিরিক্ত হ্রাস হওয়াতে এখন যেমন কলিকাতায় ১ শত ভরি রূপা ৬০৲ ৬৫৲ টাকায় পাওয়া যায়, (১ শত ভরি ৬০৲ বা ৬৫৲ টাকা হইলে ১ ভরির মূল্য কত হয়, বলুন দেখি?) কিন্তু আমাদের টাকা ১ ভরি হইলেও উহা আমরা ষোল আনায় লইয়া থাকি। কেন না, ইহা রাজার আদেশ! ফরাসি দেশে রাজা নাই। একটী বৃহৎ সভার সভাপতিই সে দেশের রাজা, তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট কহে। প্রেসিডেণ্টের পরিবর্ত্তন হইলেই রাজারও পরিবর্ত্তন হয়। প্রথম এই দেশেই সর্ব্বাগ্রে প্রজারা আপত্তি করে,—রূপার দর কমিলে, চিহ্নিত মুদ্রার দরও কমিবে। ক্রমে এই নিয়ম ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল, ভারতে কিন্তু ইহা হইল না। এখানে ইংরাজ-রাজের চিহ্নিত মুদ্রার দর পড়ে না। অথচ এদেশে তখন স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয় নাই। গিনি ছিল বটে, কিন্তু তাহা এদেশবাসীরা অলঙ্কার প্রভৃতির জন্য ব্যবহার করিতেন।

ভারতের রাজস্ব রূপার টাকায় আদায় হইত, এবং ইহা বিলাতে পাঠাইলে, তথাকার রূপার বাজার অনুসারে ভারতের টাকা গ্রহণ করা হইত। ইহাতে অধিকাংশ সময়ে ক্ষতি হইত। ইহাকেই বাটা-বিভ্রাট কহে। এই বাটা-বিভ্রাট হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিলাত গবর্ণমেণ্টকে অনেক কথা বলেন, এবং যাহাতে ভারতের এই ক্ষতি সহ্য করিতে

না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন। কিন্তু সে সময় কোন ফল হয় নাই। বিলাতে রূপা শস্তা। তখন ভারতে রূপার দর বৃদ্ধি ছিল, না থাকিলেও ভারতে রূপার টাকা ষোল আনা! এবং তখন ভারতীয় টাকশালায় এমন কিছু আইন ছিল না যে, প্রজারা অথবা এদেশের মহাজনেরা টাকা করিতে পারিবে না। কাজেই সেই সময় কলিকাতার অনেক ব্যাঙ্কওয়ালারা এবং এদেশী মহাজনেরা বিলাত হইতে রৌপ্য ক্রয় করিয়া আনিয়া টাকশালায় টাকা করাইতে লাগিলেন। তখন বৃটিশ ধনবান্ প্রজারা টাকা প্রস্তুত করাইলে, সে টাকায় "মহারাণীর মুখ" দিতেন এবং গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর প্রত্যেক টাকায় বাজালা অর্দ্ধ আনা বা দুই পয়সা খাদ এবং বাণীর স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ভারতীয় মিত্র-রাজ্যের রাজাদিগের টাকা টাকশালায় প্রস্তুতি হইলে, সে টাকায় সেই রাজ্যের রাজার মুখ অঙ্কিত করা হইত। যাহা হউক, একাজেও দেশী মহাজনেরা কিছু কিছু লাভ করিতেছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরদিগকে রূপার আদর বাড়াইতে কহেন। কেন না, সে সময় তাঁহার নিকট অতিরিক্ত রৌপ্য মজুত হইয়াছিল। এমন কি রৌপ্যের দর ক্রমশঃ কমিতেছে দেখিয়া, মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট অনেক রৌপ্য ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, দর বৃদ্ধি হইবে, লাভ করিবেন; কিন্তু ফলে তাহা হয় না দেখিয়া, অন্যান্য গবর্ণমেণ্টকে রূপার আদর বাড়াইতে কহেন। কিন্তু সে সময় কে তাঁহার কথা শুনিবে? কেহই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। কাজেই তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মজুত রূপা যে-সে দরে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। রূপার বাজার আরও মাটী হইল! সেই বার ভারতের টাকা বিলাতে গিয়া খুব ক্ষতি হইল! এ ক্ষতি সহ্য করিবে কে? কাজেই ভারত গবর্ণমেণ্টের কথায় ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টকে মত স্থাপন করিতে হইল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই আইন হইল যে, "ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ওয়ালারা অথবা মহাজনেরা টাকশালায় আর টাকা প্রস্তুতি করাইতে পারিবেন না, কিন্তু মিত্র বা করদরাজ্যের রাজারা ইচ্ছা করিলে ভারতীয় টাকশালায় টাকা তৈয়ারী করাইতে পারিবেন। ভারতে সোনার টাকার মাপ চলিবে। ভারতের ১৫৲ টাকায় বিলাতের ১ পাউণ্ড ধরা হইবে। ভারতের ৷৵০ বার আনায় বিলাতের ১৲ শিলিং ধরিতে হইবে।" এই আইন এখনও চলিতেছে।

ইহা দ্বারা বিলাতি হুণ্ডি এবং এক্সচেঞ্জ করিবার সুবিধা হইয়াছে। ভারতে সোনার টাকা চলিয়াছে। পোষ্টাপিস দ্বারা সর্ব্বপ্রথম সাজালিশ এদেশে

চালান হয়, এখন করেন্সি দ্বারা চলিতেছে। সুবর্ণমুদ্রা প্রচলনের আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপরে যাহা বলা হইল, এ সম্বন্ধে এখনও এদেশীয় অনেক বিজ্ঞ মহোদয়েরাও ইহার যুক্তিহীন প্রতিবাদ করেন। ইঁহাদের মতে ভারত দরিদ্র! অতএব দরিদ্রদেশে সোনার টাকা প্রচলন অসম্ভব। কেন না, রূপা শস্তা হইলে, এদেশীয় দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত লোকেরা যাহা কিছু রূপার অলঙ্কার করিয়া সঞ্চয় করিতেন, তাহা আর করিবেন না। আমরা বলি, শস্তা রূপা ক্রয় করিয়া অতিরিক্ত রৌপ্যালঙ্কার করুন না কেন? ভারত দরিদ্র কি ধনী, তাহাও বুঝা উচিত। এক পক্ষ ধরিয়া কোন বিষয় মীমাংসা করিতে নাই। যে ভারতের লোক অনেকে দুই বেলা পূরা আহার করিতে পান না, সেই ভারতেই আবার অনেক লোকের টাকায় ছাতা পড়িতেছে!! সমুদয় দেশেরই এইরূপ অবস্থা।

ঔষধের ব্যবসায় শিক্ষা।

যে পুস্তক দ্বারা ঔষধের যথাযথ বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং ঔষধ-ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা করা যায়, তাহাকে "ভৈষজ্য-বোধ" বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে ইহাকে "মেটিরিয়া মেডিকা" বলে।

মেটিরিয়া মেডিকা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা,—

(১) ঔষধ দ্রব্যের বিশুদ্ধতা এবং অপরিশুদ্ধতা নির্ণয় করা। ইহাকে ইংরাজীতে "প্রপার মেটিরিয়া মেডিকা" বলে।

(২) ঔষধ দ্রব্যকে বিবিধ প্রকারে প্রস্তুতি করা ; যেমন ৪।৫টি বা ততোধিক ঔষধ একত্র করিয়া একটী ঔষধ বা মিক্সচার করা এবং মিক্সচারের দোষ-গুণ নিরূপণ করা। এই বিদ্যাকে "ভৈষজ্য-সংস্কার" বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে ইহাকে "ফার্ম্মেসী" কহে। এজন্য ডাক্তারখানাকে ফার্ম্মেসী বলা যায়।

(৩) কোন্ ঔষধ দেহের ভিতর কোন্ যন্ত্রের উপর কার্য্য করে, তাহা নির্ণয় করাকে "ঔষধের ক্রিয়া" বলে। ইংরাজীতে ইহাকে "ফার্ম্মাকোলজি" কহে।

(৪) রোগে ঔষধ-প্রয়োগ-বিষয় জ্ঞানকে আমরা "আময়িক প্রয়োগ" বলি। ইংরাজীতে ইহাকে "থিরাপিউটিক্স" বলে।

ইহা ভিন্ন ভৈষজ্য-বোধের ভিত্তিতে আরও তিনটী বিদ্যা আছে। উক্ত তিনটী বিদ্যাও যত্নের সহিত শিক্ষা করিতে হয়। যথা,—উদ্ভিজ্জ-তত্ত্ব (বোট্যানি), প্রাণী-তত্ত্ব (জুলজি) এবং রসায়ন-বিদ্যা (কেমিষ্ট্রি)। অধিকন্তু আরও চারিটী বিষয় মেটিরিয়া মেডিকাতে কিছু কিছু বলা হইয়াছে। যথা,—

(১) জলৌকা-প্রয়োগ, বাটি বসান, রক্ত মোক্ষণ, ব্যাণ্ডেজ, বাড় বাঁধা (স্প্লিণ্ট), সেলাই, ঘর্ষণ এবং ম্যাসেজ বা গা' হাত-পা টেপা। এ গুলিকে ইংরাজীতে "মেক্যানিক্যাল" বিভাগ কহে।

(২) অনেক সময় রোগ বিশেষে উত্তাপ, আলোক, শৈত্য এবং তাড়িত ব্যবহৃত হয়। ইহাকে "ফিজিক্যাল" বিভাগ কহে।

(৩) পথ্য বিধান। এই বিভাগকে ইংরাজীতে "ডায়েটেটিক" কহে। অনেক রোগ ঔষধ না দিয়া কেবল পথ্যের তারতম্যে ভাল করা যায়। বিশেষতঃ অজীর্ণ-শ্রেণীর অনেকগুলি রোগ কেবল পথ্য বিধানে ভাল হইয়া থাকে। মধুমূত্র রোগও পথ্যবিধানে অনেকটা ভাল হয়।

(৪) রোগীর গৃহ, পরিধেয় এবং স্নান, এই বিভাগকে "হাইজিনিক" বলে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল এ্যাক্ট অনুযায়ী গ্রেট-বৃটনে যে ফার্ম্মাকোপিয়া প্রচলিত হয়, তাহাকে "বৃটিশ-ফার্ম্মাকোপিয়া" বলে। ফার্ম্মাকোপিয়া অর্থে ঔষধ প্রস্তুত করিবার পুস্তক বিশেষ। রাজাদের দ্বারা উহা নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয়। আমাদের ফার্ম্মাকোপিয়ার মত,—ইতালি, গ্রীস, ফরাসি প্রভৃতি দেশ হইতেও উহা বাহির হয়। ইতালি হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাকে ইতালিয়ান ফার্ম্মাকোপিয়া বলে; ঐরূপ গ্রীস এবং ফরাসি ফার্ম্মাকোপিয়া আছে। আমাদের দেশে বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার মতে ঔষধ প্রস্তুত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ডাক্তারী ওজন।

২০ গ্রেণে	১ স্ক্রুপল।
৬০ গ্রেণে	১ ড্রাম।
৮ ড্রামে	১ ঔন্স।
১২ ঔন্সে	১ পাউণ্ড।

গুঁড়া ঔষধ ওজনের জন্য নিক্তি দ্বারা গ্রেণ এবং ড্রামের বাটখারায় উহা ওজন হয়, কিন্তু দ্রব ঔষধ ওজন-মাপের গ্লাসের দ্বারা সাধিত হয়।

বাঙ্গালায় ফোঁটা, ইংরাজীতে ড্রপ্‌স্ এবং ল্যাটিনে মিনিম বলে। মিনিম বা ফোঁটা বা গ্রেণ একই হিসাবে ধরা হয়। যেমন ৬০ গ্রেণে ১ ড্রাম, সেইরূপ ৬০ মিনিমে বা ৬০ ফোটায় ১ ড্রাম হইয়া থাকে।

৬০ মিনিমে	১ ড্রাম।
৪ ড্রামে	অর্দ্ধ ঔন্স।
৮ ড্রামে	১ ঔন্স।
৩২ ড্রামে	৪ ঔন্স।
৫ ঔন্সে	সিকি পাইণ্ট।
১০ ঔন্সে	অর্দ্ধ পাইণ্ট।
২০ ঔন্সে	১ পাইণ্ট।

অনেকে ড্রাম ঔন্স বুঝিতে না পারিয়া, আমাদের প্রচলিত ওজনের হিসাবে ড্রাম ঔন্স কত হয়, তাহা জানিতে চাহেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্ত উহার বাঙ্গালা হিসাব দিতেছি,—

১ ড্রামে বা ৬০ ফোঁটায়	সিকি কাঁচ্চা।
৪ ড্রামে	১ কাঁচ্চা।
৮ ড্রামে বা ১ ঔন্সে	অর্দ্ধ ছটাক।
২ ঔন্সে	১ ছটাক।
৪ ঔন্সে	অর্দ্ধ পোয়া।
৮ ঔন্সে	১ পোয়া।
১৬ ঔন্সে	অর্দ্ধ সের।
২০ ঔন্সে	আড়াই পোয়া বা ১০ ছটাক।
২ পাইণ্টে	/১৷০ পোয়া।
৪ পাইণ্ট বা অর্দ্ধ গ্যালনে	/২৷৷০ সের।
৮ পাইণ্ট বা এক গ্যালনে	/৫ সের।

---

১ কুঁচে	২ গ্রেণ মোটামুটি ধরা হয়,
কিন্তু ৮ কুঁচে	১৫ গ্রেণ ইহা ঠিক ;
৩২ কুঁচে	৬০ গ্রেণ (১ ড্রাম)।

পরন্তু এই কুঁচের ওজনকে কবিরাজেরা রতি বলেন, এবং প্রচলিত এদেশীয় টাকাকে তোলা বলেন।

৬ রতিতে বা ৬ কুঁচে	এক আনা।
এক রৌপ্য সিকিতে	৪৫ গ্রেণ।
এক আধুলি	৯০ গ্রেণ।
এক টাকা বা তোলা	৩ ড্রাম।

অধিকাংশ ব্যবস্থাপত্রে রোমীয় "এক" "দুই" ব্যবহৃত হয়। উহা সচরাচর ঘড়ির এক দুইয়ের সহিত মিলে। রোমভাষার অঙ্ক,—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০
XX	XXX	XL	L	LX	LXX	LXXX

৯০	১০০	৫০০	১০০০
XC	C	D	M

ব্যবস্থাপত্রের বা প্রেস্‌ক্রপ্‌সনের সাঙ্কেতিক চিহ্ন; যথা,—

বিন্দু	চিহ্ন gtt.
মিনিম	„ m.
গ্রেণ	„ gr.
ড্রাম	„ ʒ
অর্দ্ধ ড্রাম	„
ঔন্স	„
স্ক্রুপল	„ ℈
অর্দ্ধ গ্রেণ	„ grss.
Q. S.	যথা প্রয়োজন
পাউণ্ড	„ lb
ss	অর্দ্ধেক
ana বা aa	প্রত্যেক
ad	সর্ব্বসমেত

অনেক স্থলে বিশেষতঃ সাহেবদের ব্যবস্থায় ঔষধ খাইবার আজ্ঞায় চামচের মাপে সেবন-বিধি অনেকে দিয়া থাকেন। অতএব চামচের মাপ দেওয়া গেল।

এক চা-চামচ	১ ড্রাম।
„ ডেজার্ট চামচ	২

এক টেবল চামচ	৪ ড্র্যাম।
,, ওয়াইন গ্লাস	১॥০ হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত।
,, চা-পেয়ালা	৫ ঔন্স।
,, টাম্বলার বা গ্লাস	১০ হইতে ১২ ঔন্স।

"স্পুন" অর্থে চামচ। বড় চামচে সাহেবেরা ভাত খান। তাহাকে টেবল চামচ বলে। মাঝারি চামচে সাহেবরা মিষ্ট খান, তাহাকে ডেজার্ট চামচ বলে। ছোট চামচে তাঁহারা চা খান, তাহাকে টী-স্পুন বা চা-চামচ বলে। যে গ্লাসে করিয়া আমরা সচরাচর ঔষধ খাই, সাহেবেরা উহাতে মদ্যপান করেন; এজন্য উহাকে "ওয়াইন গ্লাস" বলে।

৬০ ফোঁটায় ১ ড্র্যাম হয়। কিন্তু অনেক ঔষধ ৬০ ফোঁটায় এক ড্র্যাম নহে। কোন্ ঔষধ কত ফোঁটায় ১ ড্র্যাম হয়, তাহার তালিকা,—

পরিস্রুত জল	৪৫	ফোঁটায়	১	ড্র্যাম।
লবণ দ্রাবক	৫৪	,,	,,	,,
গন্ধক দ্রাবক	৯০	,,	,,	,,
সুরা	১৩৮	,,	,,	,,
ইথার	১৫০	,,	,,	,,
টীংওপিয়াই	১২০	,,	,,	,,
হাইড্রোসিয়ানিক এসিড	৪৫	,,	,,	,,

(ক্রমশঃ)

লবণের ডিউটী হ্রাস।

সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুর ভারত-সম্রাট হইয়াছেন; এই উপলক্ষে বিগত ১৮ই মার্চ্চ হইতে লবণের ডিউটী নিম্নলিখিত হারে কম হইয়াছে,—

ভারতে মণকরা ২॥০ টাকা ছিল, ২৲ টাকা হইয়াছে।

কোহাটের লবণ শৈলের মণকরা ২৲ ছিল, ১॥০ টাকা হইয়াছে।

মণ্ডীর খাঁটি অর্থাৎ "র" লবণের মণকরা ।৶১০ কর ছিল, ।৵০ আনা হইল॥

ব্রহ্মে ছিল ১৲ টাকা, কিন্তু ইহা কমে নাই, সেই ১৲ টাকাই রহিয়াছে।

১৮৮২ অব্দে ভারত-গবর্ণমেন্ট লর্ড রিপণ বাহাদুর ভারতের লবণ-শুল্ক

এইরূপ মণকরা আট আনা কমাইয়াছিলেন। সে বার লর্ড রিপণ বাহাদুরের অর্থ-সচিব মেজর বেয়ারিং যখন লবণ-কর হ্রাস করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন "লবণ-কর কমান হইল বটে, কিন্তু আয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলেই আবার এ কর যাহা কমান হইল, তাহা বৃদ্ধি করা হইবে।" এবারও লর্ড কার্জ্জন বাহাদুরের অর্থ-সচিব সার এডওয়ার্ড সাহেব সেই ভাবের কথাই বলিয়াছেন।

সন ১৩০৯ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর লবণ শুল্কে মণকরা ২॥০ টাকা বা ৫ আধুলীর হিসাবে কর গ্রহণ করিয়া প্রায় ১১ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। এবার লবণে ১ আধুলি মণকরা আয় কমিবে। এই কর হ্রাস হওয়ায় ইংলণ্ডের পোর্ট ভিন্ন অন্য পোর্টের লবণ ভারতে না আসিলেই মঙ্গল। এই জন্যই ত ভারতে লবণ-শুল্ক মণকরা ২॥০ টাকা ছিল।

যাহা হউক, লবণের মাশুল কমাইয়া দেওয়ায় এদেশীয় মহাজনের যে সকল লবণ গুদামে মজুত ছিল, তাহাতে রীতিমত ক্ষতি হইবে। মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্রাট হওয়াতে ইহাদের আনন্দ এই হইল যে, চক্ষের জলে বক্ষ প্লাবিত! উপস্থিত দুঃখ হইল বটে, কিন্তু কবে আবার এই ডিউটী বৃদ্ধি হইবে, সেই দিন ইঁহাদের লক্ষ্যভূত রহিল। সেই দিন আবার অনেকে এই নুনের কাজে বড়লোক হইবেন। ওগো বাবুরা! বড়লোক হইবার এই একটা সুন্দর পথ দেখা যাইতেছে। যাঁহারা ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের সহিত সর্ব্বদা দেখা শুনা করেন, বা যাঁহারা তাঁহার নিকট থাকেন, তাঁহারাই সহজে এই কাজে বড়লোক হইতে পারিবেন। সেবার স্বর্গীয় পার্ব্বতী রায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে * এই ডিউটী বৃদ্ধি হওয়ায় এক দিনে ১১ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। ৺পার্ব্বতী রায়ের জীবনী বিগত ১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসের মহাজনবন্ধুতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত-গবর্ণমেণ্ট জল্পনা কল্পনা করিয়া স্থির করিবেন যে, অমুক তারিখ হইতে লবণের ডিউটী বৃদ্ধি করিব। ইহা স্থির জানিয়া নির্ভয়ে অতিরিক্ত মণ লবণ ক্রয় করিবার জন্য কনট্রাক্ট করিয়া চুপ চাপ বসিয়া থাক। জাহাজ ঘাটে লাগিবে, আর ডিউটী বেশী দিতে হইবে; এ বেশী ডিউটী বিক্রেতার লাগিবে, অহা কন্ট্রাক্টে লেখা পড়া থাকিবে। কাজেই লবণের বাজার চড়িবে, তোমার কম দরে কেনা থাকিবে। বাজার-তেজের মুখে মালের কাট্‌তির জন্য কোন ভাবনা নাই।

* ১৮৮২ অব্দে রিপণ বাহাদুর এই কর হ্রাস করেন, ১৮৮৫ অব্দে লবণ কর পূর্ব্ববৎ পুনস্থাপিত হয়। অতএব তিন বৎসর লবণের ডিউটী কম ছিল।

যিনি এই কাজ করিবেন, তিনি নিশ্চিত বড়লোক হইবেন। কিন্তু ডিউটী বৃদ্ধি হইবার স্থির তারিখটী পাওয়া চাই। ঐ স্থির তারিখ গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় লোকে কৃপা করিয়া লবণের ডিউটী বৃদ্ধি হইবার পূর্ব্বে যদি বলিয়া দেন, আমি তাঁহাকে ১০০০৲ পারিতোষিক দিতে পারি। মহাজনবন্ধু কার্য্যালয়ে সংবাদ দিলেই চলিবে।

শ্রী :—

মহাজনবন্ধুর নিয়মাবলী।

জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এবং সাধারণ গ্রাহক ও মহাজনদিগের কৃপায় মহাজনবন্ধু আজ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া আমরা এ সম্বন্ধে দুই বৎসরের যে অভিজ্ঞতা পাইয়াছি, তাহা এ স্থলে বলিব। মহাজনবন্ধুর যত বয়স বৃদ্ধি হইবে, তত আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ হইতে পারে এবং তখনকার মতামত আমাদের কিরূপ হইবে, তাহা বলিতে পারি না। হয়ত আজ যে মতামত প্রকাশ করিতেছি, কালে ইহা অন্যরূপ হইবে।

প্রথম কথা। এদেশী গ্রাহকের অবস্থা। অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তিও মহাজনবন্ধু ভিঃ পিতে পাঠাও বলিয়া শেষে তাহা ফেরত দিয়া, নিজেদের কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছেন। অনেকে এক বৎসর কাগজ লইয়াছেন, পরে পত্রের দ্বারায় দামের জন্য তাগাদা করা হইল, তখন কোন কথা নাই; কাজেই ভিঃ পিতে কাগজ গেল, তৎপরে তাহা ফেরত দিয়াছেন। সামান্য মূল্য এবং তাঁহারা মফঃস্বলে দূরদেশে বাস করেন, কাজেই এ জন্য আদালতে নালিশ করা চলে না। এই সব অত্যাচার এদেশী সমুদয় সংবাদ পত্রকে বোধ হয় নীরবে সহ্য করিতে হয়। তাহার পর "নমুনার কাগজ পাঠাও, আমি গ্রাহক হইব।" এরূপ পত্র প্রতি মাসে গড়ে অন্ততঃ ৫০ খানা পাইয়াছি। কিন্তু নমুনা পাইয়া বোধ হয় এক জনও গ্রাহক হয়েন না। ইঁহাদের ব্যবসায় কেবল নমুনার কাগজ লওয়া। প্রতি মাসে এক একটী নূতন নাম দিয়া নমুনা-কাগজ লইয়া ইঁহারা এক বর্ষের সমুদয় পত্রই সংগ্রহ করিতে পারেন। কাজেই অনেক সম্পাদক আর নমুনা পাঠান না। আমরাও এ পক্ষে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া নমুনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছি। এখন দশ পয়সার টিকিট পাইলে সাধারণ সংস্করণের এক সংখ্যা পাঠান যায়।

মহাজনবন্ধুর পরিবর্ত্তে যে সকল পত্র-পত্রিকা পাইয়া থাকি, তাহাদের সম্পাদকগণ যদি কৃপা করিয়া আমাদের এই পত্রের সমালোচনা প্রতি মাসে অন্ততঃ

এক বার করেন, তবে আমরাও তাঁহাদের পত্রের সমালোচনা মহাজনবন্ধুতে প্রাত মাসে করিতে প্রস্তুত আছি। এ নিয়ম এই বর্ষ হইতে করা হইল। নচেৎ বর্ষের শেষে প্রাপ্ত পত্র-পত্রিকায় প্রাপ্তিস্বীকার বা সমালোচনা নিশ্চিত করা হইবে।

এই বর্ষ হইতে রাজ-সংস্করণ মহাজনবন্ধুর বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা ধার্য্য হইল। অসমর্থ পক্ষে বা কৃষি ও শিল্প বিদ্যাশিক্ষার্থী ছাত্রগণের জন্য সাধারণ সংস্করণের মূল্য ১৲ টাকাই রহিল।

বিজ্ঞাপন কভারে এক পেজ ২৲ টাকা। অন্যত্র এক পেজ ১॥০ টাকা। কভারে প্রতি লাইন ৵০ আনা। অন্যত্র প্রতি লাইন ৴০ আনা। মফঃস্বলের বিজ্ঞাপনদাতাদিগের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত বিজ্ঞাপনদাতাদিগের মূল্য তিন মাস অন্তর আমরা লইয়া থাকি। প্রতি মাসে দিতে ইচ্ছা করিলেও লইতে প্রস্তুত; কিন্তু এইরূপ বিজ্ঞাপনের রেট বহু দিনের জন্য অর্থাৎ ১২ বর্ষের চুক্তির উক্ত দাম অপেক্ষা কিছু বেশী লাগে।

কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ ভিন্ন এ পত্রে অপর কোন প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় না। ইহা লক্ষ্য রাখিয়া লেখকগণ প্রবন্ধ পাঠাইবেন। কেবল সাহিত্য-সেবী অথচ নামজাদা লেখক, তাঁহার যদি কোন ব্যবসায় কাজ কর্ম্ম না থাকে, অথচ ব্যবসায় প্রবন্ধ লেখেন, তাহা হইলে সে প্রবন্ধ আমরা মুদ্রিত করি না। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে উহা প্রকাশিত হয় না এবং উহার কাপি ফেরত দিবার নিয়ম নাই। কৃষক এবং শিল্পীর নিকটে বসিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা লইয়া প্রবন্ধ তাঁহাদের নামে লিখিয়া দিলে, সে প্রবন্ধ সাদরে মুদ্রিত হয়। এবং এরূপ প্রবন্ধ-লেখকদিগকে প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য এক টাকা পারিতোষিক দেওয়া হয়।

গ্রাহকগণ প্রতি মাসে কাগজ না পাইলে এবং দুই মাসের মধ্যে আমাদের জানাইলে, আমরা সে কাগজ পাঠাইব। কিন্তু ৪।৫ মাস পরে "আমি অমুক সংখ্যা পাই নাই" বলিয়া পত্র লিখিলে, তাহা দেওয়া হইবে কি না সন্দেহ! এ জন্য গ্রাহকের জোর চলিবে না।

পত্রের উত্তর চাহিলে রিপ্লাই কার্ডে অথবা টিকিট দিয়া পত্র পাঠাইবেন; তাহা হইলে শীঘ্র উত্তর পাইবেন।

আমাদের এই নিয়মাবলী প্রতি মাসে মুদ্রিত হইবে না।

শ্রীসত্যচরণ পাল—ম্যানেজার।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা; চৈত্র, ১৩০৯ সাল।

মুক্তা।

(২)

(লেখক—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।)

যাহারা অল্পসংখ্যক ঝিনুক ক্রয় করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ ছুরি দ্বারা খোলা খুলিয়া শাঁসের ভিতর মুক্তা অন্বেষণ করে। বলা বাহুল্য, সমুদয় ঝিনুকে যে মুক্তা থাকে, তাহা নহে; এবং সকল ঝিনুকের মুক্তাও এক রূপ নহে। ঝিনুক ক্রয় করা এক প্রকার কপালঠোকা কাজ। যদি কপালে থাকে, তাহা হইলে ক্রীত ঝিনুকের অনেকগুলিতে হয় ত মুক্তা থাকে, আর সে মুক্তাগুলি হয় ত উৎকৃষ্ট। আর কপালে যদি না থাকে, তাহা হইলে, শত শত ঝিনুক খুলিয়াও ক্রেতা হয় ত একটীও মুক্তা লাভ করিতে পারে না; আর যদি বা দুই একটী বাহির হয়, কপাল-গুণে তাহাও হয় ত ছোট বীজমুক্তা হইয়া পড়ে। টাট্‌কা অবস্থায় ঝিনুক খুলিয়া মুক্তা অন্বেষণ করিলে, সকল মুক্তা বিশেষতঃ ছোট বীজ-মুক্তা নয়নগোচর হয় না। তাহাতে ক্রেতার অনেক ক্ষতি হয়। সে জন্য লোকে সচরাচর ঝিনুক পচাইয়া ও তাহার পর সেই গলিত মাংস ধুইয়া মুক্তা অন্বেষণ করে। পচাইবার নিমিত্ত কোন কোন মহাজন ঝিনুক রেলপথে দূর স্থানে প্রেরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোকে এই স্থানেই ঝিনুক পচাইয়া মুক্তা বাহির করে। ঝিনুক পচাইবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র কোট্টু আছে। সেই কোট্টুতে মহাজনেরা আপন আপন ঝিনুক স্তূপাকার জমা করিয়া রাখে। রাশি রাশি ঝিনুক পচিয়া এরূপ ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, সে স্থানে লোক কি করিয়া বাস করে, তাহাই আশ্চর্য্যের কথা। আমি তুমি গিয়া সে স্থানে একদণ্ডও তিষ্ঠিতে পারি না; তবে অভ্যাস হইয়া গেলে কি হয়, তাহা বলা যায় না। পচা ঝিনুকের গন্ধে এক প্রকার নীল বর্ণের দেহ ও রক্ত বর্ণের চক্ষু বিশিষ্ট মক্ষিকা আসিয়া উপ-

স্থিত হয়। ঝিনুক উত্তমরূপে পচিলে লোকে সেই গলিত মাংস ধৌত করে। ধৌত করিতে করিতে মাংসনিহিত মুক্তা সকল বাহির হইয়া পড়ে। মাংসের ভিতর না হইয়া কখন কখন মুক্তা অভ্যন্তরে খোলার উপর-গায়েও জন্মে।

সংগৃহীত মুক্তা এখন বাছাই করিতে হয়। পরিমাণ; আকার ও ঔজ্জ্বল্য,—এই তিন গুণের জন্য মুক্তার মূল্য অল্প বা অধিক হয়। পরিমাণে বড় হইবে, আকারে গোল হইবে, দেখিতে মার্জ্জিত রৌপ্যের ন্যায় অস্বচ্ছ উজ্জ্বল হইবে, এইরূপ মুক্তার মূল্য অধিক। মুক্তা কত বড় হইতে পারে? হাতেমতাই নামক পারস্য গ্রন্থে বরজখ্ সওদাগরের কন্যা হুসনবানুর অন্যান্য আবদারের মধ্যে এক আবদার ছিল যে, "যে আমাকে মোরগাদির আণ্ডার ন্যায় এক মুক্তা আনিয়া দিবে, তাহাকে আমি বিবাহ করিব।" অবশ্য ইহা গল্পকথা। কিন্তু কুক্কুট-ডিম্বের মত বড় মুক্তা যে একবারেই হয় না, তাহা নহে। হোপ নামক এক জন সাহেবের নিকট এক মুক্তা আছে, তাহার চারিদিকের বেড় দুই ইঞ্চি, আর তাহা ওজনে ১০০ রতি। রুষের বর্ত্তমান সম্রাট একবার উপঢৌকন স্বরূপ আমাকে (কাহাকে?) মণি-মাণিক্য-খচিত এক অলঙ্কার দিয়াছিলেন। অবশ্য বড়লোকদিগের ঘরে যে সব মুক্তা আছে, তাহার সহিত তুলনা হয় না; কিন্তু এই অলঙ্কারে যে মুক্তাটী ছিল, তাহা ক্ষুদ্র নহে। কিন্তু ইহার আকার ও ঔজ্জ্বল্য তত ভাল নহে। চক্ষুতে দেখিয়া বড় বড় উৎকৃষ্ট মুক্তাগুলি সহজেই পৃথক করিতে পারা যায়। তাহার পর ছাঁকনির দ্বারা লোক ছোট বড় মুক্তা বাছাই করে। এই কার্য্যের নিমিত্ত এ স্থানে লোকে পিত্তলনির্ম্মিত দশ প্রকার ছাঁকনি ব্যবহার করে। সকল ছাঁকনির পরিমাণ এক রূপ, তবে কোনটীর ছিদ্র বড় বড়, কোনটীর ছিদ্র ছোট ছোট। প্রথম ছাঁকনিতে কেবল কুড়িটী ছিদ্র থাকে; সুতরাং ইহার ছিদ্রগুলি বড়। মুক্তা-সকল ইহার উপর রাখিয়া খই চালনার ন্যায় চালনা করিলে, বড় বড় মুক্তাগুলি উপরে থাকিয়া যায় ও ছোট ছোট মুক্তাগুলি ছিদ্রপথে গলিয়া নিম্নে পতিত হয়। দ্বিতীয় ছাঁকনিতে ত্রিশটী ছিদ্র থাকে, সুতরাং উহার ছিদ্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এইরূপে ৫০, ৮০, ১০০, ২০০, ৪০০, ৬০০, ৮০০ এবং ১০০০ ছিদ্র সম্বলিত ছাঁকনি দ্বারা ক্রমে ক্রমে মুক্তা-সকল বাছাই হইয়া থাকে। যে সমুদয় মুক্তা শেষের ছাঁকনি পার হইয়া নিম্নে পতিত হয়, তাহা অতিশয় ক্ষুদ্র। ঔষধ প্রস্তুতের নিমিত্ত সচরাচর তাহা চীনে

প্রেরিত হয়। কবিরাজী ঔষধেও মুক্তা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুক্তা এক প্রকার চূণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং কড়ি ভস্ম অপেক্ষা ইহা সেবনে অধিক উপকার হয় কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে যে বস্তু দুষ্প্রাপ্য, ও যাহার মূল্য অধিক, তাহা সেবন করিলে রোগীর মন অনেকটা উৎসাহিত হয়। সেই বিশ্বাসে ও উৎসাহে রোগের অনেকটা উপশম হইতে পারে।

যে মুক্তা কুড়িটী ছিদ্র সম্বলিত ছাঁকনির উপর থাকিয়া যায়, যাহার আকার গোল ও যাহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল, এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তাকে এ স্থানে "আনি" বলে। তাহার পর অনতারি, সসঙ্কু, কল্লিপু, কুরল, পিসল, মদঙ্কু ও ভদিভু, গুণানুসারে এই কয়টী নামে মুক্তা সকল অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বীজ-মুক্তাকে "টুল" বলে। বাছাই হইলে মালা গাঁথিবার নিমিত্ত বড় বড় মুক্তাগুলিতে ছিদ্র করিতে হয়। একখানি তক্তার অনেকগুলি গর্ত্ত থাকে। সেই সমুদয় গর্ত্তের ভিতর মুক্তা রাখিয়া কাঠখানিকে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। জলে ভিজিয়া কাঠ ফাঁপিয়া উঠে, তাহাতে গর্ত্তস্থিত মুক্তাগুলি কাঠের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং ছিদ্র করিবার সময় মুক্তাগুলি সরিয়া যায় না। এই অবস্থায় টাকুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ যন্ত্র দ্বারা অনায়াসেই মুক্তাতে ছিদ্র করিতে পারা যায়। তাহার পর হালি গাঁথিয়া সেই সমুদয় মুক্তা দেশ বিদেশে প্রেরিত হয়।

অনেক বহুমূল্য মুক্তার কথা শুনিতে পাই; কিন্তু এ বস্তুর মূল্য কত অধিক হইতে পারে, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। সে কালে রোম নগরে এক ছড়া মুক্তা-মালা ছিল, তাহার মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। এ এক ছড়া মালার মূল্য; কিন্তু সামান্য একটী দানা মুক্তার মূল্য শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে মিসর দেশে ক্লিওপেট্রা নামক এক রাণী ছিলেন। অন্যান্য বহুমূল্য প্রস্তরের মধ্যে তাঁহার নিকট একটী মুক্তা ছিল, যাহার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা। এই মুক্তাটীকে চূর্ণ করিয়া তিনি সেবন করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ড ও ফরাসি দেশের নিকট সমুদ্রে লোকে খাদ্য-ছিমুকের চাষ করে। যে দেশের লোক রসায়ন বিদ্যার সহায়তায় হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহারা আফ্রিকার বালুকাময় মরুভূমি হইতে বন্য উষ্ট্রক

পক্ষী ধরিয়া তাহাদের দ্বারা শাবক উৎপাদন করিয়া হাঁস মুরগীর ন্যায় চাষ করিতেছে, যাহারা ব্যোমপথে বিনা-তারে মহাসমুদ্র-পারে তাড়িত-সংবাদ প্রেরণ করিতেছে, তাহারা যে মুক্তা-ঝিনুকের চাষ করিতে চেষ্টা করিবে না, তাহা সম্ভব নহে। ডেন্‌মান্ নামক এক সাহেব আরিগু হইতে দেড় ক্রোশ দূরে বৃহৎ একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা সমুদ্রের লবণজলে পূর্ণ করিয়া, দ্বাদশ সহস্র মুক্তা-ঝিনুক-শাবক তাহার ভিতর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এ চেষ্টা সফল হয় নাই। অল্প দিনের মধ্যেই নানা কারণে প্রায় সমুদয় ঝিনুক-শাবক মরিয়া গিয়াছিল।

বাজারে অতি সুলভ মূল্যে অনেক কৃত্রিম মুক্তা বিক্রীত হয়। চীনে ঝিনুকের ভিতর ছিটাগুলি দিয়া লোকে যে মুক্তা উৎপাদন করে, তাহা কিন্তু কৃত্রিম মুক্তা নহে। কৃত্রিম মুক্তা প্রকৃত কাচ দ্বারা নির্ম্মিত। সেই জন্য এত সুলভ। চীনের লোক বহুকাল হইতে কাচনির্ম্মিত কৃত্রিম মুক্তাও প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজকাল বাজারে যে কৃত্রিম মুক্তা বিক্রীত হয়, তাহা ফরাসি ও ইটালি দেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। পারিস ও রোম নগর এই বস্তু প্রস্তুত হইবার প্রধান আড্ডা। জাকুইন নামক একজন ফরাসি পারিস নগরে এই কার্য্য প্রথম আরম্ভ করেন। কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করা অতি সহজ কাজ। ফাঁপা কাচ-বর্ত্তুলের এক পার্শ্বে একটী ছিদ্র থাকে। বাটার ন্যায় কোনরূপ উজ্জ্বল চাক্‌চিক্যশালী মাছের আমিষ গলাইয়া ছিদ্রপথে সেই বর্ত্তুলের ভিতর ঢালিয়া ছিদ্রটী বন্ধ করিয়া দিতে হয়। সচরাচর এইরূপে লোকে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করে। বর্ত্তু-লের বাহির গায়ে অথবা ভিতর গায়ে দ্রবীভূত আমিষের প্রলেপ দিয়াও লোকে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করে। কাজ অতি সহজ বটে, কিন্তু অতি সামান্য কাজেও শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। সে জন্য পারিসে গিয়া প্রস্তুত-প্রণালী স্বচক্ষে দেখিয়া, যিনি এ কাজ শিখিয়া আসিতে পারিবেন, তাঁহাকেই আমি এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বলি; অন্য কাহাকেও সে পরামর্শ প্রদান করি না। না দেখিয়া শুনিয়া কাজ আরম্ভ করিলে, প্রথম অবস্থায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে যে খরচ হইবে, তাহাতেই তাহার মূলধন নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

মধুপুরে গোলাপ ফুলের চাষ।

শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন রক্ষিত। পূর্ব্বে ইনি কলিকাতার সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। মহাজনবন্ধুর প্রতি ইহাঁর যত্ন অপরিসীম। তিনি মধুপুরে গোলাপ-চাষের উদ্যোগে আছেন। এ সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে যাহা দয়া করিয়া জানাইয়াছেন, তাহা এই,—

গোলাপফুল জন্মিবার পক্ষে কলিকাতার সন্নিকট স্থান অপেক্ষা এস্থান ভাল। এবং সহরতলীতে চাষের খরচা বেশী, মালির মাহিনা বেশী, এখানে এখনও কম খরচা। ৮০ হস্ত দীর্ঘ এবং ৪ হস্ত প্রস্থ পরিমাণে বাঙ্গালাদেশে ১ কাঠা হয়, অথবা স্কোয়ার ১২০ হস্তে বাঙ্গালার কাঠা। এখানে ১ কাঠা জমি বাঙ্গালার দেড়া। বোধ হয় "একারের" হিসাবে জমির মাপ বলিয়া এরূপ হইয়াছে।

মধুপুরের ষ্টেসন হইতে ২।৩ মাইল দূরের জমি চাষের পক্ষে প্রশস্ত। এই সকল স্থানের জমি টিকায়েতের অধীন। পত্তনিদার এবং টিকায়েৎ এক নহে। এ সমস্ত জমি গভর্ণমেণ্টের। গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর টিকায়েতকে কিছু কমিস্যানী দিয়া জমির আয় নিজে লইয়া থাকেন। মধুপুরের বাজারের ভিতরেও জমি পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার সেলামী বেশী; ১ বিঘায় ১০০৲ হইতে ১৫০৲। কিন্তু ইহা চাষের পক্ষে উপযুক্ত নহে। দোকান করিবার পক্ষে উপযুক্ত। গ্রামের বাহিরের জমির সেলামী বিঘা প্রতি ৫০৲ হইতে ৮০৲ টাকা। এমন কি গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের নিকট হইতে জমি লইলে ৮০৲ সেলামীতে ৫০ বৎসর লিজে জমি পাওয়া যায়। গ্রামবাসীর নিকট হইতে জমি লইলে মৌরসি পাট্টায় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার সেলামী অধিক, প্রতি বিঘায় ১৫০৲ হইতে ২০০৲।

সেলামী অর্থাৎ এ টাকা একবারে দিতে হয়, ইহা ফেরত বা কোনরূপে আর আদায় হয় না। এই সেলামী ভিন্ন বার্ষিক খাজনা আছে। ১ বিঘা জমির সচরাচর বার্ষিক খাজনা ১০৲ টাকা এবং গ্রামবাসীর নিকট হইতে মৌরসিপাট্টায় জমি লইলে বার্ষিক খাজনা প্রতি বিঘায় ৪৲ ৫৲ টাকা মাত্র। ইহা প্রতি বৎসর দিতে হইবে।

গোলাপফুল গাছ এখানে ক্রয় করিতে হয় না। অন্যান্য অনেক গোলাপ বাগান আছে। প্রতি বৎসর উহার ডাল কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, সেই সকল ডাল লইয়া পুতিলে অনায়াসে গাছ হয়। এখানে গোলাপফুলের ব্যবসার জন্য ২।৩টী বাগান আছে। ইহাঁরা রীতিমত ভাবে ইহার চাষ আবাদ করি-

তেছেন। ইহা ভিন্ন, জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতির গোলাপ-বাগানেও অনেক ফুল হয়, কিন্তু ইঁহারা ব্যবসায় করেন না। এখানকার সমুদয় গোলাপফুল বিলাতী; গন্ধ নাই, ফুল বড় হয়, ৩ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি পুষ্প আমি দেখিয়াছি। এই পুষ্প অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত হইয়াও ২।৩ দিন থাকে। শীঘ্র ঝরিয়া পড়ে না। আমাদের দেশী গোলাপের গন্ধ আছে; কিন্তু উহা প্রস্ফুটিত হইলেই ঝরিয়া পড়ে, একারণ দূরদেশ হইতে ইহার ব্যবসায় চলে না। মধুপুর হইতে কলিকাতায় ১ টিনে ১০০ শত পুষ্প যায়, এরূপ শত শত টিন প্রত্যহ কলিকাতায় চালান হয়। ১ টিন পুষ্পের রেলভাড়া লাগে ৵০ আনা। কলিকাতায় মিউনিসিপাল মার্কেটে আমি দেখিয়াছি, ১০০ গোলাপ ৩৲ ৪৲ মূল্যে বিক্রয় হয়। মধুপুরের ফুলের বাগানে শুনিলাম, তাঁহারা যত ফুল চালান দেন, সবই বিক্রীত হয়, একবারও অবিক্রীত হয় নাই। তবে দর কম হয়, মোটের উপর গড়ে তাঁহাদের বার্ষিক হিসাবে বুঝা যায়, প্রতি শত গোলাপ ২৲ ২৷৷০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। একটা ৫ বিঘার গোলাপ-বাগান এক বৎসরে তৈয়ারী হইতে পারে। সেপ্টেম্বরের ১৫ই হইতে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত গোলাপ ফুলের মরশুম্। এই কয় মাস রীতিমতভাবে পুষ্প পাওয়া যায়। আমি দেখিতেছি, ৫ বিঘার বাগানে গড়ে প্রত্যহ ১৩।১৪ শত পুষ্প পাওয়া যাইবে।

এই চাষে ১ম বর্ষের ব্যয়,—

জমির সেলামী	৫০০৲
৫ বিঘার বার্ষিক খাজনা	৫০৲
১টা কুয়া কাটান ব্যয়	৩০০৲
ম্যানেজার মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাব	৩০০৲
মালী ৪টা ৬ মাস ৫৲ হিসাব	১২০৲
মালী ২টা ১২ মাস ৫৲ হিসাব	১২০৲
বেড়ার জন্য ফেন্সিঙ্গের তার	৫০০৲
সার ইত্যাদি	১০০৲
ব্যাঙ্ক ২০০০৲ টাকার ৬ মাস শতকরা ১৲ হিসাবে	১২০৲
কোদাল, সাবল ইত্যাদি যন্ত্র	৫০৲
লাঙ্গল দেওয়া খরচা	৪০৲
মোট—	২২০০৲ টাকা।

প্রথম বর্ষের আয়,—

সেপ্টেম্বরের ১৫ই হইতে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত দেড় মাস বা ৯০ দিনে গড়ে প্রত্যহ হাজার পুষ্প ১০টিন রেল মাসুল ইত্যাদি খরচা বাদে যদি প্রত্যেক টিন ১০০ ফুল ১৲ হিসাবে বিক্রয় হয়, তাহা হইলেও প্রত্যহ আয় ১০৲ টাকা;

অতএব ৯০ দিনে	৯০০৲
অতএব প্রথম বর্ষে ক্ষতি	১৩০০৲ টাকা।

দ্বিতীয় বর্ষে ব্যয়,—

খাজনা	৫০৲
ম্যানেজার	৩০০৲
মালী ২টা	১২০৲
ব্যাজ	২৪০৲
মোট—	৭১০৲ টাকা।

আয় কিন্তু পূর্ব্ববৎ ৯০০৲ টাকা। এ বৎসর ১৯০৲ টাকা লাভ। এ কাজে এইরূপে প্রতি বৎসর ১ শত ২ শত টাকা লাভ করিয়া ক্ষতি পোষাইয়া কিছুদিন পরে লাভ হয়।

ধানভাঙ্গা কল।

বেশী দিনের কথা নহে, যখন এই যন্ত্র এদেশে নূতন আইসে, তখন আমাদের মফঃস্বলবাসী মধ্যবিত্ত লোকেরা মনে করিলেন, এইবার দেশ হইতে ঢেঁকি উঠিয়া যাইবে, অল্প খরচা লইয়া অথবা কৃষকদিগকে এই কল ভাড়া দিয়া লাভ করিব। এই জন্য অনেকে ইহা লইয়াছিলেন, শেষে কিন্তু চলে নাই। মফঃস্বলে স্থানে স্থানে অনেক জমিদারের বাটীতে ভগ্নাবস্থায় পতিত এই কল অনেক দেখিয়াছি। কেন এরূপ হইল? কল কারখানার কাজ করিবার পূর্ব্বে সকলেই ইহা ভাবিবেন যে, একখানি বা দুইখানি গ্রামের দ্রব্যে কলে কিছুই হয় না। এমন স্থান দেখিতে হয় যে, শত শত গ্রামের দ্রব্য যে স্থান দিয়া গমনাগমন করে, সেই স্থানই কলের পক্ষে প্রশস্ত। কল চলিলেই লাভ। দিবা-

রাত্রি চালাইলে আরও লাভ। বন্ধ গেলেই ক্ষতি। ধানভাঙ্গা কলের বহুবিধ সংস্করণ আছে। একজন লোকের দ্বারা এ কল চালান যায়, এই অবস্থা হইতে এঞ্জিনের সাহায্যে চালাইতে হয়, এরূপ বৃহৎ সংস্করণও পাওয়া যায়। কলিকাতা জোসেফ কোম্পানীকে সংবাদ দিলে, তাঁহারা এই কল বসাইয়া ও চালাইয়া, ঠিক করিয়া দিয়া যান। আজ ২।৩ বৎসর হইল, হাবড়া রামকৃষ্ণপুরে এই কল একটীমাত্র ছিল। উপস্থিত সময়ে ৭টী হইয়াছে, আরও ৭টী নূতন বসিতেছে। ২।১ মাস মধ্যে তাহাও চলিবে। একমণ ধান কিংবা চাউল ছাঁটিয়া দিলে ।৵০ ছয় আনা দিতে হয়। ইহার দর খাদের উপর হয়। অর্থাৎ এক মণ ধানের কুঁড়া বা ধান্যের খোসা কত বাহির হইল দেখিয়া, তবে ইহার দর হয়। এইজন্য যাঁহারা ধান্য ছাঁটাই করান, তাঁহারা অগ্রে ১/মণ ধান্য পাঠাইয়া দেন। ইহা কলে ফেলিয়া দেখা হয়, ধান্যের খোসা বা ভূষি কিংবা কুঁড়া কত বাহির হয়। যদি মণকরা /২॥ সের বাহির হয়, তাহা হইলে প্রতি মণ ছাঁটাই খরচ ।৵০ আনা লাগে। যদি /১॥০ বা /১৸০ বাহির হয়, তাহা হইলে মণকরা ছাঁটাই খরচা ।/০ বা ।/১০ লাগে। পূর্ব্বে যখন এইস্থানে একটীমাত্র কল ছিল, তখন তাঁহারা এই ।৵০ আনার স্থলে ৸০ বার আনা লইতেন। এখন যেমন কল বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনই দরও পড়িয়াছে; এবং আরও যত কল বৃদ্ধি হইবে, ততই আরও দর কমিবে নিশ্চিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দর পড়ে। কিন্তু এখনও মণকরা ।/০ আনা ।৵০ আনা লইয়াও রীতিমত এই কলে লাভ হয়। তাহার হিসাব পরে দিতেছি। ১/মণ চাউল কুঁড়া-ছাঁটাই করিলে মণকরা /১॥০ /১৸০ খাদ এবং ১/মণ ধান্য হইতে পরিষ্কার চাউল করিতে গেলে প্রায় /২॥০ সের খাদ বাহির হয়।

জমি ভাড়া লইয়া, গৃহনির্ম্মাণ এবং কল বসাইতে অন্ততঃ দুইমাস সময় লাগে। আমার একটী বয়লার, একটী এঞ্জিন এবং ২টী রোলার মেসিন, এবং গৃহনির্ম্মাণ, বয়লার বসাইবার ইষ্টকের গাঁথনি ইত্যাদির জন্য মোট ৭০০০৲ টাকা লাগিয়াছিল। রামকৃষ্ণপুরে একাজ প্রায় বার মাস চলে।

ভারতের প্রায় প্রত্যেক স্থানের ধান চাউল এইস্থানে আসিয়া থাকে। মরিসস্ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে এইস্থান হইতেই চাউল রপ্তানী হয়। এজন্য বাণীর কাজে লাখদা ও অন্যান্য দেশীয় গ্রাহকও এইস্থানে অনেক পাওয়া যায়। বাণীর কাজ অর্থাৎ অন্যান্য মহাজনেরা আমাদের নিকট চাউল বা ধান

ছাটাইয়া লইয়া আমাদের মণকরা পাঁচ আনা বা ছয় আনা যে মজুরী দেন, তাহাকেই আমরা বাণীর কাজ বলি। কিন্তু ইহা প্রত্যহ পাওয়া যায় না; হয় ত কোন সময় এত পাওয়া যায় যে, এজন্য গুদামে স্থান দেওয়া দুর্ঘট হয়, আবার কোন সময়ে বা কিছুই থাকে না। এই সময় বসিয়া থাকিতে হয়, কল না চালাইয়া বসিয়া থাকিলেই ক্ষতি; এ কারণ আমি অতি সামান্যভাবে ধান এবং চাউলের কাজও ইহার সঙ্গে খুলিয়াছি। যখন বাণীর কাজ না পাই, তখন নিজের কাজে কল চালাই।

এই কাজ দ্বিবিধ। (১) চাউলকে ছাঁটিয়া কুঁড়া বাহির করিয়া পরিষ্কার করা। (২) ধান্যকে ছাঁটিয়া পরিষ্কার চাঁউল করা। চাউলকে পরিষ্কার করিবার জন্য একবার কলে ফেলিলেই হয় এবং ইহার খাদও যে কম হয়, তাহা আর বলিতে হইবে না; পরন্তু ইহা ছাঁটাইও প্রত্যহ একটী কলে বেশী হয়। ধান্য ছাঁটাইয়ের জন্য মেসিনে দুই বার ফেলিতে হয়; ইহার খাদ বেশী—কাজেই ইহার দর বেশী। আমি দুইটী মেসিন লইয়াছিলাম বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটী নষ্ট হইয়া বন্ধ আছে, একটীতে কাজ চলিতেছে। এই একটী মেসিনে চাউল ছাঁটাই প্রত্যহ ৮০।৮৫ মণ হয়, কিন্তু ধান্য ছাটাই করিতে গেলে উহার স্থলে ৭০।৭৫ মণ হয়। যে রোলারে ধান্য এবং চাউল ছাঁটাই হয়, উহা কাঁকর-কাটা মত। চাউল-ছাঁটায়ে এই রোলার আমরা ১৫।২০ দিন অন্তর বদলাই। কিন্তু ধান্য ছাঁটাই করিতে গেলে ৭।৮ দিনেই উহা বদলাইতে হয়। ধান্য ছাঁটায়ে এত শীঘ্র রোলার ক্ষয় হইয়া যায় যে, ঐ রোলার না বদলাইলে এই কলে আর কাজ হয় না, প্লেন হইয়া যায়। একটা বয়লার এবং একটী এঞ্জিনে ৫।৭টী রোলার মেসিন চালান যায়। প্রত্যেক রোলার মেসিনে এক জন করিয়া লোক উহাতে চাউল বা ধান্য নিক্ষেপ করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হয়। যে এঞ্জিন-চালক, তাহাকে "টেণ্ডেল" বলে। এদেশী অনেক দরিদ্র মুসলমান এবং উড়ে, টেণ্ডেলের কাজ করিতে পারে। আমার টেণ্ডেলের বেতন মাসিক ১৫৲। যতই মেসিন চলুক না কেন, টেণ্ডেল এক জন থাকিলেই হইল। এখানে টেণ্ডেলের উচ্চ বেতন ৩৫৲ টাকা পর্য্যন্ত আছে, দেখিতেছি।

আমার এঞ্জিনে কয়লা লাগে প্রত্যহ ২০/০ মণ। কিন্তু দুই মাস পূর্ব্বে প্রত্যহ আমার কলে ২৫/০ মণ কয়লা লাগিত। তৎপরে "মেকা" দিয়া আমার প্রত্যহ ৫/০ মণ কয়লার খরচ বাঁচিয়াছে। "মেকা" দেখিতে

বিলাতী মাটীর মত, ইহাতে অভ্র প্রভৃতি আছে। বয়লার এবং এঞ্জিনের গাত্রে এই মাটী জলে গুলিয়া মাখাইয়া দিলে, বয়লারের তাপ বাহিরে ছড়ায় না, এ জন্য গ্রীষ্মকালেও কল-ঘরে মানুষ যাইতে পারে, নচেৎ বয়লারের কাছে মানুষ যাইতে পারে না, গেলেও কষ্ট বেশী, তাপ লাগে। বয়লারের তাপ বাহিরে যাহা অনর্থক ব্যয় হইত, তাহা রোধ করাতে এই তাপ কাজে লাগে ও কয়লাও কম পোড়ে।

গাধাবোট বা নৌকা করিয়া যখন মহাজনেরা আমাদের কলে ধান্য বা চাউল ছাটাইবার জন্য পাঠাইয়া দেন, তখন উহা তুলিয়া আমাদের গুদামে আনিতে যে কুলী-খরচা এবং ওজনের জন্য কয়ালের খরচা যাহা লাগে, তাহা আমাদের ঐ মণকরা ।/০ আনা বা ।৵০ আনা বাণীর ভিতর হইতে দিতে হয়। অর্থাৎ এই খরচা আমাদের; কিন্তু ছাঁটাই হইয়া গেলে, উহা লইয়া যাইবার খরচা, মুটে এবং কয়ালী যাহা লাগে, তাহা মহাজনের দেয়।

এখন ধরুন,—প্রাত্যহিক লাভ-লোকসানের হিসাব,—

জমা বা আয়,—

প্রত্যহ এক মেসিনে ৮০/০ মণ চাউল ছাঁটাই হইল। ধান্য হইলে কম হইত বটে, কিন্তু যেমন কম হইত, তেমনই উহার দরও বেশী পাওয়া যাইত।

এক্ষণে ধরুন—

৮০/০ মণ ।/০ হিসাবে—২৫৲

প্রাত্যহিক আয় ২৫৲ টাকা হইতে
প্রাত্যহিক ব্যয়— ১৫।/৫
বাদ দিলে প্রত্যহ লাভ হয়—
৯॥৵১৫

মোটামুটি ১০৲ টাকা প্রত্যহ লাভ।
৭০০০ সাত হাজার টাকা মূলধনে—
ইহা সহজ কথা নহে।

খরচ বা ব্যয়,—

কাঁচা কয়লা ২০/০ মণ— ৫৲

একটী মেসিন বলিয়া ২ জন লোক; (১ জন চাউল মেসিনে দিবে, অপর ১ জন টেণ্ডেল).

উভয়ের বেতন গড়ে প্রত্যহ— ১৲

মূলধনের সুদ ৭ হাজার টাকার শতকরা ১৲ হিসাবে মাসিক— ২।/৫

৮০/০ মণ চাউল তুলিবার কুলী এবং কয়ালী প্রভৃতি মণকরা /০ হিসাবে— ৫৲

ঘরভাড়া এবং নিজের খরচা ইত্যাদি— ২৲

মোট খরচা— ১৫।/৫

বাখরগঞ্জ, নলছিট, রেঙ্গুন এবং বোলপুর প্রভৃতি স্থানে এই কল প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

মুক্তা প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

(লেখক—শ্রীভূতনাথ পাল বি, এ।)

বিগত ফাল্গুন মাসের "মহাজন বন্ধু"তে মুক্তা প্রবন্ধের ১ম প্যারায় লেখা হইয়াছে যে, "সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নিকট সমুদ্রের এ পারে ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কূলে ও অপর পারে সিংহলের উত্তর-পূর্ব্ব কূলে যে মুক্তা জন্মে, তাহাই ভারতের মুক্তা বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই মুক্তা নানাদেশে প্রেরিত হইয়া আসিতেছে, আর এখন পর্য্যন্ত ইহার যত আদর, সে আদর অন্য মুক্তার নাই।"

লেখক মহোদয় যে মুক্তার বিষয় বলিয়াছেন, "ইহাকে "সৈলান" মুক্তা বলে। অর্থাৎ ভারত মহাসাগরের মধ্যে সিংহলের উত্তর-পূর্ব্ব কূলে এই মুক্তা জন্মে বলিয়া সিংহলের নামেই উক্ত মুক্তাকে "সৈলান" বলা হয়। সৈলাম অপেক্ষা "বসরাই মুক্তা" শ্রেষ্ঠ। বসরাই মুক্তার মূল্য সৈলান অপেক্ষা অধিক। এমন কি, পৃথিবী-শুদ্ধ লোক অবশ্য যাঁহারা মুক্তা ব্যবহার করেন বা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, "বসরাই মুক্তার" কত আদর। উহার জন্মস্থান আরব সাগরে। আরব দেশ হইতেই উহা পৃথিবীর নানাস্থানে ব্যবসায়ীরা লইয়া যায়। ঘা'র যেমন কড়কড়ি বা মাম্‌ড়ী উঠে, মুক্তাপ্রস্তুত হইবার কিছুদিন পরেও ঐরূপ মুক্তার গাত্র হইতে মাম্‌ড়ী উঠিয়া যায়। কেহ কেহ ইহাকে স্তবক কহে। সৈলান বা সিংহলের মুক্তার গাত্র হইতে ৩।৪ স্তবক উঠে; বসরাই মুক্তার হইতে ৭ স্তবক উঠে। স্তবক যত বেশী উঠে, মুক্তা তত শক্ত এবং মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়। সিংহলের মুক্তা আরবের মুক্তা অপেক্ষা শক্ত কম। কিন্তু সিংহলের মুক্তা অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়া এবং বহরমপুরের নিকট যে মুক্তা হয়, তাহা আরও শক্ত কম। অষ্ট্রেলিয়া এবং বহরমপুরী ছোট ছোট মুক্তাগুলি কিছুদিন ঘরে রাখিয়া দিলে উহার গাত্রে লবণ-কণাবৎ চূর্ণ ফুটিয়া বাহির হয়। ক্রমে উহার মসৃণত্ব নষ্ট হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। হস্তিদন্তে এবং হস্তির অস্থিতে যেমন প্রভেদ, সেইরূপ প্রভেদ বসরাই মুক্তার সঙ্গে সিংহলের মুক্তার। অতএব লেখক মহাশয়ের মতানুসারে "সিংহলের মুক্তার যত আদর, সে আদর অন্য মুক্তার নাই।" একথা মুক্তা-

ব্যবসায়ীরা বা যাহারা মুক্তা ব্যবহার করেন, তাঁহারা শুনিলে হাস্য করিবেন। "মহাজনবন্ধুর" মত পত্রে এরূপ ভ্রমপূর্ণ কথা যাহাতে প্রকাশিত না থাকে, এইজন্যই ইহার কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করিলাম।

সার্ট ও পাঞ্জাবী জামার মাপ।

টেলার্স সপে সার্ট এবং পাঞ্জাবী জামার অর্ডার দিতে গেলে, তাঁহারা গায়ের মাপ লইয়া কত কাপড় লাগিবে, বলিয়া থাকেন। কিন্তু সে হিসাবে তাঁহারা ঠিক কাপড় লইলেন কিংবা অধিক কাপড় লইলেন, ইহা অনেকে বুঝেন না। অতএব তাহার একটী সোজাসুজি সঙ্কেত, যাহা দ্বারা তাঁহারা ঐ হিসাব করেন, তাহা এস্থলে বলিতেছি।

সকলেই জানেন, কাপড়ের টানা এবং পোড়েন আছে। টানা অর্থাৎ লম্বা বা দীর্ঘ; পোড়েন অর্থাৎ বস্ত্রের প্রস্থ দিক,—অনেকে ইহাকে বস্ত্রের "আড়" এবং "বহর" বলিয়া থাকেন। বস্ত্রের বহর একরূপ নহে। এমন কি রেলির উনপঞ্চাশ থান ২।০, ১৸০, ২ হস্ত বহরের আছে—মার্কা কিন্তু এক উনপঞ্চাশ ; এইরূপ সমুদয় মার্কা। বস্ত্রের এক মার্কার ভিতর নানাবিধ বহর আছে। দর্জিরা মাপ লইবার সময় প্রথমতঃ বস্ত্রের বহরের প্রতি লক্ষ্য রাখে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা হাত, ছাতি, লম্বা, গলা এবং পুটের মাপ লয়।

১। হাত—অর্থাৎ হস্তদ্বয়। এক হস্তের মাপ লইয়া উহাকে ডবল করিলেই দুই হস্তের কাপড় লওয়া হইবে, ইহাই অনেকের ধারণা ; কিন্তু তাহা নহে। এক হস্তের মাপে যত গিরে বা ইঞ্চি হইবে, উহার আর ডবল না করিয়া ঐ পরিমাণ কাপড়েই দুইটী হাতা হইবে, ইহা যেন সাধারণের স্মরণ থাকে।

২। ছাতি—অর্থাৎ পৃষ্ঠ হইতে বুক পর্য্যন্ত গোলাকার মাপ। এই ছাতির মাপের সঙ্গেই কাপড়ের বহরের সম্বন্ধ। কম বহরের কাপড় বা ছাতির মাপের অপেক্ষা কাপড়ের বহর কম হইলে, হাত এবং ছাতির কাপড়ে টানাটানি পড়ে। পরে; উদাহরণ দ্বারা তাহা দেখাইতেছি।

৩। লম্বা—ইহাকে চলিত কথায় জামার ঝুল বলে। কেহ কেহ সম্মুখ

অপেক্ষা পশ্চাতে অর্থাৎ পৃষ্ঠের দিকে ঝুল বেশী রাখেন। কণ্ঠা হইতে যিনি যত লম্বা ঝুল রাখিতে বলেন, তত কাপড় ধরিতে হইবে এবং পৃষ্ঠের দিকে যত ঝুল রাখিবেন, তাহাও ধরিতে হইবে। পৃষ্ঠ ও সম্মুখের ঝুল সমান হইলে, কেবল সম্মুখের মাপ লইয়া তাহাকে ডবল করিয়া কাপড় ধরিলেই হইতে পারে।

এই হইল জামার নিম্নাংশের মাপ। তৎপরে জামার উর্দ্ধাংশের মাপ; যথা,—

৪। গলা—ইহার গোল মাপ লইয়া যত ইঞ্চি বা গিরে হইবে, তাহার কাপড় ধরিতে হইবে।

৫। পুট অর্থাৎ ঘাড় হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত দুইদিক মাপিয়া যত কাপড় হইবে, তাহাও ধরিতে হইবে। কফ, কলার, পকেট প্রভৃতির কাপড় ধরিতে হয় না; কেন না, জামা ছাঁটিবার সময় অল্প কোণাচে ভাবে ছাঁটা হয়, জামা দেখিলেই ইহা সহজে বুঝা যায়। চারি চৌকা কাপড় কোণাচে ভাবে কাটিলেই উহার যে ছিট্ কাপড় পড়ে, তদ্দ্বারাই ঐ সকল কাজ হইয়া যায়। কিন্তু অন্য কাপড়ের কফ, কলার ইত্যাদি করিতে হইলে অবশ্য অন্য কাপড় দিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী জামার মাপ দিলাম। ধরুন, জনৈক ব্যক্তির গায়ের মাপ ফিতা দিয়া মাপিয়া এই হইল; যথা,—

লম্বা	১৬	গিরে	অর্থাৎ	৩৬	ইঞ্চি
ছাতি	১৬	,,	,,	৩৬	,,
গলা	৭	,,	,,	১৫৸	,,
পুট	৪	,,	,,	৯	,,
হাত	১১	,,	,,	২৪৸	,,

২।০ (সওয়া দুই) ইঞ্চিতে ১ গিরে। ১৬ গিরেতে ২ হাত বা ১ গজ। কাপড়ের লম্বা দিককে টানা এবং আড় দিক্‌কে পোড়েন কহে। জামার লম্বার মাপ, কাপড়ের লম্বা বা টানা দিকে লইতে হয়। আড় বা পোড়েন দিকে লইয়া জামা তৈয়ারী করিলে কাচিবার সময় তাহার কাপড় ফাটিয়া যায়। এখন দেখুন! উপরের মাপানুসারে লম্বা ৩৬ ইঞ্চি আছে, অতএব কাপড় লইতে হইলে বুক এবং পীঠ ৩৬+৩৬=৭২ ইঞ্চি লইতে হইবে। এবং এক হাতার ২৪৸ ইঞ্চি লইলেই ইহাতে দুইটী হাতা হইবে; কিন্তু যদি কাপড়ের বহর ১ গজ অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে ১ বহর কাপড়ে দুইটী হাতা হইবে না, কারণ ছাতির মাপ ৩৬ ইঞ্চি বা ১ গজ আছে। প্রত্যেক হাতার কাপড় ছাতির মাপের অর্দ্ধেক লইতে হয়।

মোট কাপড় লাগিল ৩ বহর ৩৬+৩৬+২৪৮=৯৬৮ ; অর্থাৎ ২ গজ ২৪৮ ইঞ্চি, ইহা পাঞ্জাবীর কাপড়। কিন্তু সার্টের কাপড় লইতে হইলে ইহা হইতে যতটা কফের থাড়াই ততটা বাদ দিলে, ধরুন ১৷৷০ গিরে বা ৩৵০ ইঞ্চি বাদ গেলে ৯৩৵০ ইঞ্চি অর্থাৎ ২ গজ ২১৷৵০ ইঞ্চি থাকে ; ইহাই সার্টের মাপ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পোড়েনের দিক লইয়া জামা তৈয়ারী করিলে কাচিবার সময় উহা ফাটিয়া যায়। যাহা হউক, পোড়েনের মাপে জামা তৈয়ারী করিলে তাহাতে জামার কাপড় কম লাগে। কিন্তু উহার ছাঁট কাট ভাল হয় না ; হয় ত গায়ে কসাও হইতে পারে। অনেক বস্ত্রের বহর এত ছোট, তদ্দারা সার্ট বা পাঞ্জাবী হয় না। কড়েয়ার বাজারে জামা যে শস্তায় পাওয়া যায়, তাহার প্রধান কারণ, উহারা পোড়েনের মাপে জামা কাটে। আবার উহাদের কোন কোন জামার হয়ত পশ্চাতে পোড়েনের মাপ সম্মুখে টানা অথবা সম্মুখে পোড়েন এবং পশ্চাতে টানার মাপে ছাঁটা। এমন কি দুই হস্তের আস্তেন দ্বিবিধ মাপে কাটা, ইহাও দেখা যায়। তৎপরে উহারা কাটা বা দাগি থান অল্প মূল্যে বা শস্তায় ক্রয় করে, ইহাতেও উহাদের জামা পড়্‌তায় সুবিধা হয়। টেলার সপে এ সকল হয় না। শ্রীঃ—

ন্যাশনাল টেলারিং কোম্পানীর সত্বাধিকারী মহাশয় এই প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। ইহাদের নিকট সর্ব্ববিধ জামা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে, মহাজনবন্ধুর গ্রাহক মহোদয়েরা তাহা পরীক্ষা করিতে পারেন, মূল্যও সুলভ। ইহারা আরও বহুবিধ জামার মাপ, এবং এ কার্য্যের রহস্য মহাজনবন্ধুতে ক্রমশঃ লিখিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাদের জামার কারখানার ঠিকানা ৭০ নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো,—কলিকাতা।

মঃ বঃ সঃ।

পানতুয়া।

পানতুয়ার ছানা ভাল কারিগর ভিন্ন অন্যে সহজে চিনিতে পারেন না ; যে ছানা দানাহীন বা মিহিদানা, তাহাতে ভাল পানতুয়া হয় না। এই জন্য সিয়ালদহ রেলের ছানা অপেক্ষা হাবড়া তারকেশ্বর লাইনের ছানা এ

কার্য্যের পক্ষে খুব ভাল। ছানার গুণেই "বাঁধন" দেওয়া হয়। বাঁধন দেওয়া অর্থাৎ ময়দা মিশান। প্রথমতঃ ভাল ছানার জল জাঁত দিয়া বেশ করিয়া নিংড়াইয়া লইয়া, (যেন ছানাতে জল না থাকে) তৎপরে এই ছানা /১ সের লইয়া, উহাতে অর্দ্ধ পোয়া বা দুই ছটাক ময়দা এরূপ ভাবে মিশ্রিত করিতে হয় যে, যেন উক্ত সমুদয় ছানাতে ঐ ময়দা ৵৹ পোয়া মিশ্রিত হয়। ছানা টক হইলে তাহাতে ময়দা ৵৹ পোয়ার স্থলে ৵১০ বা ៸৹ ছটাক ময়দা মিশ্রিত করিতে হয়। পরন্ত /৷৹ পোয়া বাঁধনের পানতুয়া ভাল নহে, উহা করিলে পানতুয়ার ভিতর ডেলামত শক্ত হয়।

যাহা হউক, ছানায় ময়দা মিশান হইলে পরে উহা দ্বারা গুটি কাটিতে হয়। গ্রাহকের অর্ডারমত /১ সেরে যত গণ্ডা ইচ্ছা,—এই হিসাব করিয়া গুটি কাটিয়া, গুটি গুলিকে পানতুয়ার অথবা গোল ছানাবড়ার আকৃতি করিয়া ঘৃতে ভাজিতে হয়। পানতুয়া ভাজার একটু তারতম্য আছে। তাহা শিখিতে হয়, নচেৎ পানতুয়ার মধ্যে ভাল ভাবে ঘৃত প্রবেশ করে না। /২ সের ওজন করিয়া লইয়া, কটাহে অন্ততঃ /৫ সের ঘৃত দিয়া ক্রমে ক্রমে উক্ত /২ সের "লেই" গুলিকে ভাসা ভাবে ভাজিতে হয়। এই জন্যই পানতুয়া ভাজিতে ঘৃত বেশী লাগে। পরন্ত পানতুয়া ভাজা হইয়া গেলে, অবশিষ্ট ঘৃত দ্বারা লুচি ইত্যাদি ভাজা চলে, অর্থাৎ বেশী ঘৃত দেওয়া হয় বলিয়া সে ঘৃত নষ্ট হয় না। পানতুয়া ভাজা হইলে, ইহাকে রসে ফেলিয়া রাখিতে হয়।

বস্ত্র ধৌত কারখানা।

এদেশে ইহাকে "কাপড় কাচা ভাটি" বলে। সহরতলীতে জাতি-বিশেষের দুঃখী লোকেরা এ কাজ করে। যে জাতিতে এ কার্য্য করে, তাহাদের ধোবা বলে। হিন্দুদিগের অন্য কোন জাতি এ কাজ করে না। নিরক্ষর ধোবারা সাধারণের বাটী হইতে কাপড় লইয়া গিয়া, ভেলার রস ছুঁচ দিয়া বিঁধিয়া কাপড়ের মার্কা করে। ইহা তাহাদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা তাহাদের বিস্তার লেখা বলা যাইতে পারে।

কাপড়ে চিহ্ন দিয়া শত শত বস্ত্র একত্র করিয়া, সাজীমাটী, চূণ এবং সাবান এই তিন দ্রব্য একত্র গুলিয়া, তাহাতে কাপড় গুলি এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখে। পরে শুকাইতে দেয়। অর্দ্ধ শুষ্ক হইলে কাপড়গুলি গুছাইয়া ভাঁজ করিয়া ভাটিতে দেয়।

ভাটি অর্থাৎ লম্বালম্বি একটী গর্ত্ত কাটিয়া, তাহার এক দিকে জ্বাল দিবার পথ থাকে, অপর দিকে বাতাস পাইবে বা জ্বাল বাহির হইবে, এই দুই উদ্দেশ্যে এই পথটী রাখা হয়। এই ভাবে উনান করিয়া তাহাতে একটী হাঁড়ি বসান হয়। হাঁড়িতে জল দেওয়া হয়। তাহার পর এক প্রকার খোলা আছে, তাহাতে সেই অর্দ্ধশুষ্ক বস্ত্রগুলি সাজাইয়া রাখা হয়। এই পাত্রে ৪।৫ শত বস্ত্র সাজান যায়। এই বস্ত্র-সাজান পাত্রটী পূর্ব্বোক্ত হাঁড়ির মুখটী ফাঁক রাখিয়া তাহাতে সংলগ্ন করা হয়। পরে আরও বস্ত্র এরূপ ভাবে সাজান হয় যে, তাহাতে হাঁড়ির মুখ বন্ধ হইয়া অন্ততঃ উহার দেড় হাত উচ্চ করিয়া বস্ত্র সাজাইয়া দিয়া, সমুদয় সাজান বস্ত্র একখানি বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা হয়। তাহার পর উনানে জ্বাল দেওয়া হয়। শুষ্ক পত্রাদি কুড়াইয়া জ্বাল দেয়, কিন্তু বর্ষাকালে কয়লা ক্রয় করিয়া জ্বাল দিতে হয়। এই জ্বালে হাঁড়ির জল গরম হইয়া বাষ্পাকারে উড়িয়া সমুদয় বস্ত্রগুলিকে আর্দ্র এবং গরম করে। হাঁড়ির জল ফুরাইলে বস্ত্র সরাইয়া, আবার উহাতে জল দিয়া পুনরায় ঐ কাপড় গুলি সাজাইয়া দেওয়া হয়। একদিন এই ভাটিতে রাখিয়া পর দিন হইতে বস্ত্র ধৌত করা হয়। এজন্য পুকুর খাজনা করিয়া লইতে হয়। স্থান বিশেষে মাসিক ৷৷০ আনা পুকুর ভাড়া লাগে। দুই জন লোকে ছয় দিনে হাজার বস্ত্র কাচিতে পারে।

বস্ত্র গুলি কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয় এবং মধ্যে মধ্যে জলের ছিটা দেওয়া হয়। ইহাও পূর্ব্বোক্ত ভাবের রৌদ্রে জল শুষ্কোত্থিত বাষ্প খাওয়ান ভিন্ন আর কিছুই নহে। জলের ছিটা বহু বার দিতে হয়। তৎপরে আতপ চাউল সিদ্ধ করিয়া উহার মণ্ড করা হয়। এই মণ্ডে উক্ত বস্ত্রগুলি ডুবাইয়া নিংড়াইয়া পুনরায় রৌদ্রে শুকান হয়। ইহাকে "কলপ" দেওয়া বলে। এইবার বস্ত্রগুলি শুকাইলে ভাঁজ করিয়া ইস্ত্রি করা হয়।

বুরুজের মত দেখিতে পিত্তল-নির্ম্মিত একরূপ যন্ত্র আছে, ইহার ভিতর ফাঁপা। ফাঁপা স্থানে গুলের আগুন থাকে। ইহাতে যন্ত্রটী উত্তপ্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত মণ্ড-মিশ্রিত শুষ্ক বস্ত্রে অল্প জলের ছিটা দিয়া, এই উত্তপ্ত যন্ত্রটী বস্ত্রের উপর ঘসিলে কাপড় যেন বার্ণিসের মত চক্‌চকে হয়। ইহাকেই ইস্ত্রি করা বলে। ভাল জামা হইলে, জামার সকল স্থানেই ইস্ত্রি করিতে হয়। কাপড়ের উপরের পাটে ইস্ত্রি করিতে হয়।

দুইটী ভাটিতে এক হাজার বস্ত্র পরিষ্কার করিতে নিম্নলিখিত খরচা হয়।

লোক দুই জনের ৬ দিনের বেতন মাসিক ৮৲ হিসাবে				১৷৵১০
সাবান	/২৷৷০ সের	...	...	৸০
সাজিমাটী	/৬ সের	...	...	১।৶
আতপ চাউল	/৪ সের	...	...	৷৷৵০
কাষ্ঠ ও কয়লা		...	...	২৲
গুল		...	...	৪।০
চূণ	/৷৵০	...	...	৶১০
			মোট—	১০৷৷০

ছোট বড় নানা প্রকার এক হাজার বস্ত্র পরিষ্কার করিতে উক্ত ভাগে দ্রব্যাদি লাগে। ভাল জামা ৮।১০টা ইস্ত্রি করিতে প্রায় এক শত গুল লাগে। এই জন্য গুলের খরচা বেশী। দ্রব্যাদির দামও বরং অধিক করিয়া ধরা হইয়াছে। যাহা হউক, হাজার বস্ত্র পরিষ্কারের ব্যয় ১০৷৷০ টাকা। উহারা দুই কুড়ি হিসাবে প্রায় বস্ত্র কাচে। অর্থাৎ ধোয়া বস্ত্রের মূল্য উহারা গ্রাহকের নিকট দুই কুড়ি ১৲ হিসাবে লয়। তাহা হইলে হাজার বস্ত্রে ২২৷৷০ টাকা হয়। এই ২২৷৷০ টাকা হইতে আরও কিছু খরচা কাপড় বাড়ী বাড়ী বিলির জন্য লোক এবং উহা আনিতে গরুর গাড়ি ভাড়া কিংবা নৌকাভাড়া ইত্যাদি লাগে। মোটের উপর হাজার বস্ত্র পরিষ্কৃত করিবার ৬ দিনের পারিশ্রমিক ৯৲ টাকার কম নহে। রোজ ১৷৷০ টাকা ধোপার আয়।

কাপড়ের দোকানের নূতন কাপড় ধৌত করিয়া ইস্ত্রি করিতে হইলে, তাহাকে দুই বার ভাটিতে চড়াইতে হয়। এ কারণ এই কাপড় কাচার মূল্য অধিক। তাহাতে লাভের কোন তারতম্য নাই; কেন না, মূল্যও যেমন অধিক, খরচও তেমনই আছে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস,
ডোমজুড়।

আলমডাঙ্গা গুড়ের বাণ।

আমার বাটী আলমডাঙ্গা পোষ্টাপিসের অন্তর্গত মধুপুর গ্রামে, (জেলা নদীয়া, মহকুমা চুয়াডাঙ্গা)। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি যথা,—ভোদো, জামজামি, ঘোষবিলে, খলে, নারায়ণকাঁদি, শ্রীনগর, কাথপাড়া, বাচ্‌লে প্রভৃতি গ্রামের অধিকাংশ চাষার ৩ পোন, ২ পোন, ১ পোন, যাহার খুব কম, অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধ পোনও খেজুর গাছ আছে। কেহ কেহ বা গাছ জমা লইয়াও গুড়ের বাণ করে। উক্ত কয়খানি গ্রামে আমার অনুমান ২।৫ লক্ষ খেজুর গাছ আছে। ৮০টা গাছে বা ৪ বুড়িতে এক পোণ এবং ২০টা গাছে এক বুড়ি হয়।

কার্ত্তিক মাসের প্রথম হইতে আমরা খেজুর গাছ ঝুড়িতে থাকি। এক মাস কেবল গাছ ঝোড়ার কার্য্য করিতে হয়। ঝোড়া অর্থাৎ খেজুর গাছের এক দিকের শাখা বা বেল্‌তগুলি কাটিয়া দিতে হয়। পত্র প্রসব করিবার মুকুল এবং তন্নিম্নের ২।৪টা বেল্‌ত রাখিয়া অপর বেল্‌ত-গুলি কাটিয়া পরিষ্কার করাকেই গাছ ঝোড়া বলে। তৎপরে কার্ত্তিকের শেষ বা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গাছে "লালমারা" হয়। এই লালমারাকে নলী দেওয়া বলে। নলী অর্থাৎ কঞ্চি কাটীর একটী নল। তৎপরে ঝোড়া শাখাগুলির সর্ব্বনিম্ন শাখার কিছু নিম্নে গাছের গাত্র দা' দিয়া চাঁচিয়া, লিখিবার যন্ত্র কলম-কাটি বা ষ্টীল পেনের নিবের ভাবে দা' দ্বারা গাছের গায়ে দাগ করিয়া দিয়া, কলমের মুখের নিকট উক্ত কঞ্চি কাটি ঠুকিয়া বসাইতে হয়। ইহাকেই নলী দেওয়া বলে। এই নলীর জন্যই খেজুরে গুড়ের অপর নাম "নলেন গুড়।"

প্রথম বর্ষে যে দিকের শাখা কাটিয়া ঝুড়িয়া দেওয়া হয়, দ্বিতীয় বর্ষে উহার বিপরীত দিকের শাখা ঝুড়িতে হয়। নলী বসাইবার সময় গাছ হইতে রস পড়িতে থাকে। যে গাছের রস নলী দিবার সময় পড়ে না, সে গাছে সে পালায় ভাঁড় বাঁধা হয় না। নলী বসাইবার সময় রস হাতে লাগিলেই সে গাছে তৎক্ষণাৎ ভাঁড় বাঁধা হয়। পালা অর্থাৎ অদ্য যে গাছে নলী বা লালমারা হইবে, সাত দিন আর সে গাছে কিছু করা

হইবে না; কেবল ভাঁড় বাঁধা থাকে। বেলা ৩টার সময় ভাঁড় বাঁধা হয়, সমস্ত রাত্রি থাকিয়া পরদিন ভোর ৬টার সময় ভাঁড় খোলা হয়। প্রত্যেক গাছে দুই দিন রস ঝরে, ভাল গাছ হইলে তিন দিনও রস ঝরে। তাহার পর ৪ দিন গাছ শুকায় অর্থাৎ আর রস ঝরে না। নলী বসাইবার সময় বৃক্ষের যে কোমল অংশ বাহির করা হয়, তাহা পুনরায় কাষ্ঠময় হইতে থাকে; এ কারণ ৭ দিন পরে আবার গাছে নলী বসাইতে হয়। প্রথম নলী যে স্থানে বসান হইয়াছিল, এ বার তথা হইতে উহা খুলিয়া, কিঞ্চিৎ উপরে একটা রেখা দিয়া তথায় আবার চাঁচিয়া নলী বসাইতে হয়। তাহা হইলে আবার ২।৩ দিন রস পাওয়া যায়, আবার ইহা শুকায়, রস থাকে না। সাত দিন পরে, এই দ্বিতীয় কাটের উপর রেখা দিয়া পুনরায় গাছ চাঁচিয়া তথায় নলী বসাইতে হয়। এইরূপ ৭ দিন অন্তর গাছের উর্দ্ধাংশে ক্রমশঃ নলী বসান হইয়া থাকে। প্রতি ৭ দিন অন্তর নলী বসান হয় বলিয়া ইহাকে আমরা পালা বলি। কার্য্যের সুবিধার জন্য কৃষকের যত গাছ থাকে, তাহাকে সাত ভাগ করিয়া উহার এক ভাগ বৃক্ষে প্রথম দিন সে নলী বসায়। দ্বিতীয় দিন অপর এক ভাগে নলী বসায়। তৃতীয় দিন অপর এক ভাগে নলী মারে। এইরূপ পর পর সাত দিনে সাত ভাগ বা সমুদয় গাছ গুলিতে নালমারা হইয়া যায়। প্রথম দিন সাত ভাগের এক ভাগের যে গাছগুলিতে নলী বসান হইয়াছিল, অষ্টম দিবসে আবার সেই গুলির পালা পড়ে অর্থাৎ সেই গুলিতে পুনরায় নলী বসাইতে হয়। বেশী কাজ উপস্থিত হইলে, তাহা এইরূপ ভাগ করিয়া লইতে হয়। কে বলে? এদেশী চাষার বুদ্ধি নাই!

কোন দিন রাত্রিতে বৃষ্টি হইলে পরদিন গাছের ভাঁড়ে যে রস থাকে, তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়; কেন না, সে রসে জলীয়াংশ বেশী থাকাতে তাহাতে গুড় হয় না। এ জন্য মেঘ দেখিলে আমরা ভাঁড় বাঁধি না। কুজ্ঝটিকার দিনও আমরা ভাঁড় বাঁধি না। ভাঁড় চাপা দিয়া রস সংগ্রহের কৌশল বাহির হইলে আমাদের এ কাজে আরও সুবিধা হইতে পারে।

প্রথম দিন কাটের রসে মিষ্টি কম, কিন্তু সুগন্ধি বেশী হয়। ২।৩ কাটের পর রস ঘন লালচে বর্ণের হয়। এই রসই গুড় করিবার পক্ষে উপযোগী। প্রথম এবং দ্বিতীয় কাটের রস জ্বাল দিয়া আমরা যে গুড়

করি, তাহা গুড়ের ভাঁড়ে না রাখিয়া, সান্‌কিতে রাখিয়া পাটালি করিয়া বিক্রয় করি। ইহা খাইতে সুগন্ধিযুক্ত, সুস্বাদু, মূল্যও গুড় অপেক্ষা বেশী হয়।

যাহারা গাছ কাটে, তাহাদিগকে "শিউলী" বলে। কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত এই পাঁচ মাসে প্রত্যেক শিউলীর ফুরান বেতন মোট ৩০৲ টাকা মাত্র; এবং প্রত্যহ খোরাকী ও বৎসরে ১ খানা নব বস্ত্র দিতে হয়। অধিক গাছ হইলে শিউলী এইরূপ বেতনে রাখা হয়। অল্প গাছ হইলে ১ বুড়ি বা ২০টা গাছে ২৲ টাকা হিসাবে দিতে হয়। সে পাঁচ মাস কাজ করিয়া ২৲ টাকা লয়। ইহাতে আর খোরাকী লাগে না। এ দেশে যাহারা গাছ জমা লইয়া এ কাজ করে, তাহারা কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত এই পাঁচ মাসে ৮।৯টা গাছে ১৲ টাকা দিয়া থাকে। এই হিসাবে যত গাছ ইচ্ছা, লওয়া চলে। খেজুর গাছ ৪ বৎসরের হইলেই তাহার রস হয় এবং ৩০।৪০ বৎসর পর্য্যন্ত রস দেয়।

বাণ বা গুড় জ্বাল দিবার উনান আমরা পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখি। জ্বাল দিবার জন্য আমাদের প্রায় কাষ্ঠ ক্রয় করিতে হয় না; কেন না, কার্ত্তিক মাসে যখন গাছ ঝুড়ি, সেই সকল শাখার দ্বারা জ্বাল দিয়া থাকি। ক্বচিৎ ২।১টা গাছ ক্রয় করিয়া, তাহার দ্বারা জ্বাল দিয়া থাকি।

যাহা হউক, জ্বাল দিবার কাঠের খরচা আমাদের প্রায় লাগে না। আমরা ৩।৪ হস্ত উচ্চ করিয়া চারিদিকে ইষ্টকের ভিত দিয়া, নিম্নে ফাঁক রাখিয়া উপরে ৪টা, কেহ কেহ বা ৬টা জালা বসাইয়া দেয়, অর্থাৎ মনে করুন, একটী ক্ষুদ্র ইষ্টকের ঘর, তাহার ছাদও আছে; সেই ছাদের উপর যেন চারি স্থানে ৪টী গর্ত্ত খুঁড়িয়া ৪টা জালা পোতা হয়। জালাগুলির তলদেশ ঘরের ভিতর ঝুলিতে থাকে এবং ঘরের ভিতর আগুন জ্বালিয়া জ্বাল দেওয়া হয়, আর আমরা যেন ছাদের উপর স্থলবিশেষে বসিয়া গুড় হইল কি না দেখি! এই ভাবের উনানকেই "বাণ" বলে। প্রতি জালায় সাত মণ পৌণে সাত মণ রস ধরে। ভোর ৬টায় রস নামান হয় এবং সকাল ৭টা হইতে রস জ্বাল দিতে হয়। প্রত্যহ রস জ্বাল দেওয়া হয়; কেন না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পালা করিয়া গাছ কাটা হয়, কাজেই প্রত্যহ যেমন রস পাওয়া যায়, সেইরূপ প্রত্যহ জ্বালও দিতে হয়। বেশী রস হইলে বেলা ১১টার মধ্যে জ্বালের কার্য্য শেষ হয়, অল্প রস হইলে ৯টার মধ্যে জ্বালের কার্য্য সমাধা হয়। অগ্নি-তাপে প্রথমে রস লাল হয়; পরে ফুট্

ধরিয়া, ক্রমশঃ খুব ঘন ঘন ভাবে ফুটিতে থাকে। ইহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, গুড় হইয়াছে।

প্রত্যেক গাছে প্রত্যহ ৴১ সের হইতে (ভাল গাছ হইলে) ৴২ সের পর্য্যন্ত রস পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম কাটে সমস্ত রাত্রিতে ৷৷০ সের বা ৵০ পোয়া রস হয়। প্রত্যেক গাছের ভাঁড় খুলিয়া আনিয়া, সর্ব্ব প্রথমে আমরা ১৭।১৮ সের রস ধরে এমন কলসীতে রস রাখি। এই রূপ ১৫।১৬ কলসী রস আমরা বাণের ৪টা জালায় ঢালিয়া দিয়া জ্বাল দিয়া থাকি। ৩০।৩২টা গাছের রসে সতের সেরী কলসী ১টা পূর্ণ হয়। কিন্তু কমজুরী গাছ হইলে ৪০।৫০টা গাছে ৷১৭ সের রস হয়। মাটী এবং বৃক্ষের ধাত অনুসারে গাছের শক্তির তারতম্য হয়।

প্রত্যেক ৷১৭ সেরী কলসীর ১৫।১৬ কলসী রসে অর্থাৎ ধরুন, ১৬ কলসী ৷১৭ সের হিসাবে ৬৮২ সের রস জ্বাল দিয়া আমরা ৷৷৮ সের গুড় পাই। ৷৷৮ সের গুড় গড়ে ২৷৷০ টাকা মণ ধরিলে ১৶০ আনা দাম হয়। খরচের হিসাব পূর্ব্বেই ব'লেছি, ৮।৯টা গাছ ৫ মাসের ভাড়া ১৲ টাকা, শিউলীর বেতন ৫ মাসে ৩০৲ টাকা, জ্বালের খরচা নাই। আমাদের প্রধান খরচা ভাঁড়, কলসী এবং জালা। যাহা হউক, সমুদয় খরচা প্রত্যহ ৸০ বার আনা (যদিও এত লাগে না,) বাদ দিলেও প্রত্যহ ১৲ টাকা আমরা এ কাজে নিশ্চিত পাইয়া থাকি। এইরূপ প্রায় ৫ মাস প্রত্যহ ১৲ টাকা হিসাবে পাই।

শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র মণ্ডল।

সূতার ব্যবসায়।

এদেশের এমনই দুর্দ্দশা যে, লাল সূতার দরকার হইলে বিলাতি মাল ভিন্ন তাঁতিদিগের আর গতি নাই। তাঁতিরা বিলাতি সূতা কিনিয়া আনে, এই পর্য্যন্ত; কিন্তু বিলাতি লাল সূতার ভিতর যে কত ব্যাপার আছে, তাহারা তাহার কিছুই জানে না।

যতটুকু জানে, তাহা এই ;—ভারি ওজনের সূতা ও হাল্‌কা ওজনের সূতা। পার্থক্য জিজ্ঞাসা করিলে, এই পর্য্যন্ত উত্তর পাওয়া যায় যে, ভারি ওজনের সূতার

দশ পোন বাণ্ডিলের ওজন ১২॥০ হইতে ১৩॥০ পোন, আর হাল্‌কা ওজনের সূতার দশ পোন বাণ্ডিলের ওজন ১০॥০ হইতে ১১॥০ পোন পর্য্যন্ত।

সাধারণ পাঠকের জন্য এইখানে দুই একটী কথার অর্থ বলিয়া দেওয়া উচিত। পোন অর্থে ইংরাজি পাউণ্ড বুঝিতে হইবে। দশ পোন বাণ্ডিলের ওজন তের পোন কথাটা যেন সমস্যার মত। কিন্তু কারবারি লোকের কাছে ইহার অর্থ অতি সহজ। ব্যবসায়ী লোক সূতার দুই রকম বাণ্ডিল দেখিতে পায়—পূরা বাণ্ডিল ও আধলা বাণ্ডিল। পূরা বাণ্ডিলে দশ পোন কোরা সূতা রং করিলে যত সূতা হইতে পারে, (১১॥০ পোন হউক আর ১৩ পোন হউক) তত সূতা থাকে, আর আধলা বাণ্ডিল তাহার অর্দ্ধেক। বাণ্ডিলের দামও ঐ কোরা সূতার হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকে। ৸৵০ চৌদ্দ আনা করিয়া লাল সূতার পোন কিনিলে একটা ১৩ পোন বাণ্ডিলের দাম ১০ × ৸৵০ অর্থাৎ ৮৸০ বই আর কিছু নহে।

এখন কাজের কথা বলা যাউক। ভারি ওজন ও হাল্‌কা ওজন সূতার মারপেঁচ বুঝাইয়া দিই। একটা কথা প্রথমে বলিলেই হইবে যে, ভারি ওজন সূতা পাকা মাল, আর হাল্‌কা ওজনের সূতা ব্যবসায়ের জুয়া-চুরির একটা কল বিশেষ। কোরা সূতার হিসাব দেখুন ;—

গজ	দৈর্ঘ্য		
১॥০	১ সূতা		
১২০	৮০ ,,	১ লি	
৮৪০	৫৬০ ,,	৭ ,,	১ গুছি

তাহার পর ওজন ও দৈর্ঘ্য

২০ নম্বরের সূতা	১ পাউণ্ডে	১ মোড়া
৩০ ,,	১ ,,	১॥০ ,,
৪০ ,,	১ ,,	২ ,,
৫০ ,,	১ ,,	২॥০ ,,
৬০ ,,	১ ,,	৩ ,,
৭০ ,,	১ ,,	৩॥০ ,,
৮০ ,,	১ ,,	৪ ,,
৯০ ,,	১ ,,	৪॥০ ,,
১০০ ,,	১ ,,	৫ ,,

তাহার পর আর একটা হিসাব—

সূতার যত নম্বর, প্রতি পাউণ্ড সূতায় তত গুছি থাকে, যথা,—

২০ নম্বর	সূতায়	২০	গুছিতে	১	মোড়া
৩০ ,,	,,	৩০	,,	১	,,
৪০ ,,	,,	৪০	,,	১	,,
৫০ ,,	,,	৫০	,,	১	,,
৬০ ,,	,,	৬০	,,	১	,,

এই হিসাবগুলি মনে রাখিলেই হাল্‌কা ও ভারি ওজন সূতার প্রভেদ বুঝা যাইবে। এখন—

৪০ নম্বর লাল সূতায় ৪০ গুছি, অর্থাৎ ৮৪০ × ৪০ = ৩৩৬০০গজ সূতা আছে।

৫০ নম্বর লাল সূতায় ৫০ গুছি অর্থাৎ ৮৪০ × ৫০ = ৪২০০০ গজ সূতা আছে।

আমরা বলিয়াছি ভারি ওজন লাল সূতা পাকা মাল; অর্থাৎ—

৪০ নম্বর ভারি ওজন লাল সূতায় পাকা ৩৩৬০০ গজ সূতা আছে। কিন্তু ৪০ নম্বর হালকা ওজন লাল সূতায় এত সূতা নাই। হাল্‌কা ওজন সূতা, জুয়াচুরি মাল। বেশী নম্বরের সূতা হইতে ভাঙ্গিয়া করা হয়। দেখা যাউক,—

যদি ৫০ নম্বর সূতা হইতে ৪০ নম্বর হালকা ওজন করা যায়, তাহা হইলে কি হইবে? ৫০ নং ৫০ গুছি; ৪০ নম্বর ৪০ গুছি। ৫০ নম্বর সূতা হইতে ১০ গুছি বাদ দাও; অর্থাৎ ৮৪০০ গজ মাল সরাইয়া লও, তাহা হইলেই হালকা ওজনের সূতা হইল। অবশ্য ৫০ নম্বরের সূতা ৪০ নম্বর অপেক্ষা মিহি। সেই মিহিত্ব রং দিয়া পূরণ কর; আর কিছু আবশ্যক নাই।

এই জুয়াচুরি অনেক দিনের নহে। স্কটলণ্ডে প্রায় ২০ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে, আর জর্ম্মানিতে প্রায় দুই বৎসর মাত্র। আজি কালি রং, টান প্রভৃতি গুণ দেখিতে গেলে, জর্ম্মানির লাল সূতা সকল দেশের লাল সূতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু গ্লাস্‌গোর লালের দাম কম বলিয়া তাহার কাটুতি বেশী। ম্যাঞ্চেষ্টরেও লাল সূতার কারখানা আছে। বিলাতে ইংরেজদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত নাম কয়টি বিখ্যাত;—

এ, আর, ইউরিং জন; আর, ইউরিং; টি, পি, মিলার; ষ্টাইনার; ষ্টারলিং; মাথিসন ও রিড।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

মেদিনী-বান্ধব। মেদিনীপুর, লক্ষ্মী প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মিত্র দ্বারা প্রকাশিত। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। পঞ্চম বর্ষ চলিতেছে। এই পত্রিকাকে কিছু নূতন উপায়ে পরিচালিত করা হয়। কেননা, আজ কাল প্রায় প্রত্যেক জেলায় জেলায় সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ পত্রই স্বজেলার সংবাদ খুব কম দিয়া, বাজে ছড়া এবং রং তামাসার প্রবন্ধ দিয়া কাগজ পূর্ণ করা হয়; মেদিনীবান্ধব তাহা করেন না। মেদিনীবান্ধব কেবল মেদিনীপুরের সংবাদ, মেদিনীপুর সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। মেদিনী-বান্ধবের সময় ভাল—ঠিক সুনিয়মে বাহির হয়। আশা করি, মেদিনী-বান্ধব স্বজেলার ধনবান্, মহাজন, জমিদার, পণ্ডিত প্রভৃতির জীবনী এবং তথাকার শিল্প বাণিজ্যের বৃত্তান্ত লিখিবেন। আমরা এই পত্রকে বড়ই ভালবাসি।

পঞ্জিকা (সন ১৩১০ সাল) ও ডায়েরি। শ্রীযুক্ত বাবু বটকৃষ্ণ পাল কোং কর্ত্তৃক ৭ নং বন্‌ফিল্ডস্ লেনস্থ তাঁহাদের প্রসিদ্ধ ঔষধের দোকান হইতে ও ৭৭ নং বেণেটোলা ষ্ট্রীট, নিজ বাটী হইতে বিনামূল্যে বিতরিত। এখানি বিনামূল্যের পঞ্জিকা হইলেও, অন্যান্য বিনামূল্যের পঞ্জিকার ন্যায় নহে। সকলেই জানেন যে, বটকৃষ্ণ পাল কোং এখন এখানকার একটী প্রধান ধনী ব্যবসায়ী। তাঁহারা অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া, বিনামূল্যের পঞ্জিকার নিন্দা মোচন করিয়াছেন। এখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হইয়াছে; কারণ, প্রচলিত সমস্ত প্রধান পঞ্জিকাগুলির মত একত্র করিয়া পণ্ডিতগণের পরামর্শে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করাইয়া, ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্জিকাখানি আকারেও বৃহৎ হইয়াছে। বিনামূল্যে এরূপ পঞ্জিকা দেওয়া সহজ ব্যয়-সাধ্য নহে। বটকৃষ্ণ বাবু আজ দুই মাসকাল প্রত্যহ শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিনামূল্যে ইহা দান করিয়া, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতঃ কৃতার্থ হইতেছেন। পঞ্জিকা-প্রকাশের ভার উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা ; বৈশাখ, ১৩১০ সাল।

কাসাভা আলুর চাষ।

(৫)

(লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, M. A, M. R. A. C, and F. H. A. S.)

মান্দিয়োকা দুই জাতীয়। একের মূল গুলি খাইতে মিষ্ট, ইহাই মানিহোৎ আইপি। অপরের মূল গুলি খাইতে তিক্ত, ইহাই জানিফা মানিহোৎ। ইহার রসে প্রুসিক এসিড্ থাকিবার কারণ ইহা বিষাক্ত। কিন্তু এই রস চাপ দিয়া বাহির করিয়া লইলে, অথবা উত্তাপ সহযোগে উড়াইয়া দিলে জানিফা মানিহোৎও খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা যায়। হঠাৎ দুই জাতীয় মানিহোৎ দেখিলে, উহাদের মধ্যে কোনই প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে প্রভেদ-চিহ্ন প্রতীয়মান হইবে। বিষাক্ত মানিহোতের পত্র ও পল্লবগুলি কিছু ঘোর বর্ণের, আর মূলগুলি উপরিস্থ লোল ত্বকের নিম্নেই ঈষৎ বেগুনী রং বিশিষ্ট। মিষ্টজাতীয় মানিহোতের মূলাবরণ এরূপ বেগুনী রংএর হয় না। কিন্তু প্রভেদ জানিবার সহজ উপায় এক খণ্ড মূল আস্বাদ করিয়া দেখা। একের আস্বাদ বাদামের ন্যায় মিষ্ট, অপরের আস্বাদ তিক্ত ও কদর্য্য। প্রথমে মিষ্ট মানিহোৎ লাগানই কর্ত্তব্য ; কারণ ইহার মূলগুলি সহজেই আলুর ন্যায় অনেকে কাঁচা অবস্থায় আহার করিবে। ক্রমশঃ কল কারখানা স্থাপিত করিয়া তিক্ত মানিহোতের চাষও প্রচলন করা যাইতে পারে। লোকে বলে, তিক্ত মানিহোতের ফলন অধিক, কিন্তু আমি এরূপ দেখি না। তিক্ত মানিহোতের আবাদের একটী মাত্র কারণ আমি দেখি, অর্থাৎ পোকা লাগা ও গরু ছাগলের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া। উভয় জাতীয় মানিহোতই এখানে সুন্দর জন্মে, কিন্তু তিক্ত জাতীয় গাছের মূল চুরি যায় না এবং ইহার পাতাও গরু ছাগলে খায় না। প্রত্যেক গাছ হইতে তিন হইতে ছয়টী পর্য্যন্ত স্থূলাকারের মূল পাওয়া যায়। ইহাদের ওজন তিন সেরেরও অধিক। ইহাদের উপরিভাগে

পাটল বর্ণের একটী আবরণ থাকে। আবরণটী উঠাইয়া লইলে মূলের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ ভাবে অথবা খণ্ড করিয়া সিদ্ধ করিয়া, অথবা অগ্নিসংযুক্ত ছাইয়ের মধ্যে দগ্ধ করিয়া আহার করা যায়। উভয় প্রকারেই ইহা খাইতে অতি সুন্দর, এবং ব্রেজিলে কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই ভাত অপেক্ষা ইহা অধিক আগ্রহ সহকারে ভক্ষণ করে। মূলগুলি অধিককাল ধরিয়া রক্ষা করিবার কোন আয়োজন করিতে হয় না। মৃত্তিকার মধ্যে থাকিয়া ইহারা তাজা অবস্থায় থাকে ও ক্রমশঃ আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। চাউল ও মান্দিয়োকার রাসায়নিক সংগঠন একই প্রকার। আপাততঃ এই গাছ অতি সত্বর ভিন্ন ভিন্ন জেলায় লাগাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং ইহার মূল এক প্রকার সুন্দর আলু, এই বলিয়া ইহার ব্যবহার প্রচলিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ক্রমশঃ অন্যান্য রূপে মূল গুলি ব্যবহারে আনা যাইতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষায় বন্দোবস্ত হইতে পারে।

মূলগুলি আবরণচ্যুত করিয়া চূর্ণ করিতে হয়। হাতে বা কলে চালন কুরুনী দ্বারা মূল গুলি চূর্ণ বা মণ্ডাবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায়। এই মণ্ডকে চাপ দ্বারা রস-বিযুক্ত করিয়া লইয়া তাম্রপাত্রের উপর উত্তপ্ত করিতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যে ছাতু প্রস্তুত হয়, তাহাই এখানে সকলে আহারের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ছাতু হইতে ট্যাপিওকা এবং এক প্রকার সুন্দর শ্বেতসার প্রস্তুত হয়। এই শ্বেতসারকে এখানে লোকে "পোল ভিল্লে" বলিয়া থাকে, ইংলণ্ডে ইহা "ব্রেজিলিয়ান্ এরারুট" বলিয়া বিখ্যাত। শুষ্ক ছাতু অপক্ক অবস্থাতেও আহারের জন্য ব্যবহৃত হয়। নানা খাদ্যের সহিত পক্কাবস্থায়ও ইহার ব্যবহার আছে। এই খাদ্যের সহযোগে মুখের মধ্যে অধিক পরিমাণ লালা নির্গত হয় বলিয়া, ইহা পরিপাক কার্য্যের সহায়তা সম্পাদন করে। ফুটন্ত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 'গোলা' প্রস্তুত করিয়া লইয়া মৎস্যের উপর লাগাইয়া মৎস্য ভাজিলে খাইতে উত্তম হয়। এই গোলা হইতে ছোট ছোট বড়া ভাজাও প্রস্তুত হয়। থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া রাখিয়া দিলে ইহা অনেক কাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। একারণ ইহা এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে অনায়াসে ব্যবসায়ের জন্য লইয়া যাওয়া যায়।

লিভিংষ্টোনের আফ্রিকা ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ২১ অধ্যায়ে এই লেখা আছে :—
"উহারা প্রধানতঃ মানিয়োক্ খাইয়া জীবনধারণ করে। কাঁচা, পোড়া

অথবা সিদ্ধ করা অবস্থায় উহা আহার করে। এই গাছ অনাবৃষ্টিতেও উত্তম জন্মে। অন্যান্য গাছের ন্যায় এ গাছ অনাবৃষ্টি দ্বারা শুকাইয়া যায় না। ইহাতে পোকা লাগে না। ইহার চাষে খরচ এত কম যে, এঙ্গোলার বাজারে এক পেনি দিলে দশ পাউণ্ড মানিয়োক পাওয়া যায়।"

ডাক্তার গানিং লর্ড লোর্ণকে ২১ ডিসেম্বর, (১৮৯৬) তারিখে যে পত্র লেখেন, তাহাতে নিম্নলিখিত কথা লেখা আছে :—

"আমার বিশ্বাস, এই বিষয়টা ভারত-সচিবের গোচর করা নিতান্ত আবশ্যক। ভারত-সচিব তাঁহার জন কয়েক ভাল ভাল পরামর্শ-দাতাকে আমার সহিত এ সম্বন্ধে তর্ক করিবার জন্য পাঠাইতে পারেন। অথবা এ বিষয়ে ইম্পিরিয়াল ইনিষ্টিটিউটের ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রধান প্রধান কয়েক জন সদস্যের সমক্ষে আলোচনা করা যাইতে পারে। এই সকল সদস্য এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, অনায়াসে বলিতে পারিবেন। আমি যদিও বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি এবং আমার শরীরের অবস্থা যদিও নিতান্ত মন্দ, তথাপি যাঁহাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে যাহা জানি, তাঁহাদের সমস্ত গোচর করিব। ষ্টান্‌লি, সিলস্, বিশপ-টাকার প্রভৃতি, যাঁহাদের আফ্রিকা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই মানিয়োক যে ঈশ্বর দ্বারা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের প্রতিকার স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছে, এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। যখন অনাবৃষ্টি দ্বারা ধান্য ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী নষ্ট হইয়া যায়, তখন মানিয়োক খাইয়া কোটি কোটি লোক বাঁচিয়া যাইতে পারে। দেশে আপনার খ্যাতি-সম্পত্তি আছে, আপনার স্বদেশ-হিতৈষণা আছে, আপনি অনায়াসে এই বিষয়টী লইয়া দেশের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারেন। আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের উপকারার্থ আপনাকে এ বিষয় লইয়া আন্দোলন উপস্থিত করিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি।"

দক্ষিণ আমেরিকার লান্ কায়িতান্ নগর নিবাসী রবার্ট টম্‌সন্ ২৫ শে জানুয়ারি, (১৮৯৭) তারিখে ভারত-সচিবকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতেও কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল ;—

"অনেক জাতীয় কাসাভা হইতে অতি সুন্দর মুখরোচক মূল সংগৃহীত হইয়া থাকে। মূল গুলি উঠাইবার অব্যবহিত পরেই, পাক করিয়া খাইলে

আলু অপেক্ষাও ভাল লাগে। আলুও এখানকার পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। কাসাভা, মানিয়োক বা ইউকা জন্মাইবার পক্ষে আর একটী সুবিধা এই, ইহা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নিম্ন ভূভাগ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চ ভূমি পর্য্যন্ত সকল স্থানে সমান জন্মে। * * * কিন্তু ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা অধিককাল স্থায়ী ও অনাবৃষ্টির সময়েও সুন্দর জন্মে, এবং মরুভূমির ন্যায় জমিতেও জন্মে। একারণ ধান্য ও কাসাভা দুই ফসলই একই ভূভাগে জন্মান উচিত। যদি ধান্য নষ্ট হয়, কাসাভা দ্বারা জীবন রক্ষা হইতে পারে। * * * আমার এস্থলে বলা উচিত যে, আর এমন কোন খাদ্যপ্রদ ফসল নাই, যাহা মানিয়োকের তুল্য অনাবৃষ্টিতে উত্তম জন্মে। যখন আর আর সমস্ত ফসল অনাবৃষ্টিবশতঃ মরিয়া যায়, যখন গরু বাছুর জলাভাবে ভয়ানক কষ্টে দিন যাপন করিয়া শীর্ণ হইয়া যায়, তখনও দেখা যায়, এখানে কাসাভা সতেজে জন্মিতেছে।

উদ্ভট-লিপি-কৌশল।

অ আ ই ঈ প্রভৃতি ক খ গ ইত্যাদি বাঙ্গালা ভাষার সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র। এ সকল চিহ্নগুলির অবয়ব মনে থাকিলেই অক্ষর পরিচয় হইয়া যায়। পরন্তু, ভাবের সঙ্গে ঐ সকল সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি মিলাইয়া কাগজে কলম ও কালী দিয়া আঁচড় দিতে পারিলেই লেখার সৃষ্টি হয়। চেষ্টা করিলে, আমরা প্রত্যেকে ঐরূপ নূতন সঙ্কেত দ্বারা নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করিতে পারি। অথবা চলিত অক্ষরের মধ্যে সাজাইবার তারতম্যে নানা প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি।

এই কৌশল দ্বারা যে কোন গোপনীয় কথা, অনায়াসে পোষ্টকার্ডে লেখা চলিবে। ব্যবসায়ীরা দর ইত্যাদি যাহা গোপনে মোকামে গোমস্তাকে লিখিয়া থাকেন, তাহাতেও এই কৌশলে প্রকাশ্যে পোষ্টকার্ডে লেখা চলিবে। যাহার সঙ্গে সঙ্কেতে কথা কহিতে হইবে, বা লিখিতে হইবে, তাহাকে অগ্রে সঙ্কেতের "সাট" গুলি জানাইয়া রাখিবেন; এবং নিজেও

সেই "সাট" ধরিয়া লিখিয়া দিবেন। কয়েকটী "সাট" এখানে নমুনাস্বরূপ দেখান যাইতেছে।

প্রথম কৌশল।

ক খ গ ঘ ইত্যাদি আমাদের বঙ্গভাষায় ৩৪টী অক্ষর আছে। ঐ চৌত্রিশটী অক্ষরকে যদি ৩৪টী গণিত অক্ষরে ধরা যায়, তাহা হইলে কি হয়? যেমন মনে করুন, 'ক' এক, 'খ' দুই, 'গ' তিন, 'ঘ' চারি, 'ঙ' পাঁচ ইত্যাদি। এখানে ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ গণিতাক্ষরে রহিল। তাহার পর স্বরবর্ণ যথা,—অ আ ই ঈ ইত্যাদি। উহাদের রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ গণিতাক্ষরের সহিত যোগ দিয়া লিখিলে, কি হইবে?

এইরূপ হইবে;—৩০ ২৭ ঈ ২৭; ৩১ উ,　; ১৭ আ, ১ আ, ১ এ;　আ,　J; ২৭, ৩৪ আ; ১, ৩৩ এ। এরূপ সাঙ্কেতিক লেখার য (J) ফলা, র (´) ফলা ঠিক রাখিয়া গণিতাঙ্কের সহিত যৌগিকভাবে রাখিতে হইবে। যেমন উপরে (J) য ফলা আমরা রাখিয়াছি।

এক্ষণে আপনারা উহা পাঠ করুন। ঐ লেখা পড়িবার অগ্রে একখানি কাগজে ক খ হইতে ঁ পর্য্যন্ত ৪২টী অক্ষর লেখা কর্ত্তব্য, এবং ঐ ৪২টী অক্ষরের নিম্নে নিম্নে ১ ২ ৩ ইত্যাদি অঙ্ক রাখা উচিত; তাহা হইলে পড়িতে কষ্ট হইবে না। আমরা এখানে তাহা রাখিয়া দিতেছি।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ।	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ।	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ত	থ	দ	ধ	ন।	প	ফ	ব	ভ	ম।	য	র	ল	ব	শ
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
স	ষ	হ	ক্ষ।		য়	ড়	ঢ়	্	ৎ	ং	ঃ	ঁ।		
৩১	৩২	৩৩	৩৪		৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২		

এইবার দেখুন,—প্রথম লিখিয়াছি ৩০ ত্রিশ। ত্রিশে কি অক্ষর পড়িয়াছে?—শ। তাহার পর লেখা হইয়াছে ২৭; সাতাশে কি অক্ষর?—র। তাহার পর একটী 'ঈ' আছে; উহাকে ঐ 'র' গায়ে যোগ দিউন। র-ঈ, রী হইল। তাহার পর পুনরায় ২৭ আছে, অতএব উহা 'র'। এক্ষণে ঐ তিনটী কথায় কি শব্দ হইল?—প্রথম ৩০ 'শ' ২৭শে 'র' তাহার গাত্রে থাকায় ঈ থাকায় রী, আবার ২৭শে র, মিলাইয়া 'শরীর' এই শব্দটী হইল। এখন আপনারা উহা পর পর

পড়িয়া যাউন। ৩১ উ; ৩১শে কি অক্ষর?—স, তাহার গাত্রে 'উ' অতএব স-উ সু; তাহার পর আছে, এখানে দুইটী ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র আছে বুঝিতে হইবে। ৩১শে স, ১৭য় থ; অতএব স-থ স্থ। পূর্ব্বে শরীর শব্দ আছে, তাহার পর সু হইয়াছে, এখন 'স্থ' হইল। একত্র শরীর সুস্থ এই দুইটী শব্দ বাহির হইল। এক্ষণে অপরাপর শব্দ আপ-নারা বাহির করুন। উহার ভিতর এই কয়েকটী বাক্য লিখিত আছে।

"শরীর সুস্থ থাকাকে স্বাস্থ্যরক্ষা কহে।"

দ্বিতীয় কৌশল।

যদ্যপি কোন গোপনীয় পত্র পোষ্টকার্ডে লেখা হয়, এবং ঐ পত্রের প্রত্যেক অক্ষরের পার্শ্বে যদি অপর একটী বর্ণ ইচ্ছানুসারে বসান যায়, তাহা হইলে কি হয়? লেখা অপ্রচলিত অব্যক্ত ভাষায় পরিণত হয়।

যেমন মনে করুন, আমি একখানি পোষ্টকার্ডে লিখিলাম, "প্রেম অর্থে ভালবাসা। গৃহ- সংসারে সকল বস্তুতেই প্রেম মিশান।

আমি ঐ লেখা এইরূপ যৌগিক রাখিলাম, "প্রেই মই অআ র্থেঙ্গ ভাঙ্গ লউ বাএ সাক। গৃধ হস সংর সাশ রেই সই কউ লউ বএ স্তুও তেই ইক্‌ প্রেচ মকি মিঅ শাই নত।" আপনার সহিত বলা রহিল যে, আমার লেখা পড়িবার সময় কেবল প্রথম অক্ষরগুলি ধরিয়া পড়িবেন; অর্থাৎ প্রথম একটী অক্ষর ধরুন, দ্বিতীয়টী ফাঁক দিয়া তৃতীয়টী ধরুন; ঐরূপ চতুর্থ ফাঁক দিয়া পঞ্চমটী লউন ইত্যাদি; মোট কথা, মাঝে মাঝের অক্ষরগুলি ফাঁকা, কিছুই নহে। কথা অব্যক্ত করিবার জন্য উহা ইচ্ছানুসারে ব্যবহৃত হইবে।

প্রেই মই অআ র্থেঙ্গ ভাঙ্গ লউ বাএ সাক, ইত্যাদির প্রথম অক্ষর যথা, প্রেই 'প্রে' মই 'ম' অআ 'অ' র্থেঙ্গ 'র্থে' ভাঙ্গ 'ভা' লউ 'ল' বাএ 'বা' সাক 'সা'। একত্র প্রেম অর্থে ভালবাসা ইত্যাদি। এ কৌশলটী পূর্ব্ব কৌশল অপেক্ষা অনেক সহজ। যে অক্ষরগুলিতে কোটে-শান দেওয়া হইল, তাহাই পাঠ করুন, বাক্য উপলব্ধি হইবে।

তৃতীয় কৌশল।

ইহা প্রায় পূর্ব্বোক্ত কৌশলের মত, কিন্তু ইহার দ্বিতীয় বর্ণের মিল আছে। দ্বিতীয় বর্ণ কেন, কৌশল খাটাইলে তৃতীয় ও চতুর্থ ইত্যাদি তত্যোধিক বর্ণের মিল হইবে। এ লেখা পড়িতেও সহজ বোধ হইবে।

ইহা ফুলষ্টপ (।) দেখিয়া মিলাইয়া রাখিতে হয়। যেমন—আমি লিখিলাম "কিছু ভূষা ও তৈল, যে কোন তৈল হউক। একত্র মিলাইয়া কাগজের
• • • • • • • • * * * * * * * * *
গাত্রে মাখাইলে, কার্ব্বন পেপার হয়। ইহা পোষ্ট আফিসে লাগে।"

এখানে দেখিতে হইবে, কোথায় কমা ও কোথায় থামিবার চিহ্ন আছে। 'তৈলের' নিকট একটী কমা (,) আছে এবং 'হউক' এই শব্দের পর থামিবার (।) চিহ্ন আছে। এখন ঐ পর্য্যন্ত মিলান হউক। মিলাইবার উপায় যথা,—একটী করিয়া • চিহ্নিত অক্ষর লও এবং একটী করিয়া তারা চিহ্নিত অক্ষর লও, কি যে ছুকো ভূন ষাতৈ ওল তৈহ লউ ক।
° * ° * ° * • * ° * ° * ° * ° * *

এক্ষণে শূন্য চিহ্নিত অক্ষরগুলি অগ্রে পাঠ করুন, তাহার পর তারা চিহ্নিত অক্ষরগুলি পড়ুন; দেখিবেন, ° চিহ্নিত অক্ষরগুলিতে "কিছু ভূষা ও তৈল" এবং তারা চিহ্নিত অক্ষরে "যে কোন্ তৈল হউক" ইহাই বুঝাইতেছে।

আমরা এখানে শূন্য এবং তারাচিহ্ন দিয়া দেখাইলাম, কিন্তু সঙ্কেত জানা থাকিলে উহা না দিলেও চলে। যেমন, "একা কর্ব্ব ভ্রন মিপে লাপা ইর য়াহ কায়। গই জেহা রপো গাষ্ট ত্রেআ মাপি থাশে ইলা লেগে।"

পাঠ করুন। প্রত্যেক শব্দের প্রথম অক্ষরগুলি ধরিয়া অগ্রে পড়ুন; পরে শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরগুলি ধরুন।

ঐরূপ তিন অক্ষর পর পর মিলাইবার সঙ্কেত যথা,—

কেকুকে	তোটাশি	রেঘাক্ষা	শিসদি	থাখুলে	লজেরে	পাকএ	খিতত
১২৩	১২৩	১২৩	১২৩	১২৩	১২৩	১২৩	১২৩
বাআবা	সাহসা	বারিবে	ড়ীয়েধে	বাঁঅগু	খিবিই	তেরতে	ত
১২৩	১২৩	১২৩	১২৩	১২৩	১২৩	১২৩	২

পাঠ করুন। যতগুলি "১" আছে, ঐ গুলি পড়িয়া যাউন, পরে "২" লেখাগুলি, তৎপরে "৩" লেখাগুলি পড়িলেই ভাষা বোধ হইয়া যাইবে।

এ প্রবন্ধে তিনটী কৌশলের কথা বলা হইল; বুদ্ধি থাকিলে উহার ভিতর আরও নূতন কৌশল বাহির করিতে পারিবেন।

এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সাঙ্কেতিক কৌশল বলিয়া দিলে খাটিবে না; উহার ভিতর কিছু নিজস্ব থাকা চাই। সঙ্কেতে শৃঙ্খলাবদ্ধ

পূর্ব্বক যেরূপে পারিবেন, সেই রূপেই মনের ভাব প্রকাশ করিবেন; তাহাই আপনার উদ্ভাবিত নিজস্ব ভাষা হইবে। জুতার—জ; ছাতার—ছ; চসমার—চ; দাড়ির—দ ইত্যাদি ধরিয়াও মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়। কথার অক্ষর উল্টাইয়া লিখিলেও অব্যক্ত শব্দে পরিণত হয়; যেমন, "রামচন্দ্র" এই নামের উল্টা অক্ষর "ন্দ্রচমরা।"

লিপি-কৌশল সভ্য জগতে বিরল নহে। ফ্রান্সের লিপি-কৌশল বিখ্যাত। শুনা যায়, ফরাসী দেশের কয়েদীরা জেলখানার ড্রেনের নলে ঘা দিয়া শব্দ করিয়া সঙ্কেতে মনের ভাব বাহিরের লোককে জানাইয়া দেয়।

টেলিগ্রাফের কথা, কেবল সাঙ্কেতিক। স্থানাভাব বলিয়া এখানে উক্ত সাঙ্কেতিক বচন সমস্ত দেখাইতে পারিলাম না; তবু স্যামুয়েল মুর্শ সাহেবের তাড়িত-বার্ত্তার সাঙ্কেতিক শব্দ এখানে কিছু উদ্ধৃত করিলাম। "বার এবং পয়েন্ট অর্থাৎ বাঙ্গালায় যাহাকে বলে, টক্কা (বার) টারে (পয়েন্ট) ছোট কসি পয়েন্ট, বড় কসিকে "বার" বলিয়া জানিবেন।

বর্ণ	সাঙ্কেতিক চিহ্ন
A	— ——
B	——— — — —
C	——— — ——— —
D	——— — —
E	—

আমাদের দেশের দালাল মহাশয়েরা সেকহ্যাণ্ড করিবার মত আপনার হস্ত ধরিয়া পরে দুই হস্তের উপর রুমাল বা পরিধেয় বস্ত্র ঢাকা দিয়া, আঙ্গুলের মাথা ঘুসিয়া সঙ্কেতে দর দিয়া থাকেন।

আর একখানি পত্র (ইহা দ্বিতীয় কৌশলানুসারে) এইস্থানে দেওয়া হইল,—

"তো" ই "মা" ই "দে" উ "র" "পু" উ "ত্ত" উ "কে" উ "র" "প্র" এ "থ" এ "ম" এ "সং" ই "স্ক" ই "র" ই "ণ" "পা" উ "ঠ" উ "ক" উ "রি" উ "য়া" উ "ই" "বু" ই "ঝি" ই "য়া" "ছি" এ "লা" এ "ম" "উ" কু "হা" শু "য" ব "ত" ন "স" খ্যা "স্ক" ই "র" এ "ণ" ও "হ" উ "ই" ও "বে" "ত" ন "ত" ন "ই" "উ" কা "হা" ন "র" "আ" ই "কা" উ "র" "বা" ই "ড়ি" ও

"য়া" এ "যা" নে "ই" ও "বে" "উ" নি "ক্ত" তে "পু" ই "স্ত" নে "কে" ই "র" "ভি" ও "ত" ও "র" "স" ই "মু" ই "দ" ই "য়" "বি" ই "ষ" ই "য়" "প" ই "রি" ও "ণা" এ "মে" "কৌ" এ "শ" এ "লে" ও "বা" "সা" নি "টে" "লে" ই "খা" ই "চ" ই "লি" ও "বে।"

"আ" ন "মা" এ "দে" ও "র" "দে" এ "শে" এ "র" "র্ব" ও "জা" ও "কে" ও "রা" "ঢা" এ "কা" এ "ই" "কা" এ "প" এ "ড়" "বি" ই "ক্রে" ই "তা" ই "রা" "পা" ই "টি" ই "বি" নে "ক্রে" নে "তা" নে "রা" নে "সা" এ "টে" এ "লি" ই "খি" ই "য়া" "থা" এ "কে।"

এই পত্রের কোটেসন-যুক্ত অক্ষরগুলি পাঠ করিয়া যাউন, ভাবপ্রকাশ হইবে। ইচ্ছা করিলে যে অক্ষর গুলিকে কোটেসন দেওয়া হয় নাই, ভাষাকে লুকাইবার জন্য অনর্থক যে অক্ষরের বাজে খরচ করা হইয়াছে, সেই বাজে অক্ষরগুলিকে ভাবযুক্ত করা চলে, যেমন,—

আসউ	জম্পাস্ত	কাদট্	লকক	অমবি	নেহাতা	কশয়
১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩
সয়ধা	গ্রাদিন	হিগগা	ককেছ	পআবা	ত্রেমাহি	উরর
১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩
ভজিহ	টজ্ঞাই	ছস্যয়া	ড়াউহ্	অহার্ভি	নেদ্বাক্ষ	কেরানি
১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩
লিদেবা	খিশের	তেরণ	ছেকিহ	ন।	উই	পবে
১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১ ২ ৩	১	২ ৩	২ ৩
কাকি?	র	হ	ই	বে?		
২ ৩	২	২	২	২		

এই বিষয়টির '১' চিহ্নগুলি অগ্রে পাঠ করুন, পরে '২' চিহ্ন অক্ষরগুলি পাঠ করুন, তৎপরে '৩' চিহ্ন অক্ষর পাঠ করিয়া দেখুন, ভাষা বোধ হইবে। অধিকন্তু এই সঙ্কেতগুলি নিজে সাজাইয়া ব্যবহার করিতে শিক্ষা করুন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন। সমুদয় দেশের ব্যবসায়ী মাত্রেই এইরূপ সাঁটে লেখা পড়া করিয়া থাকেন। ইহাতে সাধারণের চক্ষুতে ধূলি দিয়া নিজের কার্য্যোদ্ধার হয়। ডাক্তারদিগের প্রেস্কৃপ্সনেও সাঁটের অক্ষর আছে।

পরিশিষ্ট।

এগুলিও লিপিকৌশলের শাখা-বিশেষ বলিয়া ইহাদের কথা এই স্থানে কতক লেখা হইল। ইহার কতক অংশ ২য় খণ্ড আষাঢ় (১৩০৯) সাল বলা হইয়াছে।

১। পিঁয়াজের রসে লিখিলে লেখা দেখা যায় না, কিন্তু উষ্ণ করিলে দেখা যায়।

২। মাজুফলের জল বেশ পাতলা করিয়া, তদ্দ্বারা লিখিলে লেখা প্রথমতঃ অদৃশ্য থাকে, পরে হীরাকসের জলে কাগজখানি ডুবাইলে কাল-বর্ণের লেখা বাহির হয়।

৩। ভাত, সাগু কিম্বা এরারুটের মণ্ড দিয়া লিখিলে লেখা অদৃশ্য থাকে; কিন্তু ঐ লেখার উপর টিংচার আইওডিনের জল দিলে নীলবর্ণের লেখা হয়।

৪। এসিটেট অব কোবাল্ট জলে গুলিয়া সেই জলে কিছু সোরা মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা লিখিলে লেখা দেখা যায় না, কিন্তু উষ্ণ করিলে গোলাপীবর্ণের লেখা দেখা যায়।

৫। সলফিউরিক এসিডে ক্রমে ক্রমে ২০ ভাগ গরম জল কিম্বা বৃষ্টির জল মিলাইয়া শিশিতে রাখিয়া শীতল হইলে পর, তাহা দ্বারা লিখিলে লেখা অদৃশ্য থাকে; উষ্ণ করিলে গাঢ় স্থায়ী কৃষ্ণবর্ণের অক্ষর বাহির হয়।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এলোয়েস্ সিলি ফেলজর নামক এক ব্যক্তি সর্ব্ব প্রথমে লিথোগ্রাফির বিষয় আবিষ্কার করেন। অতএব আমরা ঐ সময় হইতেই সভ্যজগতে এ বিষয়ের নূতন অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিতে পারি। এক্ষণে লিথোর দ্বারা আমরা অনেক উপকার পাইতেছি। কিন্তু উহা ফেলজরের কৃত লিথো নহে; ফেলজর সাহেব মোম এবং টার্পিণ তৈল দিয়া, প্রস্তরের উপর অঙ্কিত করিতে বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার পথ ধরিয়া লিথো বাহির হইয়াছে, পরে উন্নতি হইয়াছে। আমরা ঐ সকল লিথোর কথা এখানে বলিব না; সামান্য পত্র এবং ক্ষুদ্র চিত্রাদি ছাপার সহজ সঙ্কেত বলিতেছি। যথা;—

একটুকু ভূষা এবং কিছু তৈল, যে কোন তৈল হউক, মিলাইয়া তৈলকালী প্রস্তুত করিবেন। রবার ষ্ট্যাম্পের কালীও ঐ প্রকার তৈলকালী ভিন্ন কিছুই নহে, তবে তাহাতে সাবানের তৈল (গ্লিসিরিণ) এবং মেজেণ্টার

দেওয়া হয়, এই প্রভেদ। তৈল কালী করিয়া কোন মসৃণ পাত্রে অর্থাৎ কাচের উপর হউক, কিম্বা শ্লেটের উপর হউক, গঁদ দিয়া চিঠির অক্ষর গুলি উল্টা করিয়া লিখিবে। পরে তাহাতে ময়দা অথবা খড়িগুঁড়া দিবে; তাহা হইলে গঁদের লেখা শুকাইয়া ঐ খড়ি বা ময়দার দ্বারা জমাট বাঁধিবে। পরে ঐ লেখাগুলির স্তরে তৈল কালী মাখাইয়া, কাগজ ভিজাইয়া প্রেস করিলে, চিঠি ছাপা হইবে।

পরন্তু, যদ্যপি ঐ গঁদের লেখার উপর মেজেণ্টার বা অন্য কোন রং গুঁড়া করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর তৈল কালীর প্রয়োজন হয় না; কাগজ ভিজাইয়া হস্ততল দিয়া প্রেস করিলে, ছাপা উঠে। ইহাতে ছবি ছাপা উৎকৃষ্ট হয়।

কার্ব্বন পেপার দিয়া, ইচ্ছানুসারে উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে ছবি তুলিয়া দেওয়া যায়। পূর্ব্বে কালীর কাগজ বা কার্ব্বন পেপারের কথা বলা হইয়াছে। ঐ কালীর কাগজ শুকাইলে যে কোন চিত্রের নিম্নে উহাকে রাখিয়া এবং কার্ব্বন পেপারের নিম্নে একখণ্ড কাগজ বা চিঠির কাগজ রাখিয়া, ছবিখানির উপর একটী কলমের মুখ দিয়া দাগে দাগে বুলাইলে, ঠিক অনুরূপ ছবি চিঠির উপর উঠিবে। তাহার পর ঐ ছবিখানি এবং মূল ছবিখানির উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি করিলে জানিতে পারিবেন, মূল হইতে নকল কোথায় কি তফাৎ হইয়াছে। ঐ তফাৎ সারিয়া দিলে অর্থাৎ কালী কলম দিয়া চক্ষুর সাহায্যে ঠিক করিয়া মূলের সহিত আঁকিতে পারিলে, উৎকৃষ্ট ছবি হয়। আমরা এরূপ শত শত ছবি প্রস্তুত করিয়াছি। সাধিলেই সিদ্ধ।

মেজেণ্টার রং।

এনিলিন নামক দ্রব্যই এই শ্রেণীস্থ রঙ সকলের জননী। ১৮২৬ খৃঃ অস্থি হইতে প্রস্তুত তৈল হইতে এবং নীল হইতে কৃত্রিম কুইনাইন প্রস্তুত করার চেষ্টায় এই এনিলিন সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তুত হয়। নীল হইতে এই পদার্থ সহজে প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু আজকাল পাথুরে কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুত

কালে যে আলকাতরা পাওয়া যায়, তাহা হইতেই অধিক পরিমাণে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। আজকাল পৃথিবীর সভ্যদেশ সকলে অধিক পরিমাণে গ্যাসের আলো ব্যবহৃত হইতেছে; সুতরাং আলকাতরাও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ প্রস্তুত হইতেছে। আলকাতরা হইতে অতি সহজ উপায়ে, অল্প মূল্যে এনিলিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। আলকাতরা চুয়াইলে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ পাওয়া যায়; তাহাকে ন্যাপ্‌থা কহে। এই ন্যাপ্‌থা, লবণ-দ্রাবকের (হাইড্রোক্লোরিক এসিড) সহিত মিশ্রিত করিয়া কাচ-পাত্রে প্রবল বেগে সঞ্চালন করিয়া স্থির ভাবে রাখিয়া দিলে, উপরে এক প্রকার পরিষ্কার দ্রব্য দেখা যায়। তাহাকে সাবধানে ঢালিয়া লইয়া কোন পাত্র মধ্যে অগ্নির তাপে উষ্ণ করিতে হয়। ঘন হইলে যখন তীব্র গন্ধযুক্ত ধুম নির্গত হইতে আরম্ভ হয়, তখন অগ্নি হইতে নামাইয়া, উহার পরিষ্কার অংশ সাবধানে অন্য পাত্রে লইতে হয়। উহার সহিত অধিক পরিমাণ চূণের জল মিলাইয়া, বিশেষ প্রকার তাপে চুয়াইলেই বিমিশ্র এনিলিন প্রস্তুত হয়। এই বিমিশ্র এনিলিন সহ লবণ-দ্রাবক ও চূর্ণ মিলাইয়া পুনঃ২ চুয়াইলেই মেজেণ্টার রং সকলের জননী এনিলিনকে বিশুদ্ধাবস্থায় পাওয়া যায়।

নীল হইতে এনিলিন প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিলে ইহাকে পটাসের সহিত চুয়াইতে হয়। অন্যান্য পদার্থ হইতেও এনিলিন প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু তাহা জানা তত প্রয়োজনীয় নহে।

এনিলিন—দেখিতে পাৎলা, তৈলের ন্যায় তরল বস্তু, ঈষৎ সুরাগন্ধযুক্ত, আস্বাদ তীব্র, অত্যন্ত উদ্বায়ী, সুরা ও ঈথার নামক দ্রব্যের সহিত সহজে মিলিত হয়, জলে অল্প দ্রবণীয়, আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০২৮ অর্থাৎ জল অপেক্ষা অতি অল্পভারী, জল যে তাপে ফুটে, তদপেক্ষা একটু অধিক তাপ পাইলে ফুটিয়া উঠে। ইহা অত্যন্ত উগ্রবিষ। অনাবৃত রাখিলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে বায়ুর অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া কটাবর্ণ হয়। অগ্নির স্পর্শে সহজে গলিয়া উঠে ও অধিক ধুম উৎপাদন করে। এই এনিলিন ১৮২৬ খৃঃ হইতে জানা থাকিলেও তদবধি ১৮৫৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ৩২ বৎসরকাল কেবল বৈজ্ঞানিকদের আদরের দ্রব্য ছিল। সাধারণের কোন কার্য্যে লাগে নাই। ১৮৫৮ খৃঃ ২৬ শে আগষ্ট তারিখে পার্কিন্স নামক এক সাহেব এনিলিন হইতে রং করার নিজস্ব সনন্দ অর্থাৎ ট্রেড মার্ক রেজেষ্টী করিয়া লইয়া বেগুনিবর্ণের মেজেণ্টার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। ফলতঃ ফরাসী দেশেই সর্ব্ব প্রথমে মেজেণ্টারের জন্ম হয়।

যাহা হউক পার্কিন্সের নূতন রং নানাপ্রকার সুমধুর নামে পরম আদরে বিক্রয় হইতে দেখিয়া, অনেক দেশের লোক এই নূতন রং প্রস্তুত বিষয়ে মনোযোগী হন। এইরূপে অতি অল্প কাল মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে রঙের বিচিত্রতা ও উৎকর্ষতা সাধিত এবং অল্পব্যয়ে অধিক প্রস্তুত করিবার উপায় প্রকাশিত হইল।

পাথুরে কয়লা হইতে গ্যাস চুয়াইয়া লইলে গ্যাসের সহিত অন্যান্য অনেক জিনিস চুয়াইয়া আইসে। গ্যাস পরিষ্কার কালে ঐ সকল দ্রব্য স্বতন্ত্র পাত্রে পৃথক হইয়া যায়। গ্যাসের সহিত যে সকল অন্যান্য জিনিস চুয়াইয়া আইসে, তন্মধ্যে আলকাতরাই প্রধান। এই আলকাতরা চুয়াইলে এক প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাকে ন্যাপথা কহে। ১৮০ হইতে ২৫০ তাপে ন্যাপথা চুয়াইলে বেনজোল প্রস্তুত হয়। বেনজোল নাইট্রিক ও সলফিউরিক এসিড মিশ্রের সহিত লৌহ পাত্রে তাপ দিলে নাইট্রো-বেনজোল প্রস্তুত হয়। এই নাইট্রো-বেনজোল মধ্যে অত্যন্ত উষ্ণ বাষ্প চালাইয়া চুয়াইলে এনিলিন প্রস্তুত হয়।

১। বেগুণী বর্ণের মেজেণ্টার। এনিলিন ও সলফিউরিক এসিড যথা-প্রয়োজন জলের সহিত মিলাইয়া উষ্ণ করিলে এনিলিন দ্রব হইয়া যায়। শীতল হইলে বাইক্রোমেট অব পটাসের জল যোগ করিয়া ২।১ দিন রাখিয়া দিলে কাল বর্ণের গুঁড়াদ্রব্য পাত্রের নীচে পড়ে। এই কাল দ্রব্য মিথাইলেটেড স্পিরিট যোগে দ্রব করিয়া পৃথক করতঃ স্পিরিট চুয়াইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে কষ্টিক সোডার জল যোগ করিলে, পুনরায় বিশুদ্ধ অবস্থায় পাত্রের নীচে জমিয়া যায়। এই প্রকার মেজেণ্টারের নাম (Mauve) মেভি দেওয়া হইয়াছিল। এই পার্কিন্স সাহেব প্রস্তুত প্রথম মেজেণ্টার।

২। (Magenta, Aniline-red, Roseine or Fuchsine) মেজেণ্টা, এনিলিন-রেড, রোজিইন বা ফুশিন, এই চারিটী নামে সাধারণ মেজেণ্টা পরিচিত। এনিলিন, শঙ্খবিষ বা আর্সিনিক এসিড সহিত মিলাইয়া প্রস্তুত হয়। ঢালা লোহার বিশেষ প্রকার পাত্রে ২ ভাগ সাধারণ এনিলিন ও শঙ্খবিষের ঘন দ্রব ৩ ভাগ একত্র উত্তমরূপে মিলাইয়া, উপযুক্তকাল উষ্ণ করিতে হয়। তাহার পর উহার মধ্যদিয়া অত্যুত্তপ্ত বাষ্প চালাইলে অতিরিক্ত এনিলিন অন্তরিত হইয়া যায়। এই প্রকারে প্রস্তুত বিমিশ্র দ্রব্য জলে ফুটাইয়া ছাঁকিতে হয়। ঐ ছাঁকা জলে সামান্য লবণের জল দিলে মেজেণ্টার পৃথক হইয়া জমিয়া যায়। এই দ্রব্য উষ্ণ জলে দ্রব করিয়া ছাঁকিতে হয়। তারপর দানা বান্ধিলেই

বাজারের মেজেণ্টার প্রস্তুত হয়। রোজেনিলিন নামক দ্রব্যই মেজেণ্টারের মূল বস্তু। সাধারণ মেজেণ্টার, হাইড্রোক্লোরেট আকারেই অবস্থান করে; কিন্তু কখন কখন নাইট্রেট অক্জেলেট এসিটেট আকারেরও দেখা যায়।

এই মেজেণ্টার বা রোজিনিলিন হইতে মেজেণ্টার শ্রেণীস্থ অন্যান্য রঙ্গ প্রস্তুত হয়, যথা,—

৩। **নীল মেজেণ্টার।** সোডিয়ম এসিটেট ও এনিলিন, লৌহ-পাত্রে উত্তপ্ত তৈলের তাপে (৩৭৪ ফাঃ) তাপে উষ্ণ করিলে, নীল মেজেণ্টার প্রস্তুত হয়; অতিরিক্ত এনিলিন চুয়াইয়া পৃথক হইয়া যায়। ইহার বর্ণ গাঢ় নীল; তাপ হইতে অন্তরিত করত বিশুদ্ধ করিতে হাইডোক্লোরিক এসিড সহিত মিলাইলে অবশিষ্ট এনিলিন পৃথক হইয়া যায়। এই উপায়ে সমুদায় লাল, বেগুনি অংশ পৃথক হইয়া যায়। কিন্তু বিশুদ্ধ পৃথক করিতে উক্ত বিমিশ্র দ্রব্যকে মিথাইলেটেড স্পিরিটে দ্রব করিয়া, জল-মিশ্র হাইডোক্লোরিক এসিড সহিত মিলিত করিতে হয়। তারপর ভালরূপ ধৌত করিয়া, জলযোগে জমাইয়া পৃথক করত শুষ্ক করিলেই নীল মেজেণ্টার প্রস্তুত হয়।

টীনডাইক্লোরাইট সহিত এনিলিন (৩'৫৬ ফাঃ তাপে) ৩০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উষ্ণ করিলে এক প্রকার নীল মেজেণ্টার প্রস্তুত হয়।

৪। **বেগুনি মেজেণ্টার।** নীল মেজেণ্টার প্রস্তুত করিতে এনি-লিন ও মেজেণ্টার একত্র করিয়া তাপ দিবার কালে প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হইতেই যদি ঐ দ্রব্যকে জল-মিশ্র অম্লে মগ্ন করা যায়, তাহা হইলেই বেগুনি মেজেণ্টার প্রস্তুত হয়, কিন্তু এই দ্রব্য তত ভাল নয়, এজন্য ইহার পরিবর্ত্তে—মেজেণ্টার মিথাইলেটেড্ স্পিরিটে মিলিত করিয়া ইহার সহিত আইওডাইড অব্ ইথাইল কিম্বা মিথাইল, বাষ্পের তাপে ৫।৬ ঘণ্টা উষ্ণ করিলে অতিরিক্ত ইথাইল ও স্পিরিট চুয়াইয়া পড়ে। তাহা হইলে বেগুনি মেজেণ্টার প্রস্তুত হয়। এই মেজেণ্টার জলে দ্রব করিয়া ছাঁকিয়া লবণ দ্বারা জমাইলেই বেগুনি মেজেণ্টার প্রস্তুত হয়।

৫। **হরিৎ মেজেণ্টার।**—৩ ভাগ গন্ধক দ্রাবক, এক ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া এক ভাগ মেজেণ্টার সহিত ক্রমে ক্রমে ১॥ ভাগ আল্ডী-হাইড মিলাইয়া উষ্ণ জলের তাপে উষ্ণ করিতে হয়। যখন উহার এক ফোঁটা, জলে দিলে সবুজ হয়, তখনই ক্রিয়া সমাধা হয়। তখন ৩ ভাগ হাইপো-সলফাইট অব্ সোডিয়ম মিশ্রিত অধিক পরিমাণ উষ্ণ জলে গুলিয়া ফুটাইতে হয়। তারপর

ছাঁকিয়া লওয়া চাই। এই জল হরিৎবর্ণ। এসিটেট অব্ সোডা অথবা টানিক এসিড যোগে জমাইলেই শুষ্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৬। আইওডাইড গ্রিণ। বেগুনি মেজেণ্টার প্রস্তুত কালে এই দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

আলকাতরা হইতে উৎপন্ন—কার্ব্বলিক এসিড হইতে নিম্নলিখিত রং প্রস্তুত হয়।

১। পিকরিক এসিড—কার্ব্বলিক এসিডে উপযুক্ত পরিমাণ নাইট্রিক এসিড মিলাইয়া প্রস্তুত হয়। ইহা বারুদের মত বিপদজনক দ্রব্য। এজন্য সাবধানে প্রস্তুত করা আবশ্যক। এই দ্রব্য দিয়া রেসম অতি সুন্দর পীত বর্ণে রঞ্জিত হয়।

২। আইসো পরুপিউরেট অব পটাসিয়ম—পিকরিক এসিড সহিত সায়েনাইড অব্ পটাস মিলাইলে বারুদের মত ভয়ানক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। পশম ঘোর বেগুণীবর্ণে রঞ্জিত করিতে ব্যবহার হয়।

৩। অরিণ—সলফিউরিক, অকজালিক ও কার্ব্বলিক এসিড একত্র উষ্ণ করিয়া প্রস্তুত হয়। ইহাকে বিশুদ্ধ করিলে ব্যবহার-উপযোগী হয়। ইহা সুন্দর লালবর্ণ। ব্যবহার করার সুবিধা নাই বলিয়া কদাচ ব্যবহৃত হয়।

৪। পিওনাইন—রোজোলিক এসিড ও এমোনিয়া বিশেষ তাপে উষ্ণ করিলে লাল রঙ প্রস্তুত হয়। ইহার বর্ণ কুসুম ফুলের মত; কিন্তু এই দ্রব্য ক্ষতিকারক বলিয়া কদাচ ব্যবহার হয়।

৫। ডাইনাইট্রো ন্যাপথাল—রেশম স্বর্ণের মত উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত করিতে ব্যবহৃত হয়। ন্যাপ্থেলাইন সোরা ও নাইট্রিক এসিড একত্র উষ্ণ করিয়া প্রস্তুত হয়।

গ্যাসের আলো।

কলিকাতায় ইলেট্রিকের আলো রাজপথে জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার নিকট এ আলো চন্দ্র কিরণে জোনাকী পোকার আলোর মত। বোধ হয় শীঘ্রই এই ব্যবসায় নষ্ট হইবে। অতএব ইহার ইতিহাস এই প্রবন্ধে কিছু বলিয়া রাখি।

সকলেই জানেন, কাষ্ঠাদি দগ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, এবং তৈল, তার্পিণ, স্পিরিট প্রভৃতি দ্রব্যও পুড়িয়া জলিয়া উঠে। কাষ্ঠাদি, কঠিন বিমিশ্র দাহ্য বস্তু; এবং স্পিরিট প্রভৃতি তরল শোধিত দাহ্য দ্রব্য। প্রভেদ এই মাত্র; কিন্তু উভয়ের প্রজ্বলন ক্রিয়া, এক কারণেই হইয়া থাকে। দাহ্য দ্রব্য মাত্রেই দগ্ধ হইবার পূর্ব্বে বাষ্প অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সেই বাষ্পই জলিতে থাকে।

আজ প্রায় বিরাশী বৎসর হইল, গ্যাসের আলোর প্রচার হইয়াছে। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য পাথুরে কয়লা হইতে গ্যাসের আলো করা হইতেছে। পাথুরে কয়লা হইতে যে গ্যাস হয়, তাহাকে 'কোলগ্যাস' কহে।

সর্ব্ব প্রথমে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম মরবেক নামক জনৈক ইঞ্জিনিয়ার আনথ্রাসাইট নামক এক প্রকার পাথুরে কয়লা হইতে কোলগ্যাস প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার বাটী আলোকিত করেন। তাহার পর প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে সাধারণে উহার ব্যবহার জানিতে পারায়, কতিপয় গ্যাসকোম্পানীর সৃষ্টি হয়। আজ কাল প্রায় সকল দেশেই গ্যাসের আলো হইয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সকল পাথুরে কয়লার সমান গুণ নহে; যে কয়লা অধিক দিন ভূস্তরে থাকে, তাহার গুণ এক প্রকার, এবং যে কয়লা অল্প দিন ভূস্তরে থাকে, তাহার গুণ অন্য প্রকার। বস্তুতঃ ভূস্তর হইতে বহুবিধ পাথুরে কয়লা পাওয়া যায়। আনথ্রাসাইট কয়লা অনেক দিন ভূগর্ভে থাকে, ইহা বৈজ্ঞানিকেরা মীমাংসা করিয়াছেন। আনথ্রাসাইটে অধিক কার্ব্বণ পাওয়া যায়। এই জন্য অপরাপর পাথুরে কয়লা অপেক্ষা ইহা হইতে অধিক কোল গ্যাস প্রস্তুত হয়।

গ্যাস কারখানায় পাথুরে কয়লাকে রিটর্টে করিয়া দগ্ধ করা হয়। রিটর্ট বহু প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়; নানাবিধ আকারের নানা প্রকার দ্রব্য দ্বারা রিটর্ট প্রস্তুত দেখা যায়। সচরাচর কাচ, ফাইয়ার ক্লে নামক এক প্রকার মৃত্তিকা, লৌহ, গ্রাফাইট্ ও তাম্র প্রভৃতির দ্বারা রিটর্ট প্রস্তুতি হইয়া থাকে। গ্যাস কারখানায় লৌহ রিটর্ট ব্যবহৃত হয়; তাহার আকার ইংরাজী 'ডি' অক্ষরের মত।

উক্ত রিটর্টের বাহিরে একটী কবাট আছে; ভিতরে কয়লা রাখিবার প্রশস্ত স্থান আছে। রিটর্টের নিম্নে আগুণের চুল্লী এবং উপরে একটী ছিদ্র। ঐ ছিদ্র দিয়া পাথুরে কয়লাস্থ বাষ্প উত্থিত হয়। মনে কর,

একটী দোয়াত যেন রিটর্ট। উহার যে স্থানে কালি থাকে, সেই স্থানে পাথুরে কয়লা দেওয়া হইল; তাহার পর দোয়াতটী আগুণের চুল্লীতে রাখা হইল; ক্রমে পাথুরে কয়লা তাপ প্রভাবে দগ্ধ হওয়ায় দোয়াতের মুখ বা ছিদ্র দিয়া গ্যাস বাহির হইতে লাগিল। এখন দোয়াতের ছিদ্রে অপর একটী নল সংযোজিত করিয়া, তাহার মুখ জ্বালাইয়া দেওয়ায় গ্যাস জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু উহা বিশুদ্ধ গ্যাস নহে; এজন্য অনেক সময়ে দুর্ঘটনা হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পাথুরে কয়লা একরূপ নহে। পাথুরিয়া কয়লা নানাবিধ বলিয়া দুর্ঘটনাও নানাবিধ হইত; এই সকল দেখিয়া যাহাতে বিশুদ্ধ কোলগ্যাস প্রস্তুত হয়, তাহার উপায় ইদানীং বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন।

গ্যাস কারখানার কাণ্ড সহজে বুঝা কঠিন। চিত্র কিংবা স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝা যায় না; তবে যতদূর সম্ভব, বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। গ্যাস কারখানার রিটর্টের নলগুলি একত্র হইয়া কিয়দ্দূর গিয়া বক্র হইয়া, অপর একটী বৃহৎ নলের সহিত মিলিত হইয়াছে। বৃহৎ নলটী একটী জল-পাত্রের সহিত সংযুক্ত। এই জল-পাত্রের আকার 'পিপার' মত। উক্ত পিপার ভিতর জল আছে। পিপাটী একটী প্রাচীরের উপর রক্ষিত। পিপার অপর এক দিকে আর একটী ছিদ্র আছে; সে ছিদ্রেও একটী নল সংযুক্ত আছে। উক্ত নলটী প্রাচীরের নিম্ন পর্য্যন্ত আসিয়া একটী ঘর পাইয়াছে।

কোলগ্যাস প্রথমে জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে উহার কিয়দংশ ঘনীভূত হয়। ঐ ঘনীভূত পদার্থের অপর নাম 'আলকাতরা'। মনে কর, হুঁকার ভিতর জল আছে, নলিচার উপর কলিকা; কলিকায় তামাক ও আগুণ আঁছে, এখন তামাকের বাষ্প জল দিয়া বিশুদ্ধ হইয়া আসিতেছে; কিন্তু নলিচায় যাহা থাকিতেছে, তাহাই তামাকের কাট। পরন্তু পাথুরে কয়লার 'কাট' আলকাতরা। উক্ত আলকাতরা হইতে অদ্যাপি এত জিনিস বাহির হইয়াছে যে, তাহা বলিতে গেলে একটী স্বতন্ত্র দীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়া পড়ে।

গ্যাস কারখানায় আলকাতরার ঘরে যে বাষ্প আসিতেছে, তাহাকেও অপর দিকে চালান্ করা হইতেছে। আলকাতরার ঘর হইতে একটী বৃহৎ নল বাহির হইয়াছে; সেই নলটী কতকগুলি বড় বড় থামের সঙ্গে সংযুক্ত।

উক্ত থামগুলির অভ্যন্তর ফাঁপা। প্রত্যেক ফাঁপা থামগুলির মস্তক জুড়িয়া এক বৃহৎ জলপাত্র। সেই জলপাত্রে কেবল জল আছে; আর ফাঁপা থামগুলির ভিতর কোক কয়লা আছে। ঐ থামগুলির মস্তকস্থ বৃহৎ জলপাত্র হইতে ক্রমান্বয়ে ঝরণার মত জল আসিয়া, ফাঁপা থামগুলির মধ্যস্থ কোক কয়লাকে আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছে। এদিকে কোলগ্যাস আলকাতরার ঘর হইতে বাহির হইয়া, সবেগে ফাঁপা থামের ভিতর দিয়া উঠিয়া ক্রমে থামের মস্তকস্থ জলপাত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। পরন্তু ঐ জল-পাত্রের অপর দিকে একটী ছিদ্র। সে ছিদ্রেও অপর একটী নল আছে। উক্ত নলটী ক্রমে বক্র গতিতে আসিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে। ঐ মৃত্তিকার উপর একটী ঘর। এই ঘরে "এমোনিয়া" পাওয়া যায়। পরন্তু সময়ে সময়ে, বিশেষ কয়লা চোলাই করিবার সময়, এই ঘরে আরও এক প্রকার বস্তু পাওয়া যায়; তাহাকে গ্যাস কার্ব্বণ কহে। ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্পে উক্ত গ্যাস কার্ব্বণের বাতি ব্যবহৃত হয়। আরও নানা-বিধ কার্য্যে গ্যাস কার্ব্বণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যে ঘরে এমোনিয়া জমে, সেই ঘর হইতে কোলগ্যাস উক্ত ঘরের অপর ছিদ্র দিয়া বাহির হয়। ঐ ছিদ্রের মুখে আবার নল; সে নল ক্রমে এক প্রাচীরে গিয়া উঠিয়াছে। এই প্রাচীরের উপর আর একটী বৃহৎ পিপা আছে। ঐ পিপার অভ্যন্তরে ক্রুবডার নামক ছোট ছোট অক্‌সাইড অব আয়রণ এবং লাইম্‌ ওয়াটার, অর্থাৎ বিশেষ প্রকার লৌহ এবং চূণের জল আছে। পরন্তু এই পাত্রের অপর দিকে একটী ছিদ্র, তাহাতে নল, এবং সেই নলটী ক্রমে ঐ লৌহ ও চূণের অভ্যন্তর দিয়া চলিয়া আসিয়া, এই ঘরে উপস্থিত হয়। এই ঘরে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাকে পিচ কহে।

পিচ-ঘর হইতে কোল গ্যাস 'মিটারে' চালিত হয়; মিটারের মধ্যেও জল আছে। এই মিটার হইতে কোল গ্যাস চালিত হইয়া নগর আলোকিত করে।

কন্‌ডেন্‌সড্‌ মিল্‌ক।

কন্‌ডেন্সড্‌ মিল্ক অর্থে গাঢ় দুগ্ধ। ইহা যে এদেশে পাওয়া যায় না, অথবা বিলাতী আমদানী হইবার পূর্ব্বে, এদেশের লোকে কখনও গাঢ় দুগ্ধ ব্যবহার করেন নাই, এমন নহে। দুগ্ধ ঘন করিয়া চিনি সহযোগে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কন্‌ডেন্সড্‌ মিল্ক বিলাতী ক্ষীর; কেবল প্রস্তুতি করিবার প্রক্রিয়া বিশেষে নামান্তর, রূপান্তর এবং গুণান্তর। ফলে উভয় দ্রব্যই প্রায় এক।

উভয়ের মধ্যে প্রভেদ টুকু দু'এক কথায় বুঝান যাইতে পারে। কিছু বিলাতী গাঢ় দুগ্ধ জল মিশ্রিত করা গেল। জল মিশ্রিত হইলে গাঢ় দুগ্ধ তরল হইয়া সাধারণ দুগ্ধের মত হইল। ইহাকে বেশ পরিষ্কার একখানি কাপড়ে ছাঁকিয়া লওয়া গেল। ছাঁকিবার পর কাপড়ে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। সাধারণ বিশুদ্ধ তরল দুগ্ধ ছাঁকিলেও কাপড়ে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু ক্ষীরের বেলা তাহা হইবে না। ক্ষীর জলে মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধবৎ তরল করিয়া লইলে, ছাঁকিবার পর কাপড়ে সরের কুঁচি দেখা যাইবে। বিলাতী টীনের দুগ্ধ ও দেশী ক্ষীরের প্রভেদ এইটুকু। এই প্রভেদটুকু প্রস্তুত করিবার কৌশলে ঘটিয়া থাকে। ক্ষীর প্রস্তুতি করিবার সময় যে লৌহপাত্রে দুগ্ধ জাল দেওয়া হয়, সেই পাত্র অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া দুগ্ধের ছানার কিয়দংশ পুড়াইয়া কঠিন করিয়া ফেলে। এই কঠিন অংশগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার আকারে ক্ষীরের মধ্যে জড়াইয়া থাকে। ঘন ক্ষীর খাওয়ার সময় বেশ জানিতে পারা না গেলেও, জল মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে পর, দানাগুলি কাপড়ে লাগিয়া থাকে। কোন উপায়ে দুগ্ধ জাল দিবার সময় ছানার কঠিন দানা উৎপন্ন হওয়া নিবারণ করিতে পারিলেই বিলাতী গাঢ়-দুগ্ধ প্রস্তুতি হইল। সে উপায়টী গৌণ উত্তাপ (সেকেণ্ডারী হিট্‌)। চাউল, ছোলা, মটর প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য ভাজিবার সময়, একেবারে অগ্নির উত্তাপ প্রয়োগ না করিয়া উত্তপ্ত বালুকার সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। এই বালুকার উত্তাপই গৌণ উত্তাপ। কঠিন দ্রব্যগুলি বালুকার মধ্য হইতে সহজে বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তরল দ্রব্যে

গৌণ উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইলে, বালুকার উত্তাপ কার্য্যকর হয় না; তখন অন্য কোন দ্রব্য আবশ্যক হয়। দুগ্ধ প্রভৃতি তরল দ্রব্যে গৌণ উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইলে, জল উত্তপ্ত করিয়া সেই জলের সহায়তায় কার্য্য সাধন করা হয়। এখানে জলের উত্তাপই গৌণ উত্তাপ।

চুলার উপর একটী বৃহৎ পাত্রে জল চড়াইয়া দিয়া আর একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন প্লাটিনম ধাতু-নির্ম্মিত পাত্রে পরিষ্কার শ্বেত শর্করা মিশ্রিত বিশুদ্ধ দুগ্ধ জলের উপর বসাইয়া দিতে হয়। ঐ দ্বিতীয় পাত্রটীর তলদেশ যেন প্রথম পাত্রের সহিত লাগিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথম পাত্রস্থিত জলের উপর দ্বিতীয় পাত্রটীকে এমনভাবে বসাইয়া দিতে হইবে যে, দ্বিতীয় পাত্রের চারিদিকে দুই তিন ইঞ্চি পরিমাণ জল থাকে। প্রথম পাত্রস্থিত জল যাহাতে ফুটিবার সময় দ্বিতীয় পাত্রে পতিত না হয়, এরূপ সাবধানতাও অবলম্বন করা আবশ্যক। জল যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করিলে, তাহাতে ১০০ ডিগ্রির অধিক উত্তাপ কখনই হইবে না। ইহা জলের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। সুতরাং দ্বিতীয় পাত্রস্থিত দুগ্ধ যখন প্রথম পাত্রস্থ জলের উত্তাপে ফুটিতে আরম্ভ করিবে, তখন তন্মধ্যস্থ জলটুকু মাত্র বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে। দুগ্ধের জল ব্যতীত অপর উপাদান গুলির কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইলে, আরও অধিক ডিগ্রি উত্তাপ আবশ্যক। গরমজলের সাহায্যে দুগ্ধ জ্বাল দেওয়াতে দুগ্ধের মধ্যে ১০০ ডিগ্রির অধিক উত্তাপ হইবে না বলিয়া, কেবল মাত্র দুগ্ধের জলীয় উপাদান টুকু কমিয়া যাইবে, অপর কোন উপাদানের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। জল কমিয়া গিয়া দুগ্ধও ঘন হইয়া আসিবে। আবশ্যক মত ঘন হইলে টীনের কৌটার মধ্যে রাখিয়া বায়ুর প্রবেশ-পথ রোধ করিয়া আবদ্ধ করিলে, এক বৎসরেও এই দুধ নষ্ট হইবে না। ইহারই নাম কনডেন্সড্ মিল্ক বা বিলাতী গাঢ় দুগ্ধ। এই দুগ্ধের বিলাতী ব্যবসায় বড় সামান্য নহে। সমুদায় সভ্যজগতে এই দুগ্ধের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। শুনিতেছি, বোম্বাই অঞ্চলে একটী পার্শি কোম্পানি গঠিত হইয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধনে গাঢ় দুগ্ধের ব্যবসায় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

প্ল্যানচেট্।

সন ১৩০০ সালে কলিকাতায় প্ল্যানচেটের হুজুক উঠে; সেইজন্য গ্রামে গ্রামে এই যন্ত্রের কথা লইয়া আন্দোলন চলিয়াছিল। অনেকে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা বুঝিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অনেকেরই ধারণা জন্মিয়াছিল, এই যন্ত্রে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয় এবং সেই প্রেতাত্মাই জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলির উত্তর দিয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে—

ডাক্তার গেলবেনির স্ত্রী পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইয়া আছেন; এমন অবস্থায় গেলবেনি সাহেব তাঁহাকে বেঙের ঝোল খাইতে দিবার ব্যবস্থা করেন এবং তজ্জন্য স্বহস্তে বেঙ কুটিতে থাকেন। নিকটে একটি কাচ-গোলক ছিল। তখনকার লোকে কাচগোলকে রেশমী রুমাল ঘসিয়া, উহাতে বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশ করিত। এখনও কাচগোলক কিনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্ববৎ এক্ষণে আর উহার ব্যবহার নাই। ডাক্তার গেলবেনির কৃত কাটা বেঙের উপর ঐ কাচগোলক দৈবাৎ গড়াইয়া আসিয়া পড়ে। তখন উহাতে অল্প তাড়িৎ শক্তি ছিল। কাচগোলক-স্পর্শে বেঙের কর্ত্তিত অংশগুলি নড়িয়া উঠিল। এই ঘটনা হইতে বৈজ্ঞানিক ডাক্তার গেলবেনি সাহেব বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিলেন যে, প্রাণিদেহ মাত্রেরই স্নায়ুর ভিতর দিয়া তাড়িৎ চলাচল করে।

উল্লিখিত যন্ত্রের ক্রিয়া এই তাড়িৎ শক্তি প্রভাবেই হইয়া থাকে। দুই জন ব্যক্তি মুখামুখি বসিয়া দুই হস্তদ্বারা যন্ত্রটী স্পর্শ করিয়া থাকিলে, উভয়ের শরীরস্থ তাড়িৎ উহার উপর আসিয়া পড়ে; এবং তাহাতেই উহা নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়। পরীক্ষাস্বরূপ ১ খানি পিস্‌বোর্ড বোঁটাবিহীন পানের আকারে কাটিয়া লইয়া উহার তিনকোণে ৩টি ফুটা করিয়া, ৩টি ফুটার মধ্যে কঞ্চির পাইপ ছোট করিয়া কাটিয়া, উহার ৩টি পায়া করিয়া দেও, অথবা কঞ্চির পাইপ দ্বারা ২টী পায়া করিয়া অপর পায়াটি উড্‌পেন্সিলের দ্বারা কর। কারণ, তাহা হইলে যখন যন্ত্রটি চলিতে থাকিবে, তখন সেই সঙ্গে লেখাও হইতে থাকিবে। কঞ্চির পায়া দুইটি যাহাতে না নড়ে চড়ে, তজ্জন্য উহাকে গালাদ্বারা আঁটিয়া দেও; এবং মসৃণ জমির উপর যাহাতে পায়া দুটি অনায়াসে

এদিক ওদিক সরিয়া বেড়াইতে পারে; তৎপরে উহার নীচে কলিকাফুলের ফলের অভ্যন্তরস্থ দুইটি বীজ গালা দিয়া আঁটিয়া দাও। তৎপরে দুই জন লোক সাম্না সাম্নি বসিয়া উভয় হস্তের পাঁচ পাঁচ দশ অঙ্গুলীর কেবল মাত্র অগ্রভাগ উহাতে ঠেকাইয়া বসিয়া থাক। এতদ্দারা তাড়িৎ প্রবাহ শীঘ্রই হইবে এবং অনতিকালমধ্যেই যন্ত্র নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবে। কোন প্রেতাত্মা ভাবিবার অথবা চক্ষু বুজাইয়া থাকিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

অতঃপর যন্ত্রটি নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে পেন্সিলের যে হিজিবিজি দাগ পড়িবে, লোকে তাহাকেই আপনাদিগের প্রশ্নের উত্তর বলিয়া গ্রহণ করিবে। ফলকথা, ঐরূপ লেখা (বিশেষতঃ যদি দুই জন নিরক্ষর লোকে যন্ত্রটি ধরে) হিজিবিজি দাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। হিজিবিজির মধ্যে কসির টান হেতু সকল রকম কথাই সাঁটে বুঝিয়া লওয়া যায়। এইরূপ বুঝিয়া লওয়া কেবল পূর্ব্ব হইতেই প্রশ্নটার উত্তর জানা এবং মনের একাগ্রতাবশতই ঐরূপ হইয়া থাকে।

প্ল্যানচেট যন্ত্রে যে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয় বলিয়া বলা হয়, তাহাকে কোনরূপ ভবিষ্যৎ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পক্ষে প্ল্যানচেট বিক্রেতাদিগের নিষেধ আছে। নিষেধের কারণ আমরা এই বুঝিয়াছি যে, প্ল্যানচেট তো আর ভূতভবিষ্যৎ গণনার কল নয়। কাজেই, ভবিষ্যৎ গণনা যদি না মিলে, তাহা হইলেই প্ল্যানচেটের উপর লোকের একেবারেই অভক্তি হইয়া যাইবে। বিগত এণ্ট্রান্স, এল্-এ প্রভৃতি পরীক্ষার ফল আমরা প্ল্যানচেট দ্বারা অনেকের গণনা করিয়াছি। প্ল্যানচেট যাহাদের পাস হওয়া সম্বন্ধে বলিয়াছিল "না", প্রকৃতপক্ষে তাহাদের হইয়াছে "হাঁ"; আবার প্ল্যানচেটের "হাঁ" কার্য্যতঃ "না" হইয়াছে। কোন কোনটা বা মিলিয়াও গিয়াছে।

যাহাই হউক, প্ল্যানচেট যিনি উদ্ভাবন করিয়াছেন, তিনি যে একজন প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সে বৎসর কলিকাতা হইতে এই যন্ত্র অনেক বিক্রয় হইয়াছিল, তাহা অবশ্য আমাদের কথিত যন্ত্রের মত নহে। পানাকারের একখানি মসৃণ কাষ্ঠের একস্থানে একটী গর্ত্ত, এই গর্ত্তে উড্পেন্সিল দেওয়া হয়, এবং কাষ্ঠখানির নিম্নে দুইখানি ক্ষুদ্র চক্র ছিল মাত্র। সুখের বিষয়, সাধারণে এই জুয়াচুরির মর্ম্ম শীঘ্রই উপলব্ধি করিলেন; কাজেই যন্ত্র বিক্রয় বন্ধ হইল।

সম্বর লবণ।

জয়পুর হইতে কয়েক ষ্টেশন পরে পশ্চিমদিকে ফলেরা ষ্টেশন। সেই ষ্টেশন হইতে একটি শাখা বাহির হইয়াছে ; তাহা দ্বারা সম্বর হ্রদে যাওয়া যায়। সম্বর নগর জয়পুর হইতে বিশ পঁচিশ মাইল পশ্চিমে মাত্র। সম্বর হ্রদের পূর্ব্ব-প্রান্তে সম্বর নগর। নগরটী প্রাচান। কথিত আছে, এটী সম্বরাসুরের রাজধানী ছিল। সম্বর হ্রদটী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অন্যূন ২৭ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর দক্ষিণে ইহার বিস্তার নানা স্থানে নানা রূপ; কিন্তু কোথাও ৭ মাইল হইতে অধিক হইবে, এরূপ অনুমান হয় না। জল অগভীর এবং লবণাক্ত। অনেকস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় হ্রদের মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে। সম্বর নগর হইতে হ্রদের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যানুক্রমিক মধ্য ভাগ দিয়া রেল চালিত হইয়াছে; সুতরাং রেলের দীর্ঘতাই হ্রদের দীর্ঘতা। ক্বচিৎ কোথাও সামান্য দুটী একটী পুলের আবশ্যক হইয়াছে। হ্রদ এত অগভীর যে, দুই পার্শ্ব হইতে মাটী কাটিয়া লইয়াই রেলের ভূমি প্রস্তুত হইয়াছে। সম্বর লবণ এখন গবর্ণমেণ্টের হস্তে। প্রচুর রূপে লবণ প্রস্তুত করণ এবং লবণ বহন কার্য্যের সুবিধার জন্যই এই রেলটি প্রস্তুত হইয়াছে। তবে সেই সঙ্গে হ্রদের পশ্চিমভাগস্থ গ্রাম সকলের অধিবাসিগণের যাতায়াতে কথঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছে। রেলের দুই ধারেই অসংখ্য লবণ-স্তূপ ও লবণ কুণ্ডা দৃষ্ট হয়। কুণ্ডা সকলে জল বাঁধিয়া রাখা হয় এবং সেই জল শুষ্ক হইলে আপনিই লবণ কুণ্ডায় জমিয়া থাকে। সেই লবণগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপাকারে সজ্জিত থাকে এবং সময়মত স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। হ্রদের উপকূলভাগেও লবণ-স্তূপ ও লবণ-কুণ্ডা আছে ; এবং এই রেলেরও ২।১টি শাখা লাইন আছে।

পূর্ব্বে হ্রদটি জয়পুর ও যোধপুরের রাজাদিগের দখলে ছিল; এখন ইংরেজের হওয়ায় লবণ পূর্ব্ব হইতে বহুগুণ অধিক উৎপন্ন হইতেছে। তৎসহ মূল্য বৃদ্ধি একত্র হইয়া গবর্ণমেণ্টের আয়কে পূর্ব্ব হইতে সুবহুগুণ করিয়াছে ; কিন্তু এক্ষণে আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তটীকে তালিকাপূত করিয়া, পাঠকগণের সমক্ষে আমি ধরিতে পারিলাম না। সম্বরনগরটী অদ্যাপি জয়-

পুর ও যোধপুর উভয় রাজ্যের অধীনে আছে। উভয় রাজ্য হইতে দুই জন নাজিম এখানে বর্ত্তমান। যখন হ্রদটী রাজাদিগের ছিল, তখন নগরবাসিদিগকে লবণ ক্রয় করিতে হইত না। হ্রদের জল লইয়া আসিয়া, সেই জল থিতাইয়া লইলেই লবণ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু এ কার্য্য এখন সম্পূর্ণ মানা। পূর্ব্বে পূর্ব্বে লোকে হ্রদে কাষ্ঠখণ্ড ফেলিয়া রাখিত; হ্রদ একটু শুকাইয়া আসিলে সেই কাষ্ঠখণ্ডসকল লবণ বেষ্টিত হইয়া থাকিত। কখন কখন সমস্ত হ্রদ শুকাইয়া গেলে, লবণময় তলভাগ হইতে লোক লবণ উঠাইয়া লইয়া আসিত। এ সমস্তই এখন হইবার যো নাই। এখানে বলিয়া রাখি যে, সমস্ত হ্রদ প্রতি বৎসর শুকায় না। কদাচিৎ অনাবৃষ্টির বৎসরেই ঐরূপ ঘটে। শ্রীঃ—

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

এডুকেশন গেজেট। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বহুকালের সাপ্তাহিক পত্র। হিন্দুদের যেমন জাতি আছে, এদেশীয় সংবাদ পত্রেরও তেমনি জাতি আছে। এই পত্র সংবাদ পত্রের জাতিতে ব্রাহ্মণ। অতি সুনিয়মে পরিচালিত। আমাদের গুরু পত্রিকা!! প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে দক্ষতা ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রের বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়ের মত বিদ্বান এবং জ্ঞানী বাঙ্গালীর মধ্যে প্রায় নাই, ইহা আমাদের বিশ্বাস। আড়ম্বর শূন্য! তাই কলিকাতার নামজাদা বা হারামজাদা পত্রগুলির মত ইহার গ্রাহক নাই। এই পত্রের সকল গ্রাহক পণ্ডিত।

মানভুম। সাপ্তাহিক পত্র। অতি সুনিয়মে প্রকাশিত হয়। এই পত্রের সম্পাদক মহাশয় যদি স্থানীয় কৃষি, শিল্প এবং কয়লার খনি ইত্যাদি এবং তথাকার আবশ্যকীয় দ্রব্য ও ব্যবসায়ীদিগের জীবনী প্রভৃতি লেখেন, তাহা হইলে সাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। আশা করি, বন্ধুর পরামর্শ শ্রবণ করিবেন।

কাসাভা আলুর চাষ।

(৬)

(লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, M. A, M. R. A. C, and F. H. A. S.)

সার্ ক্লেমেণ্টস্ আর মার্কহাম ভারতবর্ষে যে সিয়ারা রবার গাছ প্রচলিত করিয়াছেন, অর্থাৎ মানিহোৎ গ্লাভিও তাই, উহাও এই খাদ্যপ্রদ কাসাভা গাছের জাতি-বিশেষ। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, এই জাতীয় রবার গাছ নিতান্ত শুষ্ক প্রদেশেও উত্তম জন্মে। এই সামগ্রী জন্মাইতে ব্যয় অতি সামান্যই হয়। মানিহোৎ মূলাপেক্ষা আলু জন্মাইতে তিন গুণ অধিক ব্যয় হয়। ভালরূপ জন্মিলে, এক একটী গাছ হইতে এক আরোবা (২৫ পাউণ্ড) মূল পাওয়া যায়। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার এক রিপোর্টে উভয় পার্লামেণ্টের গোচর করা হয়। ইহার বিষয় ছিল, "ফিলেডেলফিয়া আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে জামেকার পণ্যদ্রব্য।" ঐ রিপোর্টে মানিহোৎ বা কাসাভার ছাতু সম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম, যে গাছ হইতে এই ছাতু প্রস্তুত হয়, উহা শুষ্কপ্রদেশে অতি সুন্দর জন্মে; এবং ভাল রকম চাষ করিতে পারিলে, উহা হইতে একার প্রতি ২০ টন্ মূল জন্মে।

"শেষে আমার বক্তব্য এই যে, ধান্যের আনুষঙ্গিক ভাবে যদি এই ফসলের চাষ ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়, তাহা হইলে টাইম্স্ সংবাদপত্রের নিম্নলিখিত বর্ণনাটী ভবিষ্যতের পক্ষে আর খাটিবে না। "যদি বৃষ্টি আকাশ হইতে না পড়ে, তবে জমির আবাদ হয় না, আর ক্ষেত্রের সকল কৃষিকার্য্যই স্থগিত থাকে। ইহার পরেই হাহাকার শব্দ। ১৮৬৬ সালের ন্যায় তখন সহস্র সহস্র পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু আপনাপন গ্রাম ছাড়িয়া উদরান্নের অন্বেষণে বাহির হয়। ভারতবর্ষের লোক যদি এইরূপে একবার গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হয়, তবেই তাহাদের দুর্গতির একশেষ!"

এ-এম সাইয়ার সাহেবের "ত্রিবাঙ্কুরে ট্যাপিওকার চাষ" আখ্যাত প্রবন্ধ হইতে কয়েকটী ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"পর্ত্তুগিজেরা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোয়ার প্রাচীন উপনিবেশে তিক্ত কাসাভা বা মানিয়োক গাছ লইয়া আইসে। সাধারণতঃ ইহাকেই ট্যাপিওকা গাছ কহে। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে সেই অবধি মানিয়োক গাছের আবাদ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের পুষ্পময় রাজ্যের মধ্যে এ গাছ যেমন সুন্দর জন্মে, বোধ হয়, এই বন্ধুর তাল-তমাল-সুশোভিত উপকূল মধ্যে আর কুত্রাপি এরূপ জন্মে না। এই রাজ্যের জল-বায়ুর বিভিন্ন ভাব ঠিক্ যেন এই ফসলেরই উপযোগী। দক্ষিণ আমেরিকার আরও নানা প্রকার গাছ এখানে উত্তম জন্মে।

"মৃত্তিকার তারতম্যানুসারে, চাষের যত্ন অনুসারে, সারের অবস্থা ও পরিমাণ অনুসারে, বৃষ্টির পরিমাণানুসারে, এবং গাছের জাতিভেদে, ট্যাপিওকার ফলনের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কি লৌহ-পূর্ণ প্রস্তরময় ভূমি, কি কঙ্কর-পূর্ণ ভূমি, কি মৃত্তিকা-পূর্ণ ভূমি, সকল ভূমিতেই এ গাছ জন্মে বটে ; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জন্মে, যেখানে জল দাঁড়ায় না, যেখানে মাটী নরম, দোয়াঁশ ও পচা পাতা প্রভৃতি মিশ্রিত। প্রস্তর-পূর্ণ জমিতে মূল অধিক বাড়ে না, এ মূল খাইতেও বড় সুস্বাদ নহে। কঙ্কর দ্বারা মূলগুলি এরূপ অসমভাব ধারণ করে যে, উহাদের বিকৃত আকার প্রযুক্ত বাজারে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা আবশ্যক হয়। মৃত্তিকাময় ভূমি নিতান্ত শীতল ; এরূপ ভূমিতে মূলগুলি বড় বর্দ্ধিত হয় না। যত সার ব্যবহার করা যাইবে, মূল ততই বড় হইবে এবং শ্বেতসারের পরিমাণও বাড়িবে। ছাই অথবা পচাপাতা মিশ্রিত ছাই হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়। গোময় ও অন্যান্য জন্তুর বিষ্ঠা সার রূপে প্রয়োগ করিলে মূলের বিশেষতঃ কদর্য্য জাতীয় মূলের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু উহার আস্বাদনের বিকৃতি জন্মে।

"ভালরূপে পরিবর্দ্ধিত হইলে এক একটী মূল দুই ফুট লম্বা এবং তিন ইঞ্চি মোটা হয়, এবং ওজনে ৬ হইতে ৮ পাউণ্ড হয়।

"ট্যাপিওকা প্রস্তুত ব্যবসায় ত্রিবাঙ্কুরের একটী প্রধান ব্যবসায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অধিকাংশ ট্যাপিওকা সম্প্রতি বিদেশে চালান হইয়া যাইতেছে। প্রতিবৎসরই ইহার চাষ বাড়িয়া যাইতেছে ; ইহাতেই এই ব্যবসায়ের প্রাধান্য প্রতীয়মান হইতেছে। মালেয়ালী জাতির মধ্যে ইহা একটী প্রধান ও অতি

সুন্দর খাদ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছে। চাউলের যেরূপ দর বাড়িয়াছে, তাহাতে এই খাদ্য শীঘ্রই মালেয়ালীদের সর্ব্ব প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়িবে ; এখনই হয় ত হইয়া পড়িয়াছে।”

বঙ্গদেশের নিম্ন ভূভাগে কাসাভার চাষ ভবিষ্যতে একটী প্রধান চাষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই বিশ্বাসে আমরা মফঃস্বলের কুঠিয়াল সাহেবদের এই চাষের ভিত্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা অবগত হইলাম, মিষ্ট কাসাভার কলম শিবপুরের গবর্ণমেণ্ট-কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

বৃক্ষের পৌষ্পিক পত্র।

যে পত্রের কক্ষ হইতে পুষ্প উৎপন্ন হয়, তাহাকেই পৌষ্পিক পত্র কহে। পৌষ্পিক পত্রের আকারে, অন্য পত্রাপেক্ষা কিছু ইতর-বিশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পৌষ্পিক পত্রও কাণ্ডগ্রন্থি হইতে প্রকাশিত হয়। অপিচ পত্র-মুকুল সকল যেমন কাণ্ডগ্রন্থি হইতে বিকাশিত হইয়া, এক বা ততোধিক পত্র প্রসব করিয়া, বৃক্ষকে শাখা-প্রশাখায় পরিবৃত করে ; তদ্রূপ পৌষ্পিক পত্র বিকাশিত হইয়া, বৃক্ষকে এক বা ততোধিক পুষ্পে সজ্জিত করিয়া, বহুবীজবিশিষ্ট করিয়া থাকে। পরন্তু পত্র প্রস্ফুটিত হইবার পর, যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তেমনই এই পৌষ্পিক পত্র বিকাশিত হইবার পরেই পুষ্পদণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

পাঠক! একবীজদল উদ্ভিদের পৌষ্পিক পত্র সহজেই চেনা গিয়া থাকে। আপনারা বোধ হয় নারিকেল, তাল, কলা প্রভৃতি বৃক্ষের অন্তে মুদিত কচি* পাতা দেখিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ, সেই মুদিত কচিপাতা পৌষ্পিক পত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। যাহা হউক, একবীজদল উদ্ভিদের পৌষ্পিক পত্র যেমন সহজে জানিতে পারা যায়, দ্বিবীজদল উদ্ভিদের পৌষ্পিক পত্র তেমন সুহজে চেনা যায় না। কারণ, সে সকল বৃক্ষপত্র এবং পৌষ্পিক-পত্র ঠিক এক অবয়বের হইয়া থাকে। সেই জন্য ঐ সকল পৌষ্পিক পত্রকে 'পত্রীয়' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

---

* তাল, কলার মুচিকে পৌষ্পিক পত্র বলে।

আর এক জাতীয় উদ্ভিদের পৌষ্পিক পত্র সহজে জানিতে পারা যায়। আপনারা অনেকে লাল পাতার গাছ দেখিয়া থাকিবেন। তাহার প্রত্যেক রক্তবর্ণ পত্রগুলি পৌষ্পিক পত্রের সুন্দর উদাহরণ স্থল। আর আমাদের দেশে আনারস ফলের উপর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র হইয়া থাকে, তাহাও পৌষ্পিক পত্র মাত্র। দ্বিবীজদল উদ্ভিদের পৌষ্পিক পত্র প্রায় অন্ত-মুকুলেই সজ্জিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ উক্ত দ্বিবীজদল বৃক্ষের শাখা প্রশাখার অন্তে যে স্থান হইতে পত্র প্রস্ফুটিত হইতেছিল, সেই স্থানে পত্র বিকশিত হইতে ক্ষান্ত হইয়া, দুইটী পৌষ্পিক পত্রের সৃষ্টি করিলে, উক্ত দুইটী পত্রের মধ্যদেশ হইতে একটী বা ততোধিক পুষ্পদণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে। পরে সেই দণ্ডোপরি এক হইতে বহু পুষ্প জন্মিয়া থাকে। এক দণ্ডে বহু পুষ্প হইলে, তাহাকে 'পুষ্পগুচ্ছ' কহে। মৌরি, মৌয়া প্রভৃতি বৃক্ষ পুষ্পগুচ্ছের সুন্দর উদাহরণস্থল।

যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট পুষ্পবিন্যাস অন্ত-মুকুলেই হইয়া থাকে। অতএব উক্ত মুকুল-স্থিত পুষ্পদণ্ডের নিম্নে যে পত্র দুইটী থাকে, তাহা পৌষ্পিক পত্র কি না, সহজেই জানিতে পারা যায়। আপনারা গোলাপ ফুলের গাছ দেখিয়াছেন; তাহার প্রত্যেক কাণ্ডকোষ হইতে যে বৃন্তের সৃষ্টি হয়, সেই সকল বৃন্তোপরি (প্রত্যেক বৃন্তে) পাঁচটী কিম্বা সাতটী পত্র পরস্পর বিন্যস্ত হইয়া থাকে; কিন্তু অন্ত-মুকুলের শেষে আর উক্তরূপ পত্রবিন্যাস হয় না। তথায় দুইটী পত্র রাখিয়া পুষ্পদণ্ড উদ্গত হইয়া থাকে। অতএব এখানে মনে করুন, যে গোলাপ গাছের প্রত্যেক পত্রবৃন্তে ৫টী কিম্বা ৭টী পত্র উৎপন্ন হইত, সে স্থানে দুইটী পত্র প্রকাশিত হইয়া, অপরাপর পত্র-গুলি অপ্রকাশিত রাখিয়া তাহাদিগকে কুঁড়ির আকারে বিজড়িত করিয়া ফেলে। একারণ এখানে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে যে, পৌষ্পিক পত্র বিজ-ড়িত হইলেই কুঁড়ির সৃষ্টি হয়, এবং উক্ত গোলাপ কুঁড়ির নিম্নে যে দুইটী পত্র থাকে, তাহাই পৌষ্পিক পত্র। কিন্তু গোলাপ গাছে যেমন পৌষ্পিক পত্র সহজে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ডুমুর গাছে দৃষ্ট হয় না। কারণ, ডুমুরগাছ অনির্দ্দিষ্ট পুষ্প প্রসব করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে আপনাদের বলা হইয়াছে যে, নির্দ্দিষ্ট পুষ্পবিন্যাস অন্ত-মুকুলে হইয়া থাকে; কিন্তু ডুমুর গাছে অনির্দ্দিষ্ট পুষ্পবিন্যাস হয়। তাহার কারণ*

* অন্ত-মুকুল বলিলে এখানে একবীজদল উদ্ভিদ যেন মনে করিবেন না; কারণ, আমরা এখানে কক্ষমুকুলের অন্তকেও অন্ত-মুকুল বলিতেছি।

ইহারা কক্ষ-মুকুলের অন্তে পুষ্প প্রকাশ না করিয়া, পত্র-কক্ষ হইতে পুষ্প প্রসব করিয়া থাকে। অতএব, পত্রকক্ষ হইতে একবারে পুষ্প প্রসব করিতে গেলে, সহজেই পৌষ্পিক পত্র সকলও বিজড়িত হইয়া, কুঁড়ির আকারে দেখা দিয়া থাকে। কুঁড়ি রূপ পৌষ্পিক পত্র আর প্রস্ফুটিত হয় না। কারণ, ডুমুর বৃক্ষ রসাধিক্য-বশতঃ সেই কুঁড়িকে মাংসল করিয়া ফেলে। সেই জন্য উক্ত মাংসল কুঁড়ির ভিতর পুষ্প সমুদয় থাকিয়া যায়; এবং আমরা সেই মাংসল পুষ্পাধারকে 'ডুম্বুর' ফল বলিয়া থাকি।

জবাফুলও নির্দ্দিষ্টরূপে পুষ্প প্রসব করে না। ইহাদের পৌষ্পিক পত্র পুষ্পদণ্ডের ন্যায় বহির্গত হইয়া, কুঁড়ির আকারে জড়াইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত বৃক্ষ অধিক-রস-যুক্ত নয় বলিয়া, সেই কুঁড়িকে মাংসল করিতে পারে না। সেই জন্যই জবাফুলের গাছে কুঁড়ি অধিক দিন পরে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

শ্রীঃ—

আহার।

সন ১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতা বহুবাজারস্থ বিজ্ঞান মন্দিরে 'আহার' সম্বন্ধে স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম বিবৃত হইল—

"শোণিত জীবদেহের প্রধান বস্তু। আমরা প্রত্যহ যাহা ভোজন করি, তদ্দ্বারা দেহে শোণিত উৎপন্ন হয়। মাংস, চর্ম্ম প্রভৃতি শোণিত হইতেই উৎপন্ন হয়। শোণিতকে পরিষ্কার রাখিতে পারিলেই দেহ সুস্থ থাকে।

শোণিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় উত্তপ্ত হয়। স্বাস্থ্য রাখিতে হইলে, দেহকে উত্তাপ-বিশিষ্ট রাখিতে হয়। সুতরাং কিরূপ দ্রব্য আহার করিলে শরীর উত্তাপ-বিশিষ্ট থাকে, তাহা জানা আমাদের আবশ্যক। জানিবার পূর্ব্বে আমাদের দেহে কি কি মূল পদার্থ কি কি পরিমাণে আছে, দেখা যাউক—

অক্সিজেন ৭২'০, অঙ্গার ১০'৫, হাইড্রোজেন ৯'১, নাইট্রোজেন ২'৫, ক্যালসিয়ম ১'৩, ফস্‌ফরাস ১'১৫, গন্ধক ০'১৪৭৬, সোডিয়ম ০'১, ক্লোরিণ '০৮৫, পোটাসিয়ম '০২৬, লৌহ '০১, ম্যানগিনিস '০০০২।

এতদ্ভিন্ন তাম্র, সীস এবং এলুমিনিয়ম অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

যে সমস্ত দ্রব্যের নামোল্লেখ হইল, ঐ সকল দ্রব্য যথার্থ নরদেহে আছে কি না, তাহাই এক্ষণে পরীক্ষা করা যাউক।

নরদেহে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন যে অধিক পরিমাণে আছে, তাহা অনায়াসে জানা যায়। অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন মিলিত হইয়া জল হয়; দেহের মধ্যে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন আছে বলিয়া ঘর্ম্ম হইয়া থাকে।

নরমাংস অভাবে এই বন্যমাংস দ্বারা আর একটী পরীক্ষা দেখাইতেছি। আপনারা দেখিবেন, মাংসে জল আছে। এই শিশির মধ্যে মাংস পুরিয়া, যদি শিশিতে উত্তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে মাংসস্থ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন একত্র হইয়া শিশির ভিতর জল আসিবে। (তাহাই করা হইল, তাহাতে শিশির ভিতর জল বাহির হইল।)

স্থির হইল, মাংসে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন বাষ্প আছে। এখন দেখা যাউক, মাংসে অঙ্গার আছে কি না। এই শিশিস্থ বন্যমাংসে অধিক উত্তাপ দিলে দেখিবেন, উহা কাল হইয়া যাইবে। (তাই করা হইল, মাংস উত্তাপে দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল।)

দেখা গেল, মাংসে অঙ্গার আছে। এখন দেখা যাউক, মাংসে নাইট্রোজেন আছে কি না। এ বিষয় পরীক্ষা করিবার অগ্রে নাইট্রোজেন-বিশিষ্ট একটী যৌগিক বস্তু পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এমোনিয়া নাইট্রোজেন-বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ। এক ভাগ হাইড্রোজেন, এবং তিন ভাগ নাইট্রোজেন দ্বারা এই বস্তু প্রস্তুত হয়।

এক্ষণে এই এমোনিয়ার পাত্রে আমি এক খণ্ড হরিদ্রাভ কাগজ ধরিলাম। দেখুন, ইহার কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। যেমন হরিদ্রা বর্ণের কাগজ, তেমনই রহিল। কিন্তু এই এমোনিয়ার সহিত যদি কষ্টিক সোডা মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রদান করি এবং তৎপরে এই হরিদ্রাভ কাগজ খণ্ড ইহার ভিতর ধরি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, হরিদ্রা বর্ণের কাগজ বিবর্ণ হইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। (বস্তুতঃ পরীক্ষায় তাহাই হইল।)

এখন মাংস পরীক্ষা করা যাউক। এই এক খণ্ড মাংসে প্রথমতঃ হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিলাম। দেখুন, শিশির ভিতর শুভ্র বর্ণের ধূম উত্থিত হইতেছে। উক্ত ধূম এমোনিয়া। এই এমোনিয়ায় আমি এক খণ্ড হরিদ্রাভ কাগজ ধরিলাম। দেখুন, ইহার কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। কিন্তু এই

এমোনিয়ার সহিত যদ্যপি কষ্টিকসোডা যোগ করিয়া উত্তপ্ত করি ; পরে এই হরিদ্রাভ কাগজ খানি ইহাতে ধরি ; তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, পূর্ব্বকার পরীক্ষার মত ইহাও লোহিত বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব ইহা দ্বারা জানা গেল যে, মাংসে নাইট্রোজেন আছে।

ফস্‌ফরাস এবং ক্যালসিয়ম—এই দুইটী বস্তু দ্বারা আমাদের অস্থি উৎপন্ন হইয়াছে। ডাক্তারেরা অস্থি দগ্ধ করিয়া ফসফরাস প্রস্তুত করেন, তাহা, বোধ হয়, অনেকেই অবগত আছেন। ক্যালসিয়ম অর্থাৎ চুণ এবং ফস্‌ফরাস অস্থিতে আছে বলিয়াই, অস্থি অতিশয় দৃঢ় বস্তু হইয়াছে। এখন অস্থি হইতে উক্ত দুই বস্তুকে পৃথক করিয়া দিলে, দেখা যাইবে যে, অস্থি রবরবৎ কোমল হইবে। অর্থাৎ, অস্থিতে তখন কেবল শিরিষ পড়িয়া থাকিবে। এই হাইড্রোক্লোরিক এসিডের পাত্রে আমি এই অস্থিকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলাম। এ পরীক্ষায় কিছু সময় লাগিবে। দেখিবেন, অস্থি রবরবৎ হইয়াছে।

জীবদেহে, নখে এবং চুলে গন্ধক আছে, এ বিষয় বহু প্রকারে পরীক্ষা করা যায়। তন্মধ্যে আমি একটী সামান্য পরীক্ষা দ্বারা সহজেই বুঝাইতেছি।

এই পাত্রে একটুকু গন্ধক রাখিলাম। ইহার সহিত প্রুসিয়া সোডা নাইট্রেট মিশ্রিত করিলাম, এবং এই বাঁকনল দিয়া দীপশিখার জ্বলন্ত তাপ ইহাতে প্রদান করিতে লাগিলাম। তাহার পর ইহাতে সোডিয়াম কার্ব্বনেট দিলাম। দেখুন, গন্ধক বেগুণে রঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

(অতঃপর বক্তা কতকগুলি চুল লইয়া উক্ত রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা পরীক্ষা করিলেন, তাহাতে চুলও বেগুণে রঙ্গ ধারণ করিল।)

এই পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইল যে, চুলে গন্ধক আছে। তৎপরে নরদেহে সোডিয়ম, লৌহ, তাম্র, সীস ইত্যাদি এত অল্প আছে যে, তাহা আর এখানে ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড দিয়া পরীক্ষা দেখান চলে না।

আমাদের দেহ কি কি মূল উপাদান দ্বারা গঠিত, এখন জানা গেল। ঐ সকল উপাদানকে স্ব স্ব ভাবে রাখিতে পারিলেই দেহ সুস্থ থাকে। জগদীশ্বর এতদর্থে যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাই ভক্ষণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। স্বেচ্ছাচারী হইয়া, যা' তা' দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, অতি অল্প দিন মধ্যে স্বাস্থ্যহীন হইতে হয়।

আমাদের আহার করিবার উদ্দেশ্য দুই প্রকার। ১ম, শরীরের বলাধান ; এবং ২য়, শরীরের তাপোৎপাদন।

এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে নাইট্রোজেন আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই জন্য ভোজ্য বস্তুর মধ্যে কোন্‌টিতে কি পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে, সর্ব্বাগ্রে তাহা দেখা প্রয়োজনীয়।

ভোজ্য বস্তুর মধ্যে সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ্য পদার্থেই নাইট্রোজেনাস্‌ বেশী। ছোলা-মটরে যে পরিমাণ নাইট্রোজেনাস্‌ আছে, অধিকাংশ স্থলে মাংসে সে পরিমাণ নাইট্রোজেনাস্‌ নাই। মনুষ্যের উৎকৃষ্ট আহার দালের ভিতর সমস্তই আছে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভোজ্য দ্রব্য চারি ভাগে বিভক্ত।

১ম, নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্য।

২য়, চিনি ঘটিত খাদ্য।

৩য়, ঘৃত বা তৈল ঘটিত খাদ্য।

৪র্থ, জল।

এই শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন, দুগ্ধই মনুষ্যের প্রধান আহার। কারণ, দুগ্ধে নাইট্রোজেন আছে, চিনি আছে, মাখন আছে, এবং জল আছে।

১১ ভাগ জলের সহিত ১২ ভাগ অঙ্গার মিলিত হইলেই চিনি হয়। চিনিতে জল আছে। উক্ত জল কোন প্রকারে সংশোধন করিতে পারিলেই অঙ্গার বাহির হইয়া থাকে।

এই পাত্রে কিছু সালফিউরিক এসিড রাখিয়া ইহাতে চিনি নিক্ষেপ করিলাম। উক্ত এসিড চিনিস্থ জল যত টানিয়া লইবে, ততই চিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া অঙ্গার হইয়া যাইবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা চিনি হইতে জুতা-ব্রুশের কালী হইয়া থাকে।

হাইড্রোজেন।

হাইড্রোজেন ধাতুও নহে, উপধাতুও নহে; অথচ ইহা ধাতুর কার্য্য করে। ইহার বাঙ্গালা নাম জলজান। এই বাষ্প অন্যান্য আর সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা লঘু। ইহা সর্ব্বদাই যৌগিকভাবে অবস্থিতি করে; কিন্তু এ

সম্বন্ধে অনেক মতামত আছে। কেহ কেহ বলেন, আগ্নেয়-গিরি হইতে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পাওয়া যায়, অর্থাৎ তথায় হাইড্রোজেন যৌগিক ভাবে থাকে না। আবার কেহ কেহ বলেন, সূর্য্যলোক হইতে এখানে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন আসিয়া থাকে। যাহাই হউক, পোটাসিয়ম, সোডিয়ম, লৌহ প্রভৃতি হইতে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন প্রস্তুত হইতে পারে।

সোডিয়ম ও পোটাসিয়ম হইতে উক্ত বাষ্প প্রস্তুত করায় বিপদের আশঙ্কা আছে। লৌহ হইতে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করায় ব্যয় কম পড়ে না। অতএব যাহাতে ব্যয় কম পড়ে এবং বিপদেরও সম্ভাবনা কম হয়, এরূপ প্রক্রিয়ার কতকটা এস্থানে বলা যাইতেছে—

একটি বোতলে কিছু দস্তা রাখিয়া, তাহাতে জল মিশ্রিত করিয়া, পরে তাহাতে কিছু সল্‌ফিউরিক এসিড্ ঢালিয়া দিলে, উক্ত বোতলের মধ্য হইতে বাষ্প উঠিতে আরম্ভ হয়। ঐ বাষ্পই হাইড্রোজেন বাষ্প। উহার সংগ্রহ করিতে হইলে উক্ত বোতলের মুখে একটি ছিপি বন্ধ করিয়া বোতলের ভিতর হইতে বাষ্প বহির্গত হইতে পারে, এরূপ ভাবে ছিপিটির মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র করিয়া বোতলটি একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে রাখিতে হয়। যেহেতু, হাইড্রোজেন বাষ্প বায়ুস্থ অম্লজানে মিশিলে ভয়ানক শব্দ করিয়া জল হইয়া যায়। অতঃপর আর একটি খালি বোতল জলপূর্ণ করিয়া, পূর্ব্ব কথিত জল-নিমজ্জিত বোতলটির ছিপিমধ্যস্থ ছিদ্রের উপর উহাকে কৌশল করিয়া বসাইয়া দিলে, পূর্ব্বোক্ত বোতলের বাষ্প ক্রমে এই দ্বিতীয় বোতলে সংগৃহীত হইবে; এবং বোতল বাষ্পপূর্ণ হইবার সময় বোতলস্থ জল ক্রমশঃ নীচে নামিয়া পড়িবে।

উল্লিখিত উপায়ে হাইড্রোজেন সংগ্রহ ব্যয়সুলভ হইলেও, উহা নিরাপদ নহে। নিম্নলিখিত উপায়টি অপেক্ষাকৃত অনেক নিরাপদ।

ডাক্তারখানায় দুই-মুখ-বিশিষ্ট এক প্রকার বোতল দেখিতে পাওয়া যায়। উহা দেখিতে অনেকটা গাড়ুর মত। উহাকে ইংরাজীতে উল্‌ফ্ বোতল বলে। গাড়ুর যে মুখ দিয়া জল পোরা হয়, উল্‌ফ্ বোতলের সেই মুখে একটি ছিপি এবং ছিপির সহিত সংলগ্ন একটি কাচনল বোতলের ভিতর অংশে থাকে। এই কাচনল দিবার কারণ, যখন উক্ত বোতলে দস্তা ও জল মিশ্রিত সলফিউরিক এসিড দেওয়া হয়, তখন যে হাইড্রোজেন গ্যাস হয়, সেই গ্যাস বোতলস্থ শূন্য স্থানের মিশ্রিত অক্সিজেনের সহিত

মিলিত হইলে শব্দ হইয়া জল হইয়া যাইবে। উক্ত কাচনলটি থাকিলে আর ওরূপ হইবে না। বোতলটির অপর মুখে একটী রবারের নল লাগান থাকে। রবারের নলের অন্য প্রান্ত একটী কাচ নলে সংযোজিত ; ঐ কাচ নলের ঐ মুখটি একটি জলপাত্রে রক্ষিত। উক্ত জল-পাত্রের ভিতর আর একটি যন্ত্র আছে। উহার নাম 'নিউম্যাটিক ট্রফ'। এই যন্ত্রটি বোতল রাখিবার এক প্রকার বৈঠক ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে বোতলে হাই-ড্রোজেন সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা জলপূর্ণ করিয়া হস্ত তালু দ্বারা উপুড় করিয়া লইয়া ঐ নিউম্যাটিক্ ট্রফে বসাইয়া দিবে ; পরে পূর্ব্বোক্ত কাচনল বোতলের মুখে জলমধ্যে সংযুক্ত করিয়া দিবে। তাহা হইলেই হাইড্রোজেন সংগৃহীত হইবে। এই প্রক্রিয়ায় যন্ত্র সাজাইয়া দিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইলেই চলিতে পারে। সুতরাং ইহাতে বিপদের আশঙ্কা খুবই কম।

প্রথমতঃ, উল্‌ফ্ বোতলে যখন দস্তা ও সলফিউরিক এসিড একত্র করা হইবে, তখন যে হাইড্রোজেন গ্যাস উত্থিত হইবে, তাহা ধরিবার জন্য তৎক্ষণাৎ কাচনলকে নিউম্যাটিক ট্রফে সংযুক্ত করা উচিত নহে। অন্ততঃ তিন মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া পরে গ্যাস সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, উল্‌ফ্ বোতলের ছিপির সহিত যে কাচ নলটি আছে, তাহা যেন উক্ত বোতলস্থ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকে। তৃতীয়তঃ, বোতলের কোথাও যেন কোনরূপ ছিদ্র না থাকে, এবং অবশেষে যে বোতলে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করা হইবে, তাহাকে যেন অগ্রে বায়ু-শূন্য করা হয়। বায়ু-শূন্য করা দুই প্রকারে হইতে পারে। যে পাত্র বায়ু-শূন্য করিতে হইবে, তাহাকে তপ্ত করা উচিত ; কিন্তু ঐ উপায়ে বায়ু-শূন্য করিয়া পাত্রকে বায়ু-শূন্য অবস্থায় রাখা সহজ নহে। এই কারণ, পাত্রমধ্যে জল পূরিয়া উহাকে বায়ু-শূন্য করাই প্রশস্ত ; তবে, জলমধ্যে যাহাদিগকে পাওয়া যায় না, তাহাদের জন্য পারদপাত্রে ঐ নীতি অবলম্বন করিতে হয়।

সাধারণতঃ বাজারে যে দস্তা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা যদিও প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন গ্যাস হয় বটে, কিন্তু উহার তেজ বড় বেশী। বাজারে দস্তা দিয়া হাইড্রোজেন সংগ্রহ করিতে গেলে, বোতল ফাটিয়া চটিয়া যায় ; এই নিমিত্ত হাইড্রোজেন গ্যাসের জন্য 'গ্রানুলেটেড' জিঙ্কের প্রয়োজন হয়। সাধারণ দস্তাকে উত্তাপ দ্বারা গলাইয়া তাহাকে জলে ফেলিয়া দিলেই, গ্রানুলেটেড জিঙ্ক প্রস্তুত হয়। দস্তা তপ্ত হইয়া গলিয়া জলে

পড়িলে, তাহার পরমাণু সকল ছড়াইয়া পড়ে, এবং এই কারণে অধিক স্থান অবরোধ করে। যদ্যপি অল্প স্থানের মধ্যে অধিক-পরমাণু-নিহিত দস্তাকে পূর্ব্বোক্ত বোতলের মধ্যে রাখিয়া, তাহাতে সল্‌ফিউরিক এসিড দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার তেজে বোতল ফাটিয়া গিয়া বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণ বশতঃ দস্তাকে 'গ্রানুলেটেড' করিয়া বোতলে দিতে হয়। 'গ্রানুলেটেড' জিঙ্ক দেখিতে ছোট ছোট মটরের ন্যায় গোলাকার।

উল্‌স্ বোতলে 'গ্রানুলেটেড' জিঙ্ক দিয়া, পরে তাহাতে কিছু জল দেওয়া কর্ত্তব্য। পরন্তু এ সময়ে জল না দিয়া সল্‌ফিউরিক এসিডে জল মিশ্রিত করিয়া দিলেও চলে।

দস্তা ও সলিফিউরিক এসিড একত্র করিলেই বাষ্প হইতে থাকে। উক্ত বাষ্প রাসায়নিক সংযোগে উত্থিত হয়। দস্তার পরিবর্ত্তে লৌহ, টিন, সোডিয়ম, পোটাসিয়ম এবং স্পেলটার-পাত দ্বারা একার্য্য হইয়া থাকে। স্পেলটার পাত টিনওয়ালার দোকানে পাওয়া যায়। দুই প্রকার টিন বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়; এক প্রকার টিন দেখিতে উজ্জ্বল, আর এক প্রকার অপেক্ষাকৃত মলিন। উক্ত মলিন টিনকেই 'স্পেলটার' বলে।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে হাইড্রোজেন অপরাপর বস্তুর সহিত মিশ্রিত থাকে ;—

২ ভাগ (অর্থাৎ দুই পরমাণু) হাইড্রোজেন এবং ১ ভাগ (এক পরমাণু) অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া একটি যৌগিক বস্তু (জল) হয়; এইরূপ ১ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৩ ভাগ হাইড্রোজেন একত্র হইয়া, আর একটি যৌগিক বস্তু (এমোনিয়া) হয়। এতদ্ভিন্ন ৪ ভাগ হাইড্রোজেন, ১ ভাগ কার্ব্বণের সহিত এবং ১ ভাগ হাইড্রোজেন, ১ ভাগ ক্লোরিনের সহিত মিশ্রিত হইয়া অবস্থিতি করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাইড্রোজেন বাষ্প অতি লঘু বলিয়া ইহা দ্বারা বেলুন যন্ত্র আকাশমার্গে উত্থিত হয়। ইহা দাহ্য বস্তু।

কার্ব্বণ পেপার দ্বারা ছবি আঁকা।

কার্ব্বণ পেপার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়; ডাকঘরে ও বড় বড় আপিসে এই কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কার্ব্বণ পেপার দ্বারা লেখার নকল রাখা যায়।

উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী অতি সহজ। কেরসিন ল্যাম্পে চিম্‌নী না দিলে, বড়ই ভূষা উত্থিত হয়। ঐ ল্যাম্পে কোন পাত্র ধরিলে তাহার তলদেশে ভূষা সঞ্চিত হয়। এই ভূষাকে বৈজ্ঞানিকেরা বায়ু-দগ্ধ কয়লা বলেন। ঐ কয়লার ল্যাটিন নাম কার্ব্বো।

কার্ব্বো দ্বারা যে কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহাকেই "কার্ব্বণ পেপার" বলা হয়। কেরসিন তৈলের ভূষা বা যে কোন ভূষাই হউক, তাহাতে অল্প তৈল (যে কোন তৈল হউক) দিয়া তেল কালী প্রস্তুত করিয়া, কাগজের পৃষ্ঠে মাখাইয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। ইহাই কার্ব্বণ পেপার।

বাজারে এই কালীর কাগজে দুই পৃষ্ঠায় তেল কালী মাখান হয়, তাহাতে কিন্তু অসুবিধা আছে। কোন কাগজের নিম্নে রাখিয়া নকল করিতে হইলে নিম্নস্থ কাগজে দাগ লাগিয়া, কাগজ নষ্ট হয়। আমরা ঘরে এক পৃষ্ঠায় মাখাইয়া ইহা প্রস্তুত করি, এবং রীতিমত শুষ্ক করিয়া পরে ব্যবহার করি।

এই কাগজের দ্বারা উৎকৃষ্ট ছবি আঁকা যায়। যাঁহারা ছবি আঁকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই কাগজের সাহায্যে উৎকৃষ্ট ছবি আঁকিতে পারি-বেন। প্রথমতঃ অল্প কারুকার্য্য বিশিষ্ট ছবির নিম্নে এই কাগজ দিয়া, পরে এই কাগজের নিম্নে একখানি সাদা কাগজ দিতে হয়। এখন উপরের ছবিখানির উপর কোন কলমের অগ্রভাগ দিয়া, ক্রমে ক্রমে দাগা বুলাইবার মত দাগ দিয়া যাউন। তাহা হইলে দেখিবেন, ঐ চিত্রের প্রতিরূপ সেই সাদা কাগজে উঠিয়াছে।

ছবি আঁকিতে হইলে, অগ্রে কসি টানা শিখিতে হয়। কসির গুণে কাল মেঘ এবং সাদা মেঘ ইত্যাদি কেমন অঙ্কিত হয়, তাহা অনেকে ইংরাজী পুস্তকস্থ চিত্রে দেখিয়াছেন বোধ হয়। যিনি নানাবিধ ভাবে ভাল কসি টানিতে পারেন, তিনিই ভাল ছবি আঁকিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বহু শিল্প-কার্য্য-বিশিষ্ট ছবি কার্ব্বণ কাগজের সাহায্যে আঁকিতে হইলে, অগ্রে

মোটা মোটা বড় বড় দাগগুলি বুলাইতে হয়; তাহার পর কার্ব্বণ পেপার ছাড়িয়া, যে ছবি খানির নকল করা হইতেছে, তাহার প্রতি স্থির-চিত্তে দৃষ্টি পূর্ব্বক, পূর্ব্বোক্ত মোটা মোটা অঙ্কিত কাগজের ভিতর অপরাপর বিষয়গুলি অঙ্কিত করিয়া দিতে হয়।

একখানি ছবি প্রথমতঃ কার্ব্বণ পেপার সাহায্যে আঁকিয়া, সেই ছবিখানি ২।৪ বার উল্টা পাল্টা করিয়া আঁকিলেই, কতকটা অভ্যাস হয়; ঐ অভ্যাসের গুণে তখন নিজেই সে ছবিকে আঁকা যায়। ছবি আঁকা মন্দ আমোদ নহে।

অর্থ-নীতি।

(মুদ্রাতত্ত্ব।)

১। বিনিময় বণ্টনাদি কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ রাজশক্তি কর্ত্তৃক চিহ্নিত, স্থিরীকৃত-মূল্য-বিশিষ্ট ও বিনিময়-গ্রাহ্য বস্তুর নাম মুদ্রা।

২। মুদ্রাই জাতীয় পরিশ্রম-লব্ধ ফলের শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী সাকার মূর্ত্তি।

৩। মুদ্রা ব্যতীত যাবতীয় বস্তুই অবিনিময়-গ্রাহ্য। বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রাই রাজশক্তি কর্ত্তৃক অবিনিময়ে প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে প্রবলতা লাভ করিয়াছে।

৪। মুদ্রার রূপান্তর সাধন অর্থনীতি-বিরুদ্ধ। কেননা, মুদ্রার রূপান্তর হইলে উহা অবিনিময়-গ্রাহ্য হইয়া পড়ে। বিনিময়-গ্রাহ্য করিবার জন্য ক্রেতাকে অনুসন্ধান করিতে হয়; অর্থাৎ যাহার নিকট মুদ্রা আছে, তাহার প্রয়োজন ও প্রাধান্যতার অধীন হইতে হয়।

৫। মুদ্রাব্যতীত অন্যবিধ যাবতীয় সঞ্চয় অর্থ-নীতি মতে ব্যর্থ সঞ্চয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যেহেতু বিবিধ প্রকারের ধনরাজি কোষাগারে পূর্ণ থাকিলেও উহা অবিনিময়-গ্রাহ্যতা নিবন্ধন অব্যবহার্য্য বলিয়া মুদ্রাশক্তির অধীন জানিবেন।

৬। মুদ্রার সংখ্যা হ্রাসে ও মুদ্রার রূপান্তর সাধনে কুসীদের হার বৃদ্ধি, মহাজনের স্বার্থপরতা ও ষ্টাম্প-করে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং যাবতীয় সম্পত্তির মূল্য হ্রাস, ও ব্যক্তি ও জাতিগত সঞ্চয় ব্যর্থ হইয়া যায়।

৭। রাজশক্তি কর্ত্তৃক মুদ্রার বিনিময়-শক্তি সর্ব্বশক্তিমানরূপে প্রবল

করা হইয়াছে। হস্তান্তরকরণ, ক্রয়বিক্রয়, ঋণ আদান প্রদান প্রভৃতি বিবিধ সূত্রে ষ্ট্যাম্পকর প্রবর্ত্তন করিয়া বিনিময়ের মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্ত ষ্ট্যাম্পের সাহায্যে ধনীর পক্ষ সমর্থন করিয়া, দেওয়ানী আদালতে টাকা আদায়ে বিবিধ ষ্ট্যাম্প-কর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে মহাজনের অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে বিচারে ব্যক্তিগত স্বত্বসকল সুদৃঢ় করিয়া বিচারে ব্যয়-বাহুল্য বাড়াইয়া বিষম বৈষম্য স্থাপন করা হইয়াছে। বিচারে প্রমাণের আদর বাড়াইয়া দিয়া ও প্রমাণের মূলে ষ্ট্যাম্প-কর প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। নৈতিক বল বাড়িলেই রাজস্বের ক্ষতি। পরস্পরের বিশ্বাস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই নৈতিক বলের ভিত্তি। আইন এরূপ নৈতিকবল ও পরস্পরের বিশ্বাসের পক্ষপাতী নহে। সুতরাং প্রকারান্তরে, আইন রাজস্ব-সংগ্রহ জন্য নৈতিক হীনতার সাহায্য করিতেছে।

৮। গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় রাজস্ব মুদ্রায় প্রদান করিতে হয়। সুতরাং মুদ্রার এই অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা নিবন্ধন সকলকে মুদ্রা সংগ্রহের নিমিত্ত বাধ্য হইতে হইয়াছে এবং যাবতীয় পণ্যদ্রব্য মুদ্রায় পরিণত করিবার জন্য সকলকে গুরুতর শ্রম করিতে হইতেছে।

৯। এই মুদ্রা কেবল গবর্ণমেণ্টের টাকশালে প্রস্তুত ও কারেন্সি অফিসের দ্বারা প্রচারিত হয়। বণিকগণ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ও ব্যাঙ্ক সমূহ হইতে টাকা লইয়া এ দেশের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকেন। এই সূত্রেই আমরা প্রধানতঃ টাকা পাইয়া থাকি।

১০। পূর্ব্বে ভারতের টাকশালে রৌপ্য দিয়া যে কেহ মুদ্রা প্রস্তুত করাইতে পারিত। তৎপরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত ব্যবস্থা রদ করিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ ভরিকরা ২৪৲ টাকা দরে মূল্য খতাইয়া টাকা দেওয়া বা সভারিণ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ইহাতে সঞ্চিত ভারতীয় মাল, রৌপ্যের মূল্য অনেক হ্রাস হইয়াছে। ভারতবাসীকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। একমাত্র অসঞ্চয় বিলাসিতাই এই ঘোরতর ক্ষতির মূল। কেননা, সঞ্চিত মাল রৌপ্য যদি রৌপ্যমুদ্রায় সঞ্চিত থাকিত, তাহা হইলে এই গুরুতর ক্ষতি সহ্য করিতে হইত না। বিনিময়-গ্রাহ্যতা ও স্থির-মূল্য-বিশিষ্টতা কেবল রাজ-মুদ্রারই আছে; ইহাই গবর্ণমেণ্টের আইন। বলা বাহুল্য, এইরূপ বিনিময়-গ্রাহ্যতা স্বর্ণ-রৌপ্যেরও নাই। চিন্তা করিয়া দেখিবেন, মনুষ্যের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক বিভাগ বণ্টনাদির

কার্য্য সৌকর্য্যার্থ সামাজিক শক্তি ও রাজশক্তি কর্তৃক ঔপাধিক ধনের কল্পনা করা হইয়াছে ও নিরুপাধিক ধনের সহিত উহার সমতাবিধান করা হইয়াছে। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত নানাবিধ অভাব বৃদ্ধি হওয়ায়, বিবিধ প্রকারের পরিকল্পিত ধনের আদর বাড়িয়াছে। ইহাতে পৃথিবীস্থ বিবিধ কার্য্যবিস্তার, যথা শিল্প, ব্যবসায় ও কলকারখানাদি বাড়িয়াছে। পরন্তু সর্ব্বদেশে রাজশক্তি কর্তৃক মুদ্রার বিনিময়-শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তি মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, যাবতীয় বস্তুকেই বিনিময়ে মুদ্রার নিম্নাসন গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং এই মুদ্রার বিনিময়-শক্তি যখন যেরূপ দাঁড়ায়, তখন তাহার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিও সেইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে।

১১। মানবের জীবনরক্ষার্থ যাহা অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়, তাহাকে নিরুপাধিক ধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। তদ্ভিন্ন সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন জন্য কৃষক, শিল্পী, শ্রমজীবী, পণ্ডিত, পুরোহিত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর শ্রমের ফল—বিনিময়ে সাম্যবিধান জন্য বিবিধ প্রয়োজন ও ঔপাধিক ধনের সহিত কল্পনা হইয়াছে। তন্মধ্যে ধাতু-মুদ্রাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর যাবতীয় জেতৃসম্প্রদায় এক্ষণে স্বর্ণ-সংগ্রহে মনোযোগী হইয়াছেন এবং তাহাদের ধনশক্তি ও প্রভুশক্তি বিজিত জাতির শ্রম-লব্ধ ফল শোষণ করিয়া লইতেছে। সুতরাং রাজমুদ্রা দ্বারা কর-প্রদান-বিধি তাহাদের স্বার্থের ঘোর অনুকূল। ভারতবাসী ক্রেতা এবং কৃষক; সুতরাং বর্ত্তমান রাজস্ব সংগ্রহের নীতি ভারতবাসীর পক্ষে আদৌ অনুকূল নহে। ইহাতে ভারতবাসীর শ্রমলব্ধ ফলের অযথা কুসীদ ও ব্যবসায় শক্তি কর্তৃক অপচয় সাধিত হইতেছে। যাহা হউক, মুদ্রামধ্যে স্বর্ণমুদ্রাই শ্রেষ্ঠ এবং ধাতুমধ্যে স্বর্ণই শ্রেষ্ঠ ধন; ইহা সভ্য, পরাক্রান্ত জাতির লক্ষ্যস্থল। সুতরাং ভারতবর্ষে রৌপ্যের আদর যতই কমিয়া যায়, ততই মঙ্গল। কারণ, মুদ্রায় পরিণত হইবার একমাত্র স্বাধীন অধিকার স্বর্ণেরই আছে, রৌপ্যের নাই। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই স্বর্ণ দিয়া টাকশালে সভারিণ বা রূপার টাকা পাইতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট যখন নিজের প্রয়োজন বুঝিবেন, তখন রৌপ্য হইতে টাকা প্রস্তুত করিবেন। সুতরাং বিনিময়-অযোগ্য, মুদ্রা হইতে বিতাড়িত, অকর্ম্মণ্য মাল রৌপ্য না থাকাই মঙ্গল। মুদ্রা সঞ্চয়ে কুসীদের দায়িত্ব, মহাজনের অত্যাচার, ক্রেতার অনুসন্ধান ও ষ্ট্যাম্পকর-জুলুম হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের মতে জাতীয় সঞ্চয় স্বর্ণে না হইয়া সভারিণে হওয়া উচিত।

১২। ১৮৯৩ সালের মৌদ্রিক বিধিতে ভারতের স্বর্ণস্রোত ইউরোপের কোষাগার পূর্ণ করিতেছে। মুদ্রার সংখ্যা হ্রাসে ও বিবিধ ষ্ট্যাম্পকরে, দীন ভারতের দীনতা ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। সঞ্চিত স্বর্ণ-ভাণ্ডার শূন্য হইয়া কেবল রৌপ্য ও রৌপ্যমুদ্রার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিতেছে।

১৩। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমাদের মত অধীনজাতির পক্ষে ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাবলম্বন শিক্ষার নিমিত্ত অযথা বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া সংযম শিক্ষা করা উচিত। যাহা অপরিহার্য্য অভাব অর্থাৎ যাহা না হইলে আমাদের জীবনরক্ষা ও মানবত্বের বিকাশ হয় না, তাহাই যেন আমাদের প্রয়োজনীয় হয়, তাহার জন্য, আইস, সকলে একাগ্রতা ও সংযম অভ্যাস করি। যে জাতি স্বাধীন, যাহাদের হস্তে প্রভুশক্তি আছে, তাহাদেরই ধনশক্তি ও শ্রমশক্তি যথাবিধি রক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্বাধীন জাতির আদর্শে কেবল অনুকরণ-প্রবল হইয়া অযথা শ্রম ও কার্য্য বিস্তার করিয়া জাতীয় জীবন ও সময় নষ্ট করা মূর্খতার কার্য্য।

১৪। আত্মসংযম করিয়া, যথালাভে সন্তুষ্ট হইয়া, অগ্রে আমাদের পারিবারিক জীবনের সংস্কার সাধন করি। যাহাতে আমরা অযথা বিলাসিতা, মুদ্রার রূপান্তর সাধন, কুটিলতা, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের কলঙ্ক অপনোদন করতঃ সত্যবাক্, ইন্দ্রিয়-সংযম, আত্মতেজের উন্মেষ সাধন করিতে পারি, তদ্রূপ চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। ভগবানে আত্ম-সমর্পণ, সংযম সংযোগে অক্লান্ততা ও শ্রম-সহিষ্ণুতা লাভ করতঃ সঞ্চয়ী হইতে প্রথমে শিক্ষা করি, তবে কর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া চীৎকার করিব। প্রবৃত্তির দোষে কার্য্য ও কারণ অবধারণে অক্ষম হইয়া, আমরা নিত্য কতই যে অকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ভাবী সুখের প্ররোচনায়, ব্যক্তিগত উন্নতির আকাজ্ক্ষায় ও বলবতী অর্জ্জন-স্পৃহায় আমাদের প্রকৃত অবস্থা এরূপ বিস্মৃত হইয়াছি যে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এক্ষণে আমরা ক্ষণকালের জন্য মায়া-মমতা-শূন্য হইয়া আত্মজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃত পথ কোথায়, তাহা চিন্তা করিয়া দেখি না কেন?

শ্রীরামশরণ সাহা।
অলঙ্কার ব্যবসায়ী; মেদিনীপুর।

জাপান-যাত্রীর প্রতি উপদেশ।

আমাদের নিকট তোমরা যাহা চাহিবে, তাহাই দিব। ইংলণ্ডের কাচের দ্রব্য তোমরা চাহিলেই তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিব। তৎপরে তাহারা উহার পরিবর্ত্তে টাকা চাহিল না, শস্য চাহিল; তোমরাও কাচ লইয়া টাকা না দিয়া, গোলার ধান মাপিয়া দিলে; আমরাও "তথাস্তু" বলিয়া উহা লইয়া গিয়া ইয়োরোপে দিয়া আসিলাম। এ দোষ কাহাদের? তোমাদের না আমাদের? চাও কেন এবং দাও কেন? আমাদের কি? আমরা ব্যবসায়ী। দেশের অভাব পূরণ করিব; তজ্জন্য কিছু পারিশ্রমিক লইব মাত্র। তোমাদের গাছের ফেঁস (প্লাট) আমরা সে বৎসর আমেরিকায় লইয়া গেলাম, তাহারা ইহা পাইয়া মহানন্দে সেবার গম দিল; আমরা তাহা তোমাদের আনিয়া দিলাম। তবু তোমরা বলিবে, "আমরা কাচ লইয়া কাঞ্চন বিনিময় করিতেছি।" বলি, কর কেন? নিশ্চিতই তোমাদের শস্যের অভাব নাই, কাচের অভাব; ইহা ভাব কি?

কাচ বরং পদে আছে। সাবধান হও! জাপানী পণ্যের শুভাগমন এই সহরে হইতেছে। তাহারা পিস্‌বোর্ড কাগজে কাপড় দিয়া জুতা করিয়া পাঠাইতেছে, আদরে তাহা অনেকে লইতেছ। রঙ্গিন কাগজের লণ্ঠন করিয়া পাঠাইতেছে, "জাপানী ল্যাম্প" বলিয়া আদরে তাহা গ্রহণ করিতেছ। ইহার ফলে আমাদের জাপানী বাণিজ্য বৃদ্ধি হইবে। তবে একটা কথা আছে,—

বাঙ্গালীর আধা,
ইংরাজের সিকি,
জাপানের ফাঁকি।

অর্থাৎ বাঙ্গালার প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া বিক্রয় করিলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য আদায় হয়; পিত্তলের থালা, ঘটী প্রভৃতি ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইংরাজের সিকি অর্থাৎ ইয়োরোপের শিশি, বোতল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া বিক্রয় করিলে উহার সিকি দামও পাওয়া যায়। কিন্তু জাপানের সবই ফাঁকি অর্থাৎ জাপানী কাগজের ল্যাম্প বা পিস্‌বোর্ডের চটিজুতা অব্যবহার্য্য হইলে উহা আর কে লইবে? এ সকল বিষয় সাবধান করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে; কারণ, তাহা হইলে আমাদের ব্যবসায়ে

ক্ষতি হইবে। শস্তা পাইলে তাহার নানাবস্থা বা দুরবস্থা হইলেও তোমরা শস্তা ছাড়িবে না, ইহা আমরা জানি। তাই অনুমান করি, একদিন জাপানী শিল্পে কলিকাতা ছাইবে, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের সমুদয় দেশ জাপানী ফাঁকিতে পড়িবে। তোমাদের বুদ্ধি আছে, আজকাল আর হাঁড়ির ভিতর জাতি নাই। তোমরাও চীন-জাপানে যাইতেছ, ঐ সঙ্গে আমাদের দেশের পিত্তল কাঁসার বাসন, হস্তিদন্তের শিল্প, ভারতের আফিং, চা সঙ্গে লইয়া যাও। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কিংবা অমুক রাজা বাহাদুরের সাহায্যে যেমন জাপানে শিল্পশিক্ষার জন্য যাইতেছ, ভালই হইতেছে; কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, তুমি ব্যবসায়ী হইতে যাইতেছ,—ব্যবসায়ীরা যথায় যায়, সেই দেশ হইতে যেন তেন প্রকারেণ তাহার রাহা খরচ বা পাথেয় লইয়া আইসে। নিজে কিছুতেই সঞ্চিত ধন হইতে পাথেয় দেয় না। যে ব্যবসায়ী সঞ্চিত ধনে বিদেশে গিয়া উহা তুলিয়া আনিতে না পারে, সে ব্যবসায়ীর মধ্যে কুলাঙ্গার। ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে একজন সামান্য এদেশী ব্যবসায়ী কলিকাতায় আসিয়া চাউল, ছোলা, মটর, ঘৃত, চিনি, দেশালাই ইত্যাদি যাহা কিছু ক্রয় করিয়া চালান দিলেন, পরে বাটী যাইবার সময় কিছু সিগারেট, একটী টিনের বাক্স, কতকগুলি ছেলে খেলা পুতুল ও মারবেল, কিছু রজনচুস, ইত্যাদি দ্রব্যগুলি ঐ টীনের বাক্সে পুরিয়া লইয়া যান। বলুন দেখি, এগুলি সঙ্গে লইয়া যাইবার আবশ্যকতা কি? উহার যাতায়াতের ট্রেণভাড়া ঐ দ্রব্যগুলি বিক্রয় করিয়া তুলিবে বলিয়া। ইহা না করিলে ব্যবসায়ী সমাজে সে কলঙ্কিত হইবে। তাই বলি, বিদেশ-যাত্রী শিল্প-শিক্ষার্থী ব্যবসায়ীরা অন্যের সাহায্য পাইয়াছি, তবে আর কোন চিন্তা নাই, ইহা না ভাবিয়া অন্যের সাহায্য সত্ত্বেও নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিবেন; এদেশী ব্যবসায়ীদিগকে গুরুজ্ঞানে ইঁহাদের পথ-প্রদর্শক হইবেন; যাইবার সময় এদেশীয় কতক কতক শিল্প বাক্সবন্দী করিয়া লইয়া গিয়া তথায় বিক্রয়ের পন্থা দেখিবেন। কোন্ শিল্প, কোন্ দেশীয় চক্ষুতে কি ভাবে কখন যে কেমন লাগিবে, তাহা বলা যায় না। এই ক্ষুদ্র চেষ্টার দ্বারা নিজের পাথেয় আদায় হইতে পারে, এবং ভারতীয় শিল্পগুলির বিজ্ঞাপন স্বরূপ নমুনাও বিদেশে যাইতে পারে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন, উত্থানমান জাতি এই প্রকারেই পণ্য প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

বিলাতি শণের চাষ।

ফিষ্টার যখন বিদেশ ভ্রমণ করেন, তখন তাৎপ্রদেশিক তন্তুবায়গণ নেপল্‌স্‌ প্রদেশের শণ-চাষ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তদুত্তরে ১৯০২ খৃঃ অব্দে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই প্রবন্ধ উক্ত মহাত্মার ইংরাজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ।

১৮৬৫ খৃঃ অঃ নেপ্‌ল্‌স প্রদেশে "শণ-চাষ" একটী প্রসিদ্ধ কর্ম্ম হইয়া উঠে, এবং তখন হইতেই এই চাষের বিশেষরূপ উন্নতির সূত্রপাত হয়। এত শীঘ্র ইহার উন্নতির প্রধান কারণ এই যে, ঠিক সেই সময়ে নীল চাষ দ্বারা ম্যাড়ার (লোহিত শিকড় লতা গাছ) চাষ একরূপ নষ্ট হইয়া যায়। এই ম্যাড়ার চাষ নেপল্‌স প্রদেশের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ফসল ছিল এবং ফরাসি দেশে অতি প্রচুররূপে ইহার রপ্তানি হইত। উক্ত ফরাসি দেশস্থ সৈন্যগণের পোষাক রঞ্জনার্থ উহা অধিক ব্যবহৃত হইত।

মোটের উপর গণনা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, প্রায় ত্রিশ সহস্র টন শণ উৎপন্ন হইতেছে এবং ইহার চাষের জন্য প্রায় পঞ্চাশ সহস্র একার জমি ব্যবহৃত হইতেছে।

এই শস্যের উৎপাদন ও বিশুদ্ধকরণের পক্ষে এ প্রদেশের জলবায়ু বিশেষ উপযোগী। যদি উক্ত প্রদেশে বেশী রকম পরিশ্রমী লোক পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ইহার আশাতীত উন্নতি হইত। কেবলমাত্র লোকের পরিশ্রম অভাবেই ইহার আশাতীত উন্নতি হইতেছে না।

জমিকে ফসলোৎপাদিকা-শক্তিশালী করা বা জমির উর্ব্বরা শক্তি বর্দ্ধিত করা তত দুরূহ নহে। ইয়োরোপের মধ্যে এই প্রদেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। রোমবাসীরা ইহাকে "সুখময় স্থান" বলিত।

প্রতি বৎসর ইহাতে তিনবার করিয়া ফসল হয়। সহজেই অনুমেয় যে, প্রথমতঃ "শণ" ফসলের পর "জনার" রোপিত হয় এবং তৎপরে "দ্রাক্ষালতা"র চাষ হয়। এই দ্রাক্ষালতা পপলারস্‌ (লতা বিশেষ) দ্বারা রক্ষিত হইয়া গ্রীষ্মকালে বৃক্ষে বৃক্ষে সুন্দর মালার ন্যায় শোভিতে থাকে।

ডিসেম্বর মাসে "জনার" ফসল শেষ হইবার পর জমিতে ঘাস জন্মিয়া থাকে, অথবা শিম ইত্যাদি রোপণ করা হয়। ইহা ফেব্রুয়ারি মাসে ২০ ইঞ্চি কিংবা আরও বেশী উচ্চ হয় এবং সেই সময়েই শণ চাষের নিমিত্ত জমি উপযোগী হয়।

এই সময়ে চাকরেরা গাঁতি যন্ত্রের দ্বারা জমিকে উপযোগী করিয়া থাকে ; কচিৎ এই শস্যের উৎপাদনার্থ জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয় ; ঘাস এবং শিম্ব ইত্যাদির দ্বারা জমিকে লঘু করা হয় ; কেননা, এই সমস্ত লতা প্রায় ১২ ফিট মাটী ভেদ করিয়া থাকে এবং ইহাদিগকে নষ্ট করিয়াই মাটীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয়।

১২ই মার্চ্চ শস্যের রোপণ আরম্ভ হইতে থাকে। চারিটী দেশ হইতে বীজ আমদানী হয়।

১। সেই জেলার বীজ	...	৯০ ফে	১০০ কেসের দাম।	
২। "বোলগণা" বীজ প্রায়	...	৮০ "	"	"
৩। "কৃষ্ণসাগর" বীজ	...	৪০ "	"	"
৪। "কারজাগনোম" বা উপর ইতালি বীজ			"	"

"কৃষ্ণসাগর" বীজের দ্বারা অত্যন্ত খারাপ, ছোট এবং মোটা শণ উৎপন্ন হয় ; এবং সেই শণকে ইংরাজীতে "পেলোসেলা" বলে।

অপরাপর স্থান সমূহের বীজ প্রায় এক রকম। কিন্তু সত্য কি মিথ্যা জানিনা, কারম্যাগ-নোল বীজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

১০।১৫ দিনের পর জল বায়ু অনুসারে বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং পরবর্ত্তী মাসে কৃষকেরা আগাছা এবং মন্দ ঘাস নষ্ট করিতে ব্যস্ত হয় এবং যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে শামুকও ফেলিয়া দেয় ; কেননা, ইহার দ্বারা সমস্ত জমি নষ্ট হইয়া যায়।

যে মাসে একটা ধারণা করিতে পারা যায় যে, ফসল খারাপ কি ভাল হইবে। কতকগুলি রকমের বীজ আছে, যাহারা সম্পূর্ণরূপে পল্লবিত হয় ; কিন্তু যাহাদের গাছগুলি ছোট থাকে, তাহারা পাঁচ ফিটের বেশী উচ্চ হয় না এবং তাহাদের অতি সরু শাখা হইয়া থাকে।

এইরূপ একটা রীতি আছে যে, কৃষকেরা ১৫ই মে বীজের দাম দেয়, কিন্তু শণ যদি ১৫ই মে তারিখের পূর্ব্বে পুষ্পিত হয়, তাহা হইলে তখন কৃষকদিগকে দাম দিতে বাধ্য হইতে হয় না।

যদি কৃষকের সৌভাগ্যক্রমে প্রবল বায়ুর দ্বারা শণের শীষ্‌গুলি নষ্ট না হয় অথবা শিলা-বৃষ্টি দ্বারা যদ্যপি ভূমিসাৎ না হয়, তাহা হইলে কৃষকেরা জুলাই মাসের প্রথমেই ইহাকে উপড়াইতে আরম্ভ করে।

যে জমিতে শণ সুন্দররূপে জন্মিয়া থাকে, তাহার শণের শীষ্‌গুলি প্রায় ১৩ ফিট উচ্চ হয় ; কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা ১৭ ফিট পর্য্যন্ত উঠিতে দেখিয়াছেন।

যখন ফুল হইতে আরম্ভ হয়, তখন কৃষকেরা শণ টানিতে আরম্ভ করে। ইহারই পূর্ব্বে স্ত্রী শীষ্‌গুলির উর্ব্বরতা সম্পূর্ণ ঘটিয়া থাকে।

স্ত্রীলোক এবং পুরুষেরা এই কার্য্যে নিযুক্ত হয়। নিচু হইয়া তাহাদের বাহুতে প্রায় ৩০টা শীষ্ গ্রহণ করিয়া, তাহার পর নিজের দিকে উত্তোলিত করে, মাটী হইতে তাহাদিগকে ছিঁড়িয়া ফেলে। যদ্যপি মাটী অত্যন্ত আল্‌গা বা হাল্‌কা থাকে, তবে এই কার্য্য অত্যন্ত সহজে সম্পাদিত হয়। ইহার শিকড় ২৫ হইতে ৩০ ফিট পর্য্যন্ত লম্বার বেশী হয় না।

গণনা দ্বারা জানা যায় যে, প্রথম লাট ১০ই জুলাই তারিখে টানা হইয়া থাকে; এবং পরবর্ত্তী লাট সমূহ আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে হইয়া থাকে।

তারপর শীষ্‌গুলিকে মাটীতে শুকাইতে দেওয়া হইয়া থাকে এবং পাঁচ হইতে সাত দিন পর্য্যন্ত সেখানে রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে কয়েকবার উল্টান হইয়া থাকে এবং মরা-পাতা ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত মাটীতে ঝাড়া হয়। ফসলের শেষ ফলের সময় অত্যন্ত ভয়ানক; শিশির কিংবা সামান্য বৃষ্টি দ্বারা বা জুলাই মাসের সূর্য্য দ্বারা যাহা শীঘ্র শুকাইয়া যায়, তাহার শাখাগুলির বেশ সুন্দর রং হইয়া থাকে। অন্যপক্ষে যদ্যপি কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া বেশী রকম বৃষ্টি হয় এবং তাহার পর শীষ্‌গুলি ভিজা স্যাঁত্‌সেতে থাকে, তাহা হইলে ইহার রং নষ্ট হইয়া যায়, এবং শাখাগুলি বিবর্ণ হইয়া যায়, এমন কি কখন কখন কাল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। তাহার পর কৃষকেরা শীষ্‌গুলিকে আটী করিয়া বাঁধিয়া থাকে, শেষ ধার গুলি কাটিয়া দেয় এবং শিকড়-গুলি একটী বড় এবং ভারি টাঙ্গি বা কুঠার দ্বারা কাটিয়া দেয়। তাহার পর শণকে কাটিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করা হয়।

পুনরায় রোপণ করিবার নিমিত্ত বীজ উৎপন্ন করিতে যে কৃষক ইচ্ছুক, সেই কৃষক সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত পুং এবং স্ত্রী চারাগুলি পছন্দ করিয়া লয় এবং তাহা-দিগকে রোপণ করে।

ইহার বীজগুলি পাকিয়া থাকে; চারা গাছগুলির শিকড় পর্য্যন্ত উপড়াইয়া লওয়া হয়। বীজগুলি ঝাড়িয়া লওয়া হয় এবং তারপর ডাঁটাগুলি অবশিষ্ট শণ-গুলির মত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যাহার ডাঁটাগুলি অত্যন্ত মোটা, তাহাদিগকে "ক্যানাপোন" শণ বলে এবং ইহা কেবল মাত্র রসারসী উদ্দেশেই উপযুক্ত হয়।

"শণ" ছাড়া আর দুইটী সহযোগী ফসলের কথা অবগত হওয়া আবশ্যক।

যখন শীষ টানা হইয়া থাকে, তখন লম্বা, সতেজ কাটীগুলি সরু, ছোট এবং সূক্ষ্ম কাটী হইতে পৃথক করা হয়, এবং ইহাদিগকে আলাহিদা করিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। ইহার ফলে সরু এবং ছোট ডাঁটা বিশিষ্ট "অপরিষ্কৃত" শণ হয়। এই শণকে ইংরাজিতে ফৈনেলি বা ক্যাননেভেলি বলিয়া থাকে।

পরিশেষে যখন শণ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া শণের কাটীগুলি বাহির করা হয়, তখন শণ কাটীগুলি অসংখ্য চূণের কিংবা ইটের পাঁজাতে কাষ্ঠরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে।

নেপল্‌স্‌ প্রদেশে শণ চাষের নিমিত্ত ২॥০ একার ভূমিতে কত লাভ ও লোক-সান হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স।
২॥০ একার ভূমির খাজনা ...	৫	১২	০
বীজ	১	১২	০
বীজ বপন	০	১২	০
আগাছা তুলান	০	১২	০
তুলা শুকান এবং কাটা ...	১	১২	০
পাঠাইবার গাড়ী ভাড়া ...	০	১০	০
পাঠ করা এবং শুকান ...	৩	৪	০
গোলাবাড়ীতে লইয়া যাইবার ভাড়া	০	১০	০
ছাড়ান এবং শেষ বাঁধা ...	৩	১২	০
মোট ...	৩৮	১৬	০
ট্যাক্স ...	৪	১২	০
সর্ব্বসমেত ...	৪৩	৮	০

২॥০ একার ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের তালিকা।

	টন	হন্দর	কোয়াটার	পাঃ।
শণ বিশুদ্ধ	১	১২	১	২৬
ফৈনেলি	০	২	৩	২২
ছেঁড়া শণ	০	১	৩	২
শণকাটী	১	১৫	১	২১
	৩	১২	২	১৫

শণ কিরূপে কাচা হয়, তাহা আগামী মাসের পত্রে বাহির হইবে।

শ্রীরামময় গিরি।

স্বর্গীয় শ্রীরামচন্দ্র আশ।

ইনি জাতিতে তাম্বূলী। ইহার পিতার নাম স্বর্গীয় রামকুমার আশ। বর্গীর হাঙ্গামাকালে যখন অপরাপর তাম্বূলীরা অন্যান্য স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া খাঁটুরা, হয়দাদপুর ও গোবরডাঙ্গায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেই সময়েই রামকুমার বাবু বনগ্রাম হইতে হয়দাদপুরে আসিয়া বাস করেন। ইনি বড় দরিদ্র ছিলেন। ১২৪৮ সালে ইঁহার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র আশ হয়দাদপুর ভবনেই জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাশিক্ষার পরে সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শ্রীরাম বাবু এক তাম্বূলীর দোকানে তিন বৎসর চাকুরী করেন। পরে গোবরডাঙ্গায় কাঁসার বাসন বিক্রয়ের এক দোকান করেন। পর বৎসর এই দোকানের সঙ্গে এক চিনির কারখানা স্থাপন করেন। ক্রমে এই কার্য্যে ইনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। চিনির কার্য্যে ইনি এই স্থান হইতেই সুশিক্ষিত হয়েন এবং কাঁসারীর দোকান তুলিয়া ফেলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইনি কেশবপুরে গিয়া এক চিনির কারখানা খুলেন, এবং তথায় একাদিক্রমে দুই বৎসর কাল বাসের পর কলিকাতায় আসেন এবং জ্ঞাতি-ভ্রাতা ৺রামগোপাল আশ মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া চিনিপটিতে এক চিনির কারবার খুলেন। এই দোকান হইবার পর বৎসর ১২৭৩ বা ১২৭৫ সালে চিনিপটির মহাজনদিগের কোহিনুর-স্বরূপ স্বর্গীয় সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয় ইহাকে তাঁহার কোটচাঁদপুরের কর্ম্মের অংশীদার ও কার্য্যাধ্যক্ষ করিয়া তথায় পাঠাইয়া দেন। এই চাঁদপুরেই শ্রীরামচন্দ্র আশ মহাশয় জীবনের অধিকাংশ ভাগ ব্যয় করিয়াছেন, এই চাঁদপুরই ইঁহার লীলাভূমি। চাঁদপুর ইঁহাকে পাইয়া অনেক উপকৃত হইয়াছে।

চাঁদপুরের নিকটবর্ত্তী সোলেমানপুরে ইনি ৺কালী দেবী ও ৺জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং দেবালয় স্থাপন করেন। এই দেবদেবীর নিত্য সেবার বন্দোবস্ত জন্য তথাকার দোকানদারদিগকে লইয়া এক বারয়ারীর তহবিল সংস্থাপন করেন। ইহা এক্ষণে অক্ষয় ফণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই দেবদেবী যত দিন থাকিবেন, তত দিন শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তির স্মৃতি সকলের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে। সোলেমানপুরে ইঁহার আর একটি কীর্ত্তি আছে।

তথাকার অনেক দরিদ্র মুসলমানেরা নমাজের জন্য ইহাঁর নিকট একটু স্থান প্রার্থনা করেন। ইনি নিজ ব্যয়ে স্থান ক্রয় করিয়া তথায় এক সুন্দর মসিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অদ্যাপি এই মসিদে মুসলমানগণ দলে দলে আসিয়া সেই অনাদি অনন্তদেবের ভজনা করিয়া থাকেন, এবং সেই সঙ্গে ইহারও কীর্ত্তিস্তম্ভের জয়জয়কার ঘোষণা করেন।

চাঁদপুরে রথের সময় একটী মেলা হইত। উক্ত রথখানি খুব বৃহৎ এবং বহু পুরাতন ছিল। মেহেরপুর-নিবাসী রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ রথের অধিকারী ছিলেন। তিনি ইদানীং নিঃস্ব হওয়ায়, রথখানির সংস্কারাভাবে এক বৎসর মেলা বন্ধ হইবার উপক্রম হয় দেখিয়া, শ্রীরামচন্দ্র নিজ ব্যয়ে উহার জীর্ণসংস্কার করতঃ মেলা এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগের কৌলিক কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখেন। শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই সময় ইঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, হয়দাদপুর, খাঁটুরা এবং গোবরডাঙ্গার মধ্যে অত্যন্ত দরিদ্রদিগকে ইনি মাসিক ১০৲ টাকা মাসহারা দিতেন। ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মণ এবং কাঙ্গালী বিদায় মধ্যে মধ্যে করিতেন। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিতেন। কোটচাঁদপুরের চিনির কলের সুবিখ্যাত ম্যাক্‌লাউড সাহেবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও, বহুদিন ইনি উক্ত স্থানের মিউনিসিপালিটীর ভাইস্‌চেয়ারম্যান এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদে অধিষ্টিত ছিলেন।

সংসার-ক্ষেত্রে উন্নতি হইবার মূল—কর্ম্ম। শ্রীরামচন্দ্র এক মুহূর্ত্ত কর্ম্মব্যতীত থাকিতেন না। কাজে কাজেই দরিদ্র শ্রীরামচন্দ্র অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি সত্যবাদী ছিলেন এবং কোনরূপ মাদকতার বশীভূত ছিলেন না। উন্নতির সময়ে মানুষের যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইনি বহুদিন হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরের বিবিধ উপসর্গে ভুগিতেছিলেন; তৎপরে বিগত ২৪শে পৌষ বৃহস্পতিবারে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র আশ মহাশয় পিতৃকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, মঙ্গলময়ের নিকট ইহাই প্রার্থনীয়।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
৩য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা; আষাঢ়, ১৩১০ সাল।

দেশী ও বিলাতি সব্জীর চাষ।

(কাশীপুর প্র্যাক্‌টিকেল ইনষ্টিটিউসন হইতে লিখিত।)

জমি। চাষের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমেই মৃত্তিকা নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, মাটীর দোষ ও গুণে ফসলের অবস্থা মন্দ ও ভাল হইয়া থাকে।

সকল মাটীতে সমান ফসল জন্মে না। জমির উর্ব্বরতা ভেদে ফসলের তারতম্য হইয়া থাকে।

যে কয়েক প্রকার মাটী আছে, তাহার মধ্যে দোঁয়াস মাটী সব্জী চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী। ঐ মাটী সারাদির দ্বারা উর্ব্বরা করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

এটেল বা বালুকাময় ভূমি সব্জী চাষের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। তজ্জন্য ঐ দুই প্রকার ভূমিকে এস্থলে অনুর্ব্বরা ভূমি বলা হইল।

এটেল মাটী স্বভাবতঃ অত্যন্ত কঠিন। ঐ মাটী গুঁড়া করিতে হইলে অধিক পরিশ্রম ও ব্যয়ের আবশ্যক। সব্জী চাষের জন্য ঐ মাটী গুঁড়া করা আবশ্যক।

গুঁড়া মাটীতে গাছের কোমল শিকড়গুলি অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে, এজন্য এটেল মাটী সব্জী চাষের উপযোগী নহে।

বালুকা-ভূমি রৌদ্রের উত্তাপে অত্যন্ত গরম হয়, ও তাহাতে গাছের শিকড়ের রস মাটীর গরমে শুষ্ক হওয়ায়, উহার তেজের হ্রাস ও ফসলের হানি করে। সুতরাং ইহাও এটেলের ন্যায় সব্জী চাষের অনুপযোগী।

কৃষকের পরিশ্রমে অনুর্ব্বরা ভূমিও উর্ব্বরা হইয়া উঠে। এটেল মাটীর ক্ষেত্রে বালি মাটী ও সারাদি দিয়া চাষ করিলে ক্রমে দোঁয়াস মাটী হয়, এবং তাহাই ক্রমে উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়।

বালি মাটীতে পুষ্করিণীর পাঁক ও সারাদি দিয়া চাষ করিলে ক্রমে দোঁয়াস মাটী হয়। ইহাতে জমির উর্ব্বরতা ও অবস্থা ভাল হয়।

যেস্থানে বাল সূর্য্যের রৌদ্র না লাগে, এমত জমিতে ও বৃক্ষাদির আওতায় ফসল ভালরূপ জন্মে না; এজন্য আওতার জমিতে চাষ করা অবিধেয়। কারণ, সূর্য্যের তেজ হইতে বীজ অঙ্কুরিত ও শস্যাদি বর্দ্ধিত হয়।

সার। প্রাণিগণ যেমন আহার করিয়া, দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে, তদ্রূপ উদ্ভিদগণও মৃত্তিকা হইতে সার অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া পুষ্পিত, ফলিত ও বর্দ্ধিত হয়।

চাষের কার্য্যে যেমন মাটী নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, তেমনই সারাদি দ্বারা জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করাও কর্ত্তব্য। ফসল উৎপন্ন হইলেই জমির উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস হয়। সেই ক্ষতি পূরণ বা বৃদ্ধি না করিলে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইবে না। এ নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে জমিতে সার দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

ভস্মসার। একখণ্ড পতিত জমি চাষের জন্য তৈয়ার করিতে হইলে, প্রথমতঃ ঐ জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া গুল্ম লতাদির শিকড় বাছিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে তাহাতে গুঁড়া চূণ ও ছাই ছড়াইয়া দিলে, শিকড়ের অবশিষ্টাংশ পচিয়া একপ্রকার সার উৎপন্ন হইবে। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু সকল কাটিয়া লওয়ার পর, তাহার জমি কোপাইলে বা লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিলে ইক্ষুর গোড়ার শিকড়গুলি একবারে উঠাইয়া ফেলিতে পারা যায় না। অনেক সরু সরু শিকড় জমিতে থাকিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় গুঁড়া চূণ বা ছাই দ্বারা তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া সারে পরিণত করাই যুক্তিসিদ্ধ।

জান্তবসার। পচা মৎস্য, হাড়ের ও শিংএর গুঁড়া, গোময়, ঘোড়ার ও ভেড়ার নাদি প্রভৃতিকে 'জান্তব সার' বলে।

হাড়ের গুঁড়া ও শিংএর গুঁড়ার সার প্রতি বৎসর জমিতে দিতে হয় না। যেমন পুষ্করিণীর পাঁক জমিতে ফেলিলে প্রায় তিন বৎসর কাল জমির তেজ থাকে; ঐরূপ হাড়ের গুঁড়া ও শিংএর গুঁড়ার সার একবার কোন জমিতে ছড়াইয়া দিলে, সেই ভূমির তেজ ন্যূনাধিক তিন বৎসর কাল থাকে। গোময় এবং ভেড়া ও ঘোড়ার নাদি প্রভৃতির সার প্রস্তুত করিতে হইলে, উহা একটী গর্ত্তে ফেলিয়া পচাইবে। তাহা ভালরূপে পচিয়া গেলে, আশ্বিন মাসে

সব্জী চাষের পূর্ব্বে উহা গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া, শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিবে ও সব্জী চাষের ক্ষেত্রে ঐ গুঁড়া সার ছড়াইয়া দিবে।

কিন্তু গর্ত্তটী পাকা করাই বিধেয়, নতুবা সারের সারাংশ গর্ত্তের তলস্থ ও পার্শ্বস্থ জমি দ্বারা পরিশোষিত হইয়া ততদূর কার্য্যকর হইবে না।

উদ্ভিজ্জসার। বৃক্ষাদির শুষ্ক পত্র ও কোমল শাখা প্রভৃতি একটী গর্ত্তে পচাইলে সার প্রস্তুত হইবে। তাহা আশ্বিন মাসে ঐ গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া, বিশেষরূপে রৌদ্রে শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিবে। কপি আদির বীজ ফেলিবার সময় পাতাসারের বিশেষ প্রয়োজন।

সর্ষপ ও রেড়ির খইলের সার। গোময় প্রভৃতি পাতাসার যেরূপ গর্ত্তে ফেলিয়া পচাইতে হয়, খইলের সার সেরূপ পচাইবার আবশ্যক করে না। কেবল উহা গুঁড়া করিয়া সব্জী চাষের ক্ষেত্রে দিলেই হইবে।

কোন্ ফসলের পক্ষে কি সার উপযোগী।*

১। যে সব্জীর পাতা ব্যবহার করা হয়, তাহার চাষে পুকুরের মাটী, নীলের সিটী ও চোনা সার দিবে।

২। যাহার বীজ ব্যবহার করা হয়, তাহার চাষে হাড়-সংযুক্ত সার ও সোরা সার দিবে।

৩। যাহার মূল ব্যবহার করা হয়, তাহার চাষে হাড় সার দিবে।

৪। যাহার সুঁটী ব্যবহার করা হয়, তাহার চাষে চূণ-সংযুক্ত সার দিবে।

(ক্রমশঃ)

কানেস্ত্রার কারখানা।

আপনারা টিনের কানেস্ত্রা দেখিয়াছেন। উহার কারখানা কলিকাতায় পূর্ব্বে প্রায় ছিল না। ঘৃত, তৈল ইত্যাদি দ্রব্য এক্ষণে প্রায় কানেস্ত্রায় আমদানী হওয়াতে খালি কানেস্ত্রার কার্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কলিকাতায় ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে অপর্য্যাপ্ত ঘৃত আমদানী হয়। কোন্

* ইহা বঙ্গদেশের কৃষি-বিভাগের মিঃ এন্, জি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রিপোর্ট হইতে দেওয়া গেল।

কোন্ দেশ হইতে কলিকাতায় ঘৃত আইসে, তাহার বিবরণ মহাজনবন্ধুর (২য় খণ্ড) চৈত্রের সংখ্যায় বলিয়াছি। সেই সকল স্থান হইতে পূর্ব্বে যে ঘৃত কলিকাতায় আসিত, তাহা কুপা, পিপা এবং মট্‌কীর ভিতর আসিত। কুপা—চর্ম্মপাত্র; পিপা—কাষ্ঠ নির্ম্মিত, মট্‌কী—মৃত্তিকা নির্ম্মিত, জলের জালার মত। এক কুপায় ৭।৮ মণ ঘৃত আসিত, পিপাও উক্ত পরিমাণ ঘৃতপূর্ণ হইয়া আসিত, মট্‌কিতে ১।০ মণ, ১।০ সওয়া মণ ঘৃত ধরিত। এই সকল পাত্রে ঘৃত আমদানী হওয়াতে ক্রমে লোকের অসুবিধা হইল। ॥০ মণ, ১।০ মণ ঘৃত লইতে হইলে, বাটী হইতে ঘৃতপাত্র সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত। তাই বর্ত্তমান সময়ে কানেস্তার প্রচলন বৃদ্ধি হইয়াছে। ॥০ মণ এবং ।০ সের পরিমিত ঘৃতপূর্ণ কানেস্ত্রা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান সময়ে বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। /৫, /২॥০ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কানেস্ত্রাও প্রচলিত আছে। কিন্তু এত ক্ষুদ্র ঘৃতের কানেস্ত্রা বিক্রয় খুব কম। /১, /॥০, /।০ পোয়া মাল ধরে, এরূপ কানেস্ত্রা চা ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, অতিরিক্ত ঘৃতের কানেস্ত্রার প্রচলন জন্য এই কাজের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার বড়বাজার, ফুল-বাগান প্রভৃতি স্থানে এই কানেস্ত্রার কারখানা ৯টা এবং কলিকাতার আমড়াতলায় ইহার ২টী কারখানা আছে। একাজে মূলধন বেশী লাগে না; ২০০ হইতে ৫০০ টাকার মূলধনে বেশ চলে। ধারে মাল বিক্রয় করিলে অবশ্য মূলধন অধিক চাই। প্রত্যহ কাজ চলিলে দৈনিক এই কাজে খরচ-খরচা বাদে নিট ১০৲ টাকা লাভ হইবেই হইবে।

কানেস্ত্রার কারখানায় দুই শ্রেণীর লোক কার্য্য করে। এক শ্রেণীর লোক সাঁড়াসি দিয়া টিন কাটে এবং কাষ্ঠের মুগুর দিয়া খাঁজ করিয়া কানেস্ত্রার আকৃতি করিয়া দেয়; অন্য শ্রেণীর লোক সিসে ও রাং পান দিয়া উহা আঁটিয়া দেয়। শেষোক্ত শ্রেণীর লোককে মিস্ত্রী বলে। একার্য্যে ইহাদেরই বেতন বেশী; মাসে ১৫৲ ২০৲ টাকা ভাল মিস্ত্রীর বেতন। তাতাল উত্তপ্ত করিয়া, সিসে ও রাং পান দ্বারা ইহারা এত শীঘ্র কানেস্ত্রা জোড়ে যে, দেখিলে বোধ হয় যেন ময়দার আটা দিয়া কাগজ জুড়িতেছে। ইহাদের প্রত্যেকে প্রত্যহ ৩।৪ শত কানেস্ত্রা আঁটিতে পারে। অপর শ্রেণীর লোকদিগকে ছোক্‌রা কহে। তাহাদের বেতন মাসিক ৪৲ ৫৲ টাকা মাত্র।

এই কানেস্ত্রা প্রস্তুত করিবার প্রধান উপকরণ টিন। টিন অর্থাৎ খুব পাৎলা লৌহ চাদর কলাই করা মাত্র। ইহার বিষয় ১ম বর্ষের "মহাজন-বন্ধু"তে বলা হইয়াছে। কলিকাতায় আদৌ টিনের কারখানা নাই। এদেশবাসী অনেকেই কেমিষ্ট্রী শিক্ষা করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদের কেমিষ্ট্রী শিক্ষার ফল হইতেছে না। ইহারা মনে করিলে অনায়াসে কলিকাতায় টিনের কারখানা স্থাপিত করিতে পারেন। ধনীর ভাবনা নাই। অনেকের টাকা খাটে না। কোম্পানীর কাগজে বার্ষিক ৩৲ টাকা সুদে টাকা খাটাইতে হয়। টিনের উপযুক্ত লৌহ চাদরের অর্ডার দিলে, ভারতের অনেক লৌহ-কারখানা হইতে উহা পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, আমরা বিদেশ হইতে আনীত টিন ক্রয় করিয়া কানেস্ত্রা প্রস্তুত করি।

কলিকাতার যে সকল আফিসে মেকানিক্ বিভাগ আছে, সেই সকল আফিসে ইহা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়; অথবা সোয়ালো লেনস্থ কয়েক ঘর বাঙ্গালী মহাজনও একাজ করেন। পরিচয়-স্থলে অথবা পরিচিত হইলে বাঙ্গালী মহাজনেরা ধারে মাল দিয়া থাকেন। আমি আজ ৭ বৎসর এই কারখানা খুলিয়াছি; সোয়ালো লেনস্থ ৺রাধারমণ দত্ত কোং মহাশয়দিগের দোকান হইতে টিন ক্রয় করি। টিনের চাদর পরিমিত-মাপে বাক্সবন্দী হইয়া বিদেশ হইতে জাহাজে করিয়া আমদানী হয় এবং হন্দরের উপর দর হয়। দরের বাজার সকল সময় ঠিক থাকে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আমাদের কারখানায় দ্বিবিধ কানেস্ত্রা প্রস্তুত হয়। এক প্রকার বড় কানেস্ত্রা, ইহাতে ॥০ মণ ঘৃত রাখা চলে; এবং অন্য প্রকার, ।০ সের ঘৃত রাখা হয়, এরূপ ছোট কানেস্ত্রা। এই দুই প্রকার কানেস্ত্রার জন্য আমরা সর্ব্বদা যে পরিমাণের টিন ব্যবহার করি, তাহা এই ;—

১০×১৪	ইঞ্চি	২২৫	পিস	ওজন	১ হন্দর নিট।
১০×২০	„	১৫৭	„	„	১ „ „
১০×২০	„	১৫৭	„	„	১ হন্দর ৪৭ পাউণ্ড নিট।
১৯৷০×১৪	„	১২০	„	„	১ হন্দর নিট।
২০×১৪	„	১১২	„	„	৯০ পাউণ্ড নিট।

১। ১০ ইঞ্চি প্রস্থ ১৪ ইঞ্চি দীর্ঘ, এই মাপের টিন এক বাক্সে ২২৫ পিস অর্থাৎ ২২৫ খানা টিন থাকে। ইহার ওজন নিট ১ হন্দর। অতএব এই ২২৫ খানা টিনের মূল্য ১০৲ টাকা মাত্র।

২। ঐরূপ ১০ ইঞ্চি প্রস্থ ২০ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১৫৭ খানা টিন এক বাক্সে থাকে। ইহার মূল্য ৯৸৵০ মাত্র।

৩। ঐ ভাবের, যথা—১০ ইঞ্চি প্রস্থ ২০ ইঞ্চি দীর্ঘ, ইহাও ১ বাক্সে ১৫৭ খানা থাকে; কিন্তু ইহার ওজন বেশী অর্থাৎ ১ হন্দর ৪৭ পাউণ্ড। ইহার ওজন বেশী হইবার কারণ এই যে, এই টিন কিছু পুরু অর্থাৎ মোটা। ইহার দর ১২॥০ হইতে ১২৸০ মাত্র।

৪। বড় কানেস্ত্রা প্রস্তুতির জন্য ১৪ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ১৯।০ ইঞ্চি দীর্ঘ, এরূপ টিন ১ বাক্সে ১২০ খানা থাকে; ওজন ১ হন্দর নিট, দীর্ঘে বড় অথচ ওজন ১ হন্দর। অতএব সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, ইহা পাৎলা টিন। প্রতি বাক্স ১২৭ পিসের মূল্য ১০।০ মাত্র।

৫। ১৪ ইঞ্চি প্রস্থ ২০ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১১২ পিস, ওজন ৯০ পাউণ্ড। ইহার দ্বারা চা-র কানেস্ত্রা প্রস্তুত হয়। দর প্রতি বাক্স ৯॥০ টাকা।

ছোট কানেস্ত্রা অর্থাৎ।০ সেরা কানেস্ত্রার জন্য ১০×১৪ ইঞ্চি ২ পিস অর্থাৎ ২ খানা টিন এবং ২০×১০ ইঞ্চি ১ পিস অর্থাৎ ১ খানা টিন; মোট এই ৩ খানা টিনে ১টা ছোট কানেস্ত্রা প্রস্তুত হয়।

বড় কানেস্ত্রা অর্থাৎ ॥০ মণী কানেস্ত্রার জন্য ১৯।০×১৪ ইঞ্চি ২ পিস এবং ২০×১০ ইঞ্চি ১ পিস; মোট এই ৩ পিস দ্বারা ১টা বড় অর্থাৎ এই তিনখানা টিনে একটা বড় কানেস্ত্রা হয়।

১ হন্দর ৪৭ পাউণ্ড ওজনের টিন ১ বাক্সে ১৫৭ পিস যাহা থাকে, তদ্দ্বারা ছোট কানেস্ত্রা তৈয়ারী হইলে, উহার ১ কানেস্ত্রার ওজন /৸৵০ ছটাক হয়। ২০×১০ দ্বারা ছোট কানেস্ত্রা প্রস্তুত করিলে, তাহার ওজন প্রতি কানেস্ত্রা /৸১০, /৸/০ ছটাক হয়। মহাজনেরা প্রত্যেক ঘৃতপূর্ণ বড় কানেস্ত্রায় /১॥/০ ছটাক: এবং ছোট কানেস্ত্রায় /৸১০ ছটাক—এই নিয়মে কানেস্ত্রা ওজনের পর করতা বাদ দিয়া থাকেন। অতএব /৸১০ ছটাকের স্থলে /৸৵০ ছটাক ওজন হইলে মহাজনেরই সুবিধা। কেননা, যে কানেস্ত্রাটা মোটা টিনে করা, উহার /৸৵০ ছটাক ওজন হইবে; কিন্তু বাদ দিলেন /৸১০ ছটাক। পরন্তু আমাদেরও ইহা কিছু বেশী দরে ক্রয় করিতে হয় বলিয়া, মোটা টিনের কানেস্ত্রার দর কিছু বেশী লই। অতএব ছোট কানেস্ত্রার দর আমাদের নিকট দ্বিবিধ হইয়াছে।

১০×২০=১ হন্দর ৪৭ পাউণ্ড নিট। ইহা দ্বারা তৈয়ারী ১০০ কানেস্ত্রার

মূল্য ২৮৵০ মাত্র অর্থাৎ প্রত্যেকটার মূল্য বাঙ্গালা ।১০ আনা; এবং ১০× ১৪=১ হন্দর নিট, ইহা দ্বারা প্রস্তুত ১০০ কানেস্ত্রার মূল্য ২৭৵০ মাত্র। ইহার প্রত্যেকটীর মূল্য চারি আনা আট গণ্ডা তিনকড়া অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কানেস্ত্রা অপেক্ষা সিকি পয়সা কম।

বড় কানেস্ত্রা ১০০টা তৈয়ারী করিতে সিসে ও রাং পান /৬॥০ সের লাগে। ছোট কানেস্ত্রার এক শতের জন্য /৪॥০ সের সিসে ও রাং পান লাগিয়া থাকে। পান অর্থাৎ ধূনা। কানেস্ত্রা জুড়িবার সময় জোড়ের মুখে অগ্রে ধূনার গুঁড়া ছড়াইয়া, তৎপরে সিসে ও রাং ধাতু একত্র সংমিশ্রণ করিয়া, উহার শলাকা বাম হস্তে রাখা হয়; দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাতাল তাতাইয়া উক্ত শলাকা জোড়ের মুখে ঘসিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইলেই কানেস্ত্রা জোড়া হইয়া যায়। সিসে, রাং ও পানের মূল্য গড়-পড়তায় প্রতি সের ১৲ টাকা করিয়া লাগে। ইহা ভিন্ন কয়লা ইত্যাদি খরচ আছে। এ সকল আমাদের কারখানার খরচ। মিস্ত্রীদের উহা লাগে না, তাহারা খারা মাহিনা লয়, অর্থাৎ উহাদের মাহিনার ভিতর কোন খরচা নাই।

কারখানার হিসাব।

১০×১৪=২২৫ পিস ২ খানা হিসাবে ১ বাক্সে ১১২॥০ টা কানেস্ত্রা হইবে।
২০×১০=১৫৭ ,, ১ খানা ,, ১ ,, ৭৭॥০ টা ,, ,,

মোট— ৩৮২ পিসে ৩ খানা হিসাবে ১৯০ টা ছোট কানেস্ত্রা হইবে। দর শতকরা ২৮৵০ অথবা প্রত্যেকটী ।১০ আনা হইলে ১৯০ টার মূল্য ৫৩৷৶০ হয়। অতএব;—

জমা		খরচ	
(প্রাত্যহিক)	৫৩৷৶০	(প্রাত্যহিক)	
বাদ মোট খরচ	৩৬॥০	১০×১৪=২২৫ পিস মূল্য	১০৲
মুনফা—	১৭৶০	২০×১০=১৫৭ ,, ,,	১২৸০
		রাং, সিসে, ধূনা এবং কয়লা ইত্যাদি	১০৲
		লোকের বেতন ...	১॥০
		ঘর ভাড়া ...	১৲
		বাক্সে খরচ ...	১৲
		মোট—	৩৬॥০

মন্তব্য। ১৯০টা ছোট কানেস্ত্রা তৈয়ারী করিয়া ১৭৶০ লাভ বড় সহজ কথা নহে। দুঃখের বিষয়, একাজ প্রত্যহ চলে না। মাসে ১০,০০০ কানেস্ত্রা করিবার কণ্ট্রাক্ট পাইলে, প্রত্যহ কাজ চলে। প্রত্যহ বেতন ১॥০ টাকা ধরিয়াছি। ১ জন মিস্ত্রিতে প্রত্যহ ১৯০ টা কানেস্ত্রা আঁটিতে পারে, উহার বেতন ১৫৲ টাকা এবং ৬ জন ছোকরা উহার সহকারী, উহাদের ৫৲ হিসাবে বেতন ধরিলে মাসে ৩০৲ টাকা। অতএব ১৫+৩০=৪৫৲ টাকা; রোজ ১॥০ টাকা হইল। একাজে একটু প্রশস্ত ঘর চাই। আমরা ৩০৲ টাকা ভাড়া দিয়া থাকি, অতএব রোজ ১৲ টাকা ধরা হইয়াছে। মিস্ত্রি মাস-মাহিনায় না রাখিয়া, আবশ্যকমত লাগাইলে এবং ২।৫ জন ক্রেতা মহাজনকে বশীভূত রাখিতে পারিলে, একাজে কিছুতেই ক্ষতি হয় না।

শ্রীনন্দলাল গোস্বামী।

আধুনিক চিনির কণ্ট্রাক্ট।

স্বদেশীয় মহাজনবর্গের জন্য এই বিষয়টী উল্লিখিত হইতেছে। এই প্রবন্ধে কণ্ট্রাক্ট সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ কথার অবতারণা করা হইল। যদি স্বদেশীয় মহাজনবর্গ এই কথাগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন পূর্ব্বক কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিতই বিশেষ উপকৃত হন। কথা এই যে, এক্ষণে অধিকাংশ মাল যখন তাঁহাদিগকে বৈদেশিক সওদাগর-গণের নিকট হইতে সওদা করিতে হয়, তখন তাঁহাদিগকে আমদানী-কারক সওদাগরের নিকট কণ্ট্রাক্ট (Contract) অর্থাৎ চুক্তিপত্র লেখাইয়া লইতে হয়। সেই সকল কণ্ট্রাক্টে (Contract) ছাইপাঁস মাথামুণ্ডু কি লেখা থাকে, তাহা অধিকাংশ মহাজনগণ না পড়িয়া, না বুঝিয়া, না শুনিয়া কণ্ট্রাক্ট লয়েন ও তাহার রসিদ স্বাক্ষর করিয়া দিয়া থাকেন। এক্ষণে বাজারে তিন প্রকার কণ্ট্রাক্টের (Contract) প্রচলন আছে। এক রকম, যাহা দালালেরা ক্রেতা ও বিক্রেতা এই উভয়কেই দিয়া থাকেন। যেমন Sold note অর্থাৎ বিক্রেতার কণ্ট্রাক্ট, ইহা দালালেরা বিক্রেতাকে দিয়া

থাকেন; এবং Bought note অর্থাৎ ক্রেতার কণ্ট্রাক্ট, ইহা দালালেরা ক্রেতাকে দিয়া থাকেন। এই কণ্ট্রাক্টের রসিদ দালালেরা উভয়ের নিকট হইতেই সহি করাইয়া লইয়া নিজেদের নিকট রাখেন। দ্বিতীয় প্রকারের কণ্ট্রাক্ট (Contract) এই যে, বিক্রেতা উভয় খণ্ডই লিখিয়া একখণ্ড নিজের সহি করিয়া ক্রেতাকে দেন এবং ক্রেতার নিকট হইতে অপর খণ্ডখানি ঐরূপ সহি করাইয়া লইয়া থাকেন। তৃতীয় প্রকারের কণ্ট্রাক্ট—বড়ই ভয়ানক রকমের কণ্ট্রাক্ট!! যিনি এই কণ্ট্রাক্ট অনুসারে মাল অন্ততঃ একবারও ক্রয় করিয়াছেন, তিনিই ইহার মর্ম্ম বিশেষরূপে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই কণ্ট্রাক্টে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হইতে সহি করাইয়া লন; কিন্তু নিজেরা কোনও প্রকার কণ্ট্রাক্টের কথা দূরে থাকুক, একখানা স্বীকার-পত্রও গ্রাহককে দেন না। আর, এই তৃতীয় রকমের কণ্ট্রাক্ট অনুসারে যে সকল মহাজনগণ মাল সওদা করেন, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিক্রেতার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়। কারণ, যখন ক্রেতা নিজে কোনও রূপ কণ্ট্রাক্ট কিংবা স্বীকার-পত্র বিক্রেতার নিকট হইতে পান না, তখন তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপেই বিক্রেতার অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকিতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শেষোক্ত প্রকারের (Contract) কণ্ট্রাক্ট এখনও কোনও দালাল চিনিপটীর মহাজনদিগের নিকট আনিতে সাহস পান নাই। এই তৃতীয় প্রকারের কণ্ট্রাক্ট corrugated irons (করুগেট্ টিন্) প্রভৃতি দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের সময় ব্যবহৃত হয়। এই হইল, ত্রিবিধ কণ্ট্রাক্টের কথা। এক্ষণে ঐ সকল কণ্ট্রাক্ট-সমূহে সাধারণতঃ কিরূপ সর্ত্তাসর্ত্তি লেখা হইয়া থাকে, তাহাই সমালোচ্য বিষয়।

১ম কথা—উৎপন্ন দ্রব্য কোন্ দেশের, কি জাতি এবং কোন্ শ্রেণীর বিষয়। অর্থাৎ কি জাতির চিনি, ইক্ষু হইতে উৎপন্ন, কি খেজুর হইতে উৎপন্ন, কি তাল হইতে উৎপন্ন, মেপল হইতে উৎপন্ন, কি অন্য কোনও জিনিষ হইতে উৎপন্ন এবং কি শ্রেণীর অর্থাৎ দানাদার কি অন্য শ্রেণীর। যদি দানাদার হয়, তাহা হইলে কিরূপের দানাদার অর্থাৎ big grains (বড় দানা), কি medium grains (মাঝারি দানা), কি fine grains (মিহিদানা), কি grain-lots (দানাদার), কি crushed (পিটা), এই সমস্ত অধিকাংশ contractএ স্পষ্ট খুলিয়া লেখা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চুক্তিপত্রে এই সকল বিষয় স্পষ্ট খোলসা ভাবে কিছুই লেখা থাকে না। কি জাতীয় চিনি লেখা থাকে, কিন্তু কোন্ কোয়ালিটির

অর্থাৎ কোন্ শ্রেণীর, তাহা লেখা থাকে না। আবার কোনও কোনও কন্‌ট্রাক্টে যে দেশীয় চিনি, সেই দেশের নাম ও তৎপার্শ্বেই চিনির কথাটী লেখা হইয়া থাকে; কি জাতীয় এবং কোন্ শ্রেণীর, তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ থাকে না। অতএব এই সমস্তগুলি অর্থাৎ কোন্ দেশীয়, কি জাতীয় এবং কোন্ শ্রেণীর চিনি, তৎসমুদয় স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকা খুব দরকার। মার্কা ও কোয়ালিটি শিল করা থাকিলে, দরকার না হইতে পারে।

২য়—মার্কা সম্বন্ধে। চিনির মার্কা বাজারে খুবই চলিত হইয়া গিয়াছে, এবং সকলেই মার্কার নাম শুনিলেই মালের বিষয় বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন। এরূপ হইলেও মার্কা এবং কোন্ দেশীয় ও কোন্ জাতীয় এবং কোন্ শ্রেণীর চিনি, তাহারও কন্‌ট্রাক্টে উল্লেখ থাকার বিশেষ দরকার। কারণ, তাহা হইলে গোলমাল হইবার আশা ভবিষ্যতে খুবই কম থাকে। যে কয়েকটী মার্কা কন্‌ট্রাক্টে লেখা থাকে, তাহাদের মধ্যে যে কোনও এক বা ততোধিক মার্কা দেওয়া হইবে, এবং তাহা না হইলে similar অর্থাৎ ঐ প্রকারের যে কোনও মার্কার সমান কোয়ালিটির মাল দেওয়া হইবে, এই কথা Contractএ লেখা থাকিলে পরে গোলমাল না হইবার খুবই সম্ভব। সেই কারণ ১টা standard নমুনা বিক্রেতার নিকট হইতে শীল করাইয়া লইয়া, ক্রেতার নিজের নিকট রাখা উচিত। ইহা ক্রেতার পক্ষে খুব ভাল। কিন্তু কোনও বিক্রেতা তাহা সহজে করিতে চাহিবে না। কোনও মাল সব সময়ে একই কোয়ালিটির যে আইসে, তাহা নহে, ইতর-বিশেষ প্রায়ই হইয়া থাকে; এবং এই ইতর বিশেষ হয় বলিয়াই একটা standard quality বিক্রেতার নিকট হইতে শীল করাইয়া লইয়া, খরিদ্দারের নিজের নিকট রাখা উচিত। অনেকস্থলে বিক্রেতা ঐরূপ নমুনা নিজেরা শীল করিয়া নিজেদের নিকটে রাখেন এবং কন্‌ট্রাক্টে ঐ মর্ম্মে লেখেন; কিন্তু সেটা খরিদ্দারের পক্ষে ভাল নহে। কি জানি, মাল নরম আসিলে উক্ত নমুনা হারাইয়া কিংবা ভাঙ্গিয়া যাইতেও পারে। অতএব দুই পক্ষেরই নিকট ঐরূপ প্রত্যেক নমুনার উভয় পক্ষেরই দ্বারা শীল-কৃত নমুনা থাকার বিশেষ দরকার। যখন এদেশীয় চিনি সাহেবরা আমাদের নিকট হইতে লইয়া সিপমেণ্ট করিতেন, কিংবা অদ্যাপিও কাশীপুরের কালে যে সকল দেশী চিনি বিক্রয় হয়, তাহার নমুনা উভয়পক্ষের নিকট বাঁধা থাকে। এই ভাবে বৈদেশিক বা দেশী কলের চিনির কন্‌ট্রাক্ট করা উচিত। তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোনও গোলমালে পড়িতে হইবে না। কিন্তু

দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ মহাজন তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না; দালালেরা যাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লয়েন।

৩য় কথা—ডিলিভারি সম্বন্ধে। অর্থাৎ যে কোনও একটা স্থান হইতে ডিলিভারি হইবে, তাহা স্পষ্টতঃ কণ্ট্রাক্টে লেখা থাকার বিশেষ দরকার। অনেক কণ্ট্রাক্টে জেটী, কিংবা ঘাট, কিংবা ডক্, যেখানে জাহাজওয়ালা মাল নামাইয়া দিবে, সেইখান হইতে ডিলিভারি দেওয়া হইবে, ইহা লেখা থাকে; কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এই লেখার সত্বানুসারে উক্ত তিন স্থানের যে কোনও এক বা ততোধিক স্থান হইতে ডিলিভারি দিতে পারিবে, এইরূপ বুঝায়। ইহা কি ঠিক ন্যায়সঙ্গত? কখনই নয়। সত্য বটে, বিক্রেতা সাধারণতঃ কোনও গোলমাল করেন না; কিন্তু যদি করেন, তাহা হইলে খরিদ্দারকে কতই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়! অতএব স্পষ্টভাবে কোথা হইতে ডিলিভারি দেওয়া হইবে, তাহার "একস্থান" লিখাইয়া লওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। বিক্রেতারা যখন কোথা হইতে ডিলিভারি দিবেন, ঠিক করিয়া ক্রেতাদিগের নিকট contract অনুসারে কিছুতে আবদ্ধ হইতে চান না, তখন ক্রেতারা কি হিসাবে ঐরূপ সত্বে আবদ্ধ হয়েন? এই প্রথা রহিত করা খুবই উচিত। যে কোনও এক স্থানের নাম কণ্ট্রাক্টে লেখা থাকা বিশেষ আবশ্যক। অতএব প্রত্যেক মহাজনের উচিত, যাহাতে এই নিয়মের প্রচলন হয় ও কেবলমাত্র বিক্রেতার পক্ষে অনুকূল স্বত্বসমূহ contract হইতে উঠিয়া যায়। আর, খরিদ্দার ইচ্ছা করিলে গুদাম হইতেই হউক, কিংবা জেটী (বা ঘাট) হইতেই হউক, ডেলিভারি লইতে পারিবেন, ইহা প্রত্যেক contractএ লেখা থাকা খুব দরকার। অনেক contractএ ইহা থাকে না; এটা খরিদ্দার মহাজনের পক্ষে ভাল নয়। কারণ, সময় অসময়, টাকার টান অটান প্রভৃতি নানাপ্রকার সুবিধা অসুবিধা আছে।

৪র্থ কথা—ডিউটী সম্বন্ধে। বিদেশী মালের উপর আমদানি মাশুল আছে। সাধারণতঃ ডিউটী সমেত দর ধার্য্য করিয়া, মাল বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন কোনও কোনও মহাজন duty নিজের রিস্কে রাখিয়া মাল c. f. i দরে খরিদ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেটা খুবই কম, অধিকাংশ খরিদ্দারই ডিউটী সমেত দর ধার্য্য করিয়া মাল খরিদ করিয়া থাকেন। যিনি যেরূপ স্বত্বে খরিদ করিবেন, তিনি যেন সেই সকল স্বত্ব গুলি খরিদের কণ্ট্রাক্টে সরল এক-অর্থ-বোধক ভাষায় লিখাইয়া লয়েন। নতুবা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার খুবই সম্ভব। বিশেষতঃ ইউরোপীয়

ম্লিট চিনির ডিউটীর কথা। অধিকাংশ contractএ ডিউটির কথা এরূপ অর্থ-বিশিষ্ট কথায় লেখা হইয়া থাকে যে, তাহার মানে ঠিক একরূপ হয় না। এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ লইয়া পরে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। ফলকথা এই যে, সরল ও সহজ এক-অর্থ-বোধক কথায় লেখাইয়া লওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। নতুবা কথার মারপেঁচের দরুণ অনেককে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সম্প্রতি এইরূপ স্বত্বের contract-এর দরুণ একটী মোকর্দ্দমা আদালতের বিচারাধীন আছে এবং অনেক মহাজন উক্ত মোকর্দ্দমায় পরিণামে ফল কি হয় জানিয়া, পরে তদনুসারে কার্য্য করিবেন বলিয়া বসিয়া আছেন। কথা যে, পরের বুদ্ধি বা ভাষার কৌশলের অধীনে থাকা কখনও মঙ্গলজনক নহে। প্রত্যেক মহাজন যেন এই কথা গুলিতে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দেন।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পাল। *

বিলাতী শণের চাষ।

(২)

শণ পরিষ্কার করা কিংবা কাচা, তিন রকম বিভিন্ন প্রণালীতে নেপল্‌স প্রদেশে সংশাধিত হয় :—

১ম। প্রবাহিত বা স্রোতের জলে।

২য়। বদ্ধ জলে।

৩য়। লবণাক্ত জলে।

সাধারণতঃ নেপল্‌স প্রদেশে প্রবাহিত জলেই শণ কাচা হয়, কিন্তু কেসার্টি প্রদেশে বদ্ধ ও প্রবাহিত উভয় প্রকার জলই সমভাবে প্রচলিত। পরিষ্কার করিবার প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা বা প্রবাহিত জলের জলাশয়কে ল্যাগনি বলা হয়। এই সমস্ত জলাশয় অতিশয় প্রকাণ্ড এবং পরিমাণে দৈর্ঘ্যপ্রস্থে প্রায় ১৩ ফিঃ এবং ১৬৫ ফিঃ হইয়া থাকে।

ভূস্বামীগণ উক্ত প্রকাণ্ড জলাশয়ের অধিকারী। তাঁহারা এই সমস্ত

---

* এই লেখক স্বয়ং আফিসাঞ্চলে চিনির যোজকতা কার্য্য করিয়া থাকেন। ইঁহার কথানুসারে চিনিপট্টির মহাজনদিগের কার্য্য করা উচিত। মঃ বঃ সঃ।

জলাশয় উচ্চমূল্যে ভাড়া বিলি করিয়া থাকেন এবং পরিষ্কৃত শণ শুষ্ক করিবার নিমিত্ত আবশ্যক স্থান পর্য্যন্ত জলাশয়ের সঙ্গে বিলি করিয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ খালের পার্শ্বে এই সমস্ত পুষ্করিণী স্থাপিত। কেননা, পরিষ্কার করিবার সময়ে এই খাল হইতে জল সংগৃহীত হয়। এক পার্শ্বে প্রায় তিন ফিট ব্যাস পরিমিত নল দ্বারা প্রায় ৫ ফিট গভীর প্রদেশ হইতে চৌবাচ্চাতে জল চালিত হয়; কিন্তু যে জল প্রবেশ করে, তাহার গভীরতা প্রায় ১৪ ইঞ্চি হইয়া থাকে। বিপরীত দিকে সেই পরিমাণের আর একটী নল দ্বারা জল বাহির হয়, এবং পুনরায় খালে প্রবেশ করে।

জলের উষ্ণভাব প্রায় ২৭ শতাংশ (সেণ্টিগ্রেড) পরিমিত হয়; এবং উষ্ণতার আধিক্য ও ন্যূনতানুসারে পরিষ্কার করণে ৫ হইতে ৭ দিবস পর্য্যন্ত সময় আবশ্যক হয়।

বদ্ধ জলের জলাশয়কে ইংরাজিতে "ভ্যাশি" বলে। এই সকল জলাশয় সামান্য ভূস্বামীগণের অধিকারভুক্ত। ভূস্বামীরা এই ছোট জলাশয় স্ব স্ব ময়দানের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই সমস্ত জলাশয় প্রাচীর-বেষ্টিত, এবং নিকটবর্ত্তী কূপ হইতে ইহাতে জল সংগৃহীত হয়। ইহা কচিৎ দৈর্ঘ্যে ৫০ ফিঃ, প্রস্থে ৩৩ ফিঃ এবং ৩ ফিঃ গভীরের বেশী দৃষ্ট হয় না। মোটের উপর জলের উষ্ণতা ৩২ শতাংশ (সেণ্টিগ্রেড) এবং পরিষ্কার করিতে ৪ হইতে ৬ দিন পর্য্যন্ত সময় আবশ্যক হয়।

শণ লবণাক্ত জলে পরিষ্কার করিলে "লবণ শণ" প্রস্তুত হয়। এই "লবণ শণ"কে ইংরাজিতে "ক্যানেপ স্যালেটা" বলে। ইহা কেবল মাত্র প্যাট্রিয়া হ্রদে প্রস্তুত হয়। প্যাট্রিয়া হ্রদ সমুদ্র হইতে একটী ছোট বালুকাময় পাহাড় দ্বারা বিচ্ছিন্ন বা পৃথকীভূত। সমুদ্রের সহিত ইহার জলের সংস্রব আছে। পরিষ্কার ঝরণার জলও এই হ্রদে প্রবাহিত হয়। কিন্তু যেখানে শণ পরিষ্করণ কার্য্য সংশাধিত হয়, সেখানে বিশুদ্ধ জল যথেষ্ট থাকে না। এই হ্রদে শণ পরিষ্কার করিলে রীতিমত লবণাস্বাদ প্রাপ্ত হয়।

যদ্যপি আগষ্ট মাসে পরিষ্কার করিবার জলাশয় দর্শন করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, আমরা উষ্ণ-প্রধান প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি। শ্বাসরোধকারী উত্তাপ (সচরাচর প্রায় ৪০ শতাংশের বেশী) ও শ্বেতবর্ণ ধূলি দ্বারা মার্গ পরিব্যাপ্ত হয়, এবং প্রকাণ্ড শৃঙ্গ বিশিষ্ট ষণ্ড দ্বারা শণ-পরিপূর্ণ গাড়ি সকল এই সমস্ত রাস্তার উপর দিয়া চালিত হয়। তদুপরি

আবার আগষ্ট মাসের সূর্য্যের জলন্ত কিরণ দ্বারা উত্তাপ আরও বর্দ্ধিত হয়। দেখিলে মনে হয়, যেন সকল জিনিষই ক্লান্ত ও নিদ্রালুভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। সমস্তই নিস্তব্ধ; কেবল মাত্র হাজার হাজার দলবদ্ধ কড়িংরা ক্লান্তিদায়ক কর্কশ কর্ণপীড়াদায়ক ভোঁ ভোঁ শব্দ করিতেছে। পরিষ্কার করিবার জলাশয়ে উপনীত হইলেই দৃশ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যে জলে শণ কাচা হয়, সেই দূষিত জলের ধূম হইতে বায়ু সম্পূর্ণরূপে দূষিত হয়। যে সমস্ত লোক গাড়ী হইতে শণ নামাইয়া লয়, কিংবা শুষ্ক হইবার নিমিত্ত ভূমিতে কাচা শণ বিছাইয়া দেয়, কিংবা শুষ্ক শণ বোঝাই করিয়া দেয়, তাহাদের মধ্যে অনেকে অর্দ্ধাবৃত বা অনাবৃত শরীরে সূর্য্যোত্তাপে আরবের ন্যায় বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে থাকে এবং বিকট অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে।

অন্যান্য সকলে বগল পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া, শণ-কাষ্ঠের মাড় প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং শিষ্ গুলিকে ডুবাইয়া দিবার নিমিত্ত পাথর দিয়া ভারী করিয়া থাকে।

এই সমস্ত লোকের মধ্যে অধিকাংশই আনন্দের সহিত মধুর সঙ্গীত আরম্ভ করে এবং আপনাদিগকে জাগরিত রাখিবার নিমিত্ত হাজার হাজার বার পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে। অশ্বারোহী এবং পদাতিক কতকগুলি সান্ত্রীপাহারা লম্বা লম্বা বন্দুক হস্তে লইয়া, শান্তিরক্ষার্থ জলাশয়ের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে।

দক্ষিণদেশীয় লোকের রক্ত উত্তপ্ত সূর্য্যোত্তাপে শীঘ্রই উত্তেজিত হইয়া থাকে।

যাহারা এই সমস্ত শণ পরিষ্কার করিবার জলাশয়ে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের জলাভূমি-প্রদেশীয় জ্বর হইয়া থাকে। এই জ্বরকে ম্যালেরিয়া কহে। জ্বরের আক্রমণে ও প্রকোপে কাঁপিতে কাঁপিতে সূর্য্যাস্তের সময় তাহারা স্ব স্ব দূরবর্ত্তী কুটীরে প্রত্যাবৃত্ত হয়। সেই সময়ে পাহারাওয়ালারা ভিন্ন আর কেহ জলাশয়ের নিকট থাকে না। এই সমস্ত পাহারাওয়ালারা ভূমি হইতে প্রায় ১০ ফিঃ উচ্চে টালি নির্ম্মিত কুটীরে রাত্রি অতিবাহিত করে। এত উচ্চতা হেতু বিষাক্ত গ্যাস কচিৎ মাটি হইতে সেখানে উঠিতে পারে। রাত্রিকালে সেই ভূমিতে শয়ন করা কেবলমাত্র পরদিবস জীবনকে মৃত্যু-সঙ্কটে পাতিত করা ভিন্ন, অন্য কিছু নহে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে শণ পরিষ্কার করিলে যে বিভিন্ন ফল লাভ হয়, তদ্বিষয়ে ফিষ্টার সাহেবের মতঃ—

প্রবাহিত বা স্রোতের জলে শণ পরিষ্কার করিলে, শণের বেশ হাল্কা রং হইয়া থাকে এবং নেপল্‌স্ প্রদেশীয় শণের রংএর ন্যায় রং হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে পরিষ্কৃত হইলে, ইহার কাটার কিংবা শণের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই।

বদ্ধ জলে পরিষ্কৃত শণের রং একটু লালবর্ণ এবং উহা ইহার গন্ধ দ্বারা সহজেই অনুমিত হয়। কেননা, এই গন্ধ দ্বারা পরিষ্কার করিবার জলাশয়ের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের এইরূপ বায়ুর গন্ধ ক্ষরিত হইতে থাকে। এইরূপ ধারণা আছে যে, প্রবাহিত জলে পরিষ্কৃত শণ অপেক্ষা এই শণের বল বেশী; কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। এই ভ্রান্ত ধারণা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। যে সমস্ত প্রদেশে এই সকল জলাশয় আছে, সেই সমস্ত স্থানের শণ অপেক্ষাকৃত মোটা, এবং কেবলমাত্র সেই প্রদেশের ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থাই ইহার একমাত্র কারণ। লাল রং সম্বন্ধে জলের রাসায়নিক সংমিশ্রণই একমাত্র কারণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জল কূপ হইতে উত্থিত হয়। এই ভূমধ্যস্থ জল আগ্নেয়-গিরি সন্নিকটস্থ ভূমির দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে এবং সেই জন্য ইহাতে রাসায়নিক লবণ পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণে বিরাজমান থাকে। এই রাসায়নিক লবণ পদার্থ চূণময় পাহাড় হইতে উদ্ভূত ঝরণার জলে একবারেই দৃষ্ট হয় না, এবং এই জলই প্রবাহিত জলাশয়ে পাওয়া যায়।

লবণাক্ত জলে পরিষ্করণ প্রণালী অত্যন্ত ক্ষতিজনক, এবং ইহা জুয়াচুরির ব্যবসায় বলিয়া প্রতীয়মান। এই সমস্ত শণের রং অত্যন্ত হাল্‌কা এবং সুন্দর। ইহা অত্যন্ত স্বাস্থ্যজনক এবং বলশালী। কিন্তু ইহার ডাঁটাগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়। ইহার এইরূপ আকার হইবার কারণ এই যে, ইহা পরিষ্কার করিবার জলাশয়ের জল হইতে অনেক পরিমাণে লবণ শোষণ করে। এই শণ গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত পরিষ্কার হয়। যখন বাতাস শুষ্ক এবং গরম থাকে, তখনও ইহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সামান্যমাত্র জল কিংবা কুজ্ঝটিকা হইলে ইহা সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র হইয়া যায়।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে/পরিমাণের বর্দ্ধন দৃষ্ট হয়; শতকরা ৫ হইতে ৬ পর্য্যন্ত ইহার পরিমাণ বেশী হয়। এই শণ কঠোররূপে পরিত্যক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

যখন বায়ুর অবস্থা অত্যন্ত ভাল (উষ্ণ) ছিল, একজন তন্তুবায় এই শণের কিঞ্চিৎ লইয়া বুনন করিয়াছিল, এবং শক্ত দড়ি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিল। কয়েকদিন বৃষ্টির পর দড়ি সম্পূর্ণরূপে ছাতা-পড়া হইয়া গিয়াছিল এবং সম্পূর্ণরূপে বিক্রয়ের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও ইহাকে শুষ্ক এবং ভাল করিবার নিমিত্ত বহুল চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যখন এইরূপ ভাবে কাচিলে এইরূপ শণ হয়, তখন এইরূপ পরিষ্কার প্রণালী কেন চলিতেছে? ইহার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া সুকঠিন। এই মাত্র জানা যায় যে, এই শণে বেশী লাভ হয়। এই শণ কেবলমাত্র সামান্য শণের ব্যবসায়ীরা খরিদ করিয়া থাকেন। কেননা, ইহার রং অত্যন্ত পরিষ্কার বলিয়া দোকানীরা রংয়ের উপর বেশী নজর রাখে। ইহারা সাজাইয়া খুচরা দরে স্ত্রীলোকদিগকে বিক্রয় করে, এবং তাহারা হাতে করিয়া শণ কাটিয়া থাকে।

পরিষ্কার করিবার পর তিন চারি দিবস শুষ্ক করা হয়। এই প্রণালীতেও বিবর্ণ হইবার ভয় থাকে। যেরূপভাবে শণকে টানিয়া মাটীর উপর স্থাপিত করিবার পর খারাপ হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপেও ইহা খারাপ হইতে পারে। যাহা হউক, শণ শুকান শেষ হইলে, উৎপন্নকারী কৃষকগণের গোলাবাড়ীতে আনীত হয় এবং তৎপরে অন্যান্য কার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে। [ক্রমশঃ।

শ্রীরামময় পিরি।

ভ্রম সংশোধন।

৩য় খণ্ড ২য় সংখ্যা চৈত্র মাসের মহাজনবন্ধুর ৩১ পৃষ্ঠায় "মধুপুরে গোলাপ ফুলের চাষ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, "সেপ্টেম্বরের ১৫ই হইতে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত দেড় মাস বা ৯০ দিনে গড়ে প্রত্যহ হাজার পুষ্প ১০ টিন রেল মাসুল ইত্যাদি খরচা বাদে যদি প্রত্যেক টিন ১০০ ফুল ১৲ হিসাবে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে প্রত্যহ আয় ১০৲ টাকা।"

ইহাতে ভুল এই যে, ১৫ সেপ্টেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত দেড়মাস বা ৯০ দিন নহে। ৫ মাস ১৫ দিন হইবে। ইহাতে প্রত্যহ ১০৲ আয় হইলে ১৬৫০৲ হয়। তাহা হইলে প্রথম বর্ষে ১৩০০৲ ক্ষতি না হইয়া ৫৫০৲ হইবে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে ফুলের দর ১৲ যাহা ধরিয়াছি, তদপেক্ষা নিশ্চিতঃ দর বেশী হইবে। তাহা হইলেই দ্বিতীয় বর্ষে ক্ষতি শেষ হইবে।

শ্রীলালমোহন রক্ষিত।

ঢাকাই মসলিন্।

ঢাকার মসলিন্ বস্ত্র ভারতবাসীর অতিশয় গৌরবের সামগ্রী। ফরাসী ও ইংরেজগণ তাঁহাদের কলে অনেক রকম সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঢাকার প্রাচীন অধিবাসী বসাকবংশীয়-দিগের হস্ত-নির্ম্মিত মাকড়সার জালের মত পাতলা মসলিনের নিকট সে সকল বস্ত্র আজিও সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। শাদা, ডুরে এবং জামদানী বা ফুলদার অনেক প্রকার কাপড় বহুশতাব্দী হইতে ঢাকা নগরীতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই সকল শ্রেণীর বস্ত্রের মধ্যে একমাত্র সূক্ষ্ম শাদা মসলিনের জন্যই ঢাকার নাম পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হইয়াছে। সুসভ্য রাজ্যমাত্রই এ বস্ত্র আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে, এবং এ পর্য্যন্ত যেথানে যত প্রকাশ্য মেলা খোলা হইয়াছে, সে সকল স্থানেই ইহা সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছে।

ভারতে মুসলমানদিগের রাজত্বকালেই ঢাকার মসলিন্ বস্ত্র ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মুসলমানগণ অত্যন্ত ভোগবিলাসী জাতি। পূর্ব্ব-কালের মুসলমান নবাব ও বাদসাহগণের পোষাক তৈয়ারির জন্য অথবা দিল্লীর রাজসভা সাজাইবার জন্য ঢাকাই মসলিন্ বড়ই আদরের বস্ত্র ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁহার পত্নী নুরজাহানের যত্নে এই ব্যবসায়ের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তখনকার তিন গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া এক খণ্ড খুব পাতলা মসলিন্ বা মল্‌মল্‌খাস ৪০০্ টাকার কমে প্রস্তুত হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের এক গজ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মল্‌মলের দাম কত? সচরাচর ১৫্ হইতে ২০্ টাকা। কি আশ্চর্য্য অবনতি!! পূর্ব্বে ঢাকার বসাক-বংশীয়গণের পূর্ব্ব-পুরুষেরা অনেকেই এই সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন, কিন্তু এখন দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের দিন দিন অবনতিতে তাঁহাদের বংশধরেরা নিরাশ-হৃদয়ে সে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন শুনা যায়, সমস্ত ঢাকার মধ্যে নবাবপুরে হরি মোহন বসাক নামে এক জন মাত্র শিল্পী আছেন, যিনি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নে সক্ষম।

পুরাকালের ঢাকাই মসলিনের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প

প্রচলিত আছে। শুনা যায়, সে কালের একটী ভাল থান লম্বাদিকে অনায়াসে একটী আংটীর মধ্যে গলিয়া যাইত। ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে ট্র্যাভারনিয়র নামক কোন এক ভ্রমণকারী বলিয়া গিয়াছেন যে, একদা পারস্যরাজের দূত ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় উটপক্ষীর ডিম্বাকৃতি একটী মুক্তাখচিত নারিকেল খোলের ভিতর ৩০ গজ লম্বা একটী পাগড়ীর থান পুরিয়া পারস্যরাজকে উপঢৌকন দিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে যে ঢাকাই মসলিনের অধিক উন্নতি হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বস্ত্রের প্রচলিত নামগুলিই বিশেষ প্রমাণ। "সওগাতি" অর্থাৎ সওগাৎ দিবার উপযুক্ত, "শরবতী" (বোধ হয় শরবৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন), "মল্‌মল্‌খাস" অর্থাৎ খাস মল্‌মল্‌ বা রাজার ব্যবহারের উপযুক্ত মল্‌মল্‌, "আব-রোয়ান" অর্থাৎ প্রবাহিত জল, "সব-নম" বা সান্ধ্য-শিশির এবং "বাফৎ-হাওয়া" বা হাওয়া কাপড় ইত্যাদি যতগুলি কবিত্বপূর্ণ প্রাচীন নাম শুনা যায়, এ সকল গুলিই মুসলমানগণের প্রদত্ত বলিয়া বোধ হয়। এই বস্ত্রের গুণ এই যে, নদীবক্ষে বা শিশির-সিক্ত স্থানে ইহা বিছাইয়া দিলে, ঐ জল ও শিশিরের সহিত ইহা এমনই মিশাইয়া যায় যে, হঠাৎ আর উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, অথবা গায়ে একখানি কাপড় থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া বেশ বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ সূক্ষ্মতা হেতুই বোধ হয়, নামদাতাগণ এই বস্ত্রকে কখন জল, কখন শিশির এবং কখনও বা বায়ুর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

মুসলমানদিগের রাজ্যনাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং ইংরেজদিগের রাজ্য-গ্রহণের কয়েক বৎসর পর হইতেই ভারতের এই সুন্দর বস্ত্র ব্যবসায় দিন দিন অবনত হইয়া আসিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির হস্তে এদেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল, তখন তাঁহাদের অধীনে বঙ্গদেশের যে যে স্থানে ভাল কাপড় তৈয়ার হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানে দুই একটী করিয়া কুঠী ছিল। ঐ সকল কুঠীতে দেশীয় শিল্পীগণ কর্ম্ম করিয়া নানা প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিত। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি তাঁহাদের কারখানা সমূহে প্রস্তুত সমস্ত কাপড় এবং দেশের অন্যান্য কারিকরদিগের হস্তনির্ম্মিত বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় করিতেন, এবং বিস্তর কাপড় জাহাজে করিয়া আপনাদের দেশে লইয়া গিয়া তদ্দ্বারা অনেক ধন সঞ্চয় করিতেন। এই সময়ে এখানকার বস্ত্র এতদূর প্রচলিত ছিল যে, ইষ্ট-

ইণ্ডিয়া-কোম্পানি ও আর আর সওদাগরগণ তখন বৎসরে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার শুদ্ধ ঢাকাই বস্ত্র (মসলিন্, জামদানী প্রভৃতি) ক্রয় করিতেন। যাহা হউক, এ সুখের অবস্থা বড় অধিক দিন ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই অবস্থা অনেক অবনত হইয়া পড়ে। ১৮০৭ সালে ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার ১ শত টাকার কাপড় বিক্রয় হয় মাত্র। এখন সেই অবস্থা দিন দিন আরও এত অবনত হইয়াছে যে, আজ কাল বৎসরে আন্দাজ ৩ লক্ষ টাকার অধিক কাপড় কাটে না।

এখন আমাদের দেশে কলের কাপড় এতই প্রচলিত হইয়াছে যে, হস্তে প্রস্তুত বস্ত্র আর কেহ কিনিতে চায় না। আবার দেখ, হস্তে প্রস্তুত বস্ত্র যাহা কিছু এখন তৈয়ার হয়, সে সমুদয়ই কলের সূতায় তৈয়ার হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া এ কালের অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশের লোকেরা হয়ত কখন সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে নাই। ইহা ভুল কথা। তখনকার চলনসই দেশী বস্ত্রের জন্য যে সকল দেশী সূতা ব্যবহার করা হইত, তাহা আজকালের কলের সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম হইত না। ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহা আবার আরও সত্য কথা যে, এদেশের ঢাকাই মসলিনের ন্যায় বহুমূল্য বস্ত্রের জন্য যে দেশী সূতা বহুকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তৈয়ার হইতেছে, তাহা আবার জগতের অপর কোন জাতি প্রস্তুত করিতে পারে না। ঢাকার আশেপাশে তন্তুবায়শ্রেণীর অশিক্ষিতা রমণীগণ আস্‌না তূলা হইতে দেশীয় পদ্ধতি অনুসারে যে সূক্ষ্মতম সূতা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাহার নিকট কলে প্রস্তুত খুব ভাল সূতাও দাঁড়াইতে পারে না। ইহা হইতে আমাদের আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? ইংরেজেরা ইহা শিক্ষা করিবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কত বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, বড় বড় মেলার সময় এদেশের সূতা লইয়া গিয়া ইউরোপীয় নানা প্রকার সূক্ষ্ম সূতার সহিত তুলনা করিয়া, কাহার কিরূপ পাক, কোন্ সূতা কত সরু ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অনুবীক্ষণ লইয়া ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া, তবে তাহাতে সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

তূলা হইতে সূতা ও সূতা হইতে কাপড় প্রস্তুত করিতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২৬ রকম ছোট বড় দেশীয় যন্ত্র আবশ্যক। এই সকল যন্ত্র দড়ি, বাঁশ, বাখারি, বেত, লোহা ও শরকাটি প্রভৃতি যৎসামান্য সামগ্রীতেই তৈয়ারি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, আগেকার ন্যায় আজকালের ঢাকাই মসলিন্

বেশী দামী হয় না। কিন্তু এখনও যাহা আছে, তাহারই বা তুলনা কোথায়? এখনকার এক তোলা আস্‌না তুলার সূতার মূল্য সূক্ষ্মতা ভেদে ৭৲ হইতে ১৮৲ টাকা। মসলিনের জন্য এক রতি ওজনের সূতা সচরাচর ১৪০ হইতে ১৭৫ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে ইহাপেক্ষাও সরু করা যাইতে পারে। ৶৷০ সের তুলা হইতে ১২৫ ক্রোশেরও অধিক লম্বা সূতা বাহির করা হইয়াছে। রমণীগণের কোমল হস্তে কেমন করিয়া সূতা তৈয়ার হয়, তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে ;—

প্রথমতঃ খানিকটা তুলা লইয়া, তাহাতে পাতার কুচি বা মাটি প্রভৃতি যাহা কিছু জড়িত থাকে, তাহা খুব যত্ন করিয়া বাছিতে হয়। তারপর বোয়াল মাছের চোয়ালের দন্তপাটি দ্বারা তুলাটুকু আস্তে আস্তে আঁচড়াম হয়। বোয়াল মাছের দাঁতগুলি ছোট, ঘন ঘন ও একটু বাঁকা। ইহাতে বেশ চিরুণীর মত কাজ করে। তুলা আঁচড়ান হইলে একখানি পাতলা চালতা কাটের তক্তার উপর বিছাইয়া, তাহার উপর দিকে একটী সরু লোহার শলা এরূপভাবে একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া চালান হয় যে, বিচি না ভাঙ্গিয়া কেবল তাহা হইতে তুলা আলাদা হইয়া পড়ে। এই তুলাকে ছোট ধনুযন্ত্রে ধুনিতে হয়। এই ধনুর জন্য তাঁত, মুগা রেশম, কলার সূতা অথবা বেতের সূতা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তুলা ধুনা হইলে একটি মোটা রকম কাঠের দণ্ডে উহা আল্‌গা করিয়া জড়াইয়া, অবশেষে দণ্ডটা মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তুলাপিণ্ডকে দুই খানা তক্তার মধ্যে ফেলিয়া চাপিতে হয়। তারপর এই তুলাকে আবার পেন কলমের মত ছোট ছোট গালামাখান শর কাটিতে জড়াইতে হয় ও সর্ব্বশেষে ঐ কাটিগুলিকে কুঁচিয়া মাছের কোমল ও মসৃণ ছালে ঢাকিয়া রাখা হয়। এক একটী গালার কাটি জড়ান তুলাকে "পুনী" বলে। ইহাদিগকে ঢাকিয়া রাখিলে সূতা কাটিবার সময় কোন রকম ময়লা ধরে না।

[ক্রমশঃ।

বিশ্বাস।

ইহা মানুষের একটী বৃত্তি বা প্রবৃত্তি। বৃত্তি বা প্রবৃত্তি কি? গাছের ফুল যে বোঁটায় হয়, তাহাকে পুষ্পের বৃত্তি বলে; ইহার উপর ফুল দাঁড়ায়। সেইরূপ মানুষের মন যাহার উপর দাঁড়ায়, তাহাকেই বৃত্তি বলে। মানুষ দুই অংশে বিভক্ত। এক অংশ অন্ন ভক্ষণ করে—ইহাকে জড়দেহ বলে। অন্য অংশ শব্দ ভক্ষণ করে—ইহাকে মন বলে। মন জড়, কিন্তু চেতন। চৈতন্যদেহ যথায় দাঁড়ায়, তাহাকে বৃত্তি বলে। জড়দেহ যথায় দাঁড়ায়, তাহাকে প্রবৃত্তি বলে। বৃত্তির অন্য অর্থও আছে, যেমন কাজ কর্ম্মকেও বৃত্তি বলে। এখানে "দাঁড়ায়" অর্থে সীমাবদ্ধের ভিতর অভ্যাস করা। কাহার কাহার মন দ্বেষ-হিংসায় পূর্ণ থাকে। ইহারা অপরের ভাল দেখিতে পারে না। সর্ব্বদা পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ভিন্ন ইহারা সুস্থ থাকিতে পারে না। ইহাদের মনে সর্ব্বদা এই ভাব উঠে বলিয়া, দ্বেষ হিংসাকে এইজন্য বৃত্তি বলে। এই ভাব উহারা (জড়দেহ) মুখ দিয়া প্রকাশ করে বলিয়া, দ্বেষ হিংসা করা উহাদের প্রবৃত্তি।

যাহা হউক, দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, মায়া, দয়া প্রভৃতি যেমন মানুষের বৃত্তি বা প্রবৃত্তি, সেইরূপ বিশ্বাসও মানুষের বৃত্তি বা প্রবৃত্তি। ঐগুলি ভিন্ন যেমন মানুষ একদণ্ড স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিশ্বাস ভিন্ন মানুষ কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না।

ব্যবসায়ের মূলধন বিশ্বাস। কোটিপতি মহাজন ইহা হারাইলে তাহাকে পথের ভিখারী হইতে হয়। জগতে এমন সহস্র সহস্র লোক দেখাইতে পারি যে, তাহারা এক শত টাকা মাত্র পুঁজি লইয়া, হাজার হাজার টাকার ব্যবসায় করিতেছেন! ইহা কেবল বিশ্বাস মূলধনের জন্য।

যদি কাহারও শীঘ্র শীঘ্র উন্নতির প্রয়োজন হয়, তিনি বিশ্বাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন। অন্য বৃত্তি বা প্রবৃত্তি কমাইয়া ফেলুন। কেবল "কর্ম্ম" "কর্ম্ম" "স্বকর্ম্মে" রত হউন। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা পরিত্যাগ করুন। সত্য কথা বলিতে অভ্যাস করুন। কাহাকেও ফাঁকি দিব না, এই সঙ্কল্প করুন। তখন বিশ্বাস আপনি আসিবে।

আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি, অর্থে আপনারা যাহাকে যত বড়-লোক বোধ করেন, প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিত তিনি তত বড়লোক নহেন; কেবল বিশ্বাসে তাহাকে তত বড়লোক বোধ হয়। যাহার মূলধন হাজার টাকা, তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে যাও, দেখিবে—দশ হাজার টাকার মত বিষয়ী বলিয়া তাহাকে বোধ হইবে। বাস্তবিক দশ হাজার টাকার দ্রব্য তাহার দোকানে আছে বটে, কিন্তু তাঁহার পুঁজি সবেমাত্র হাজার টাকা। অন্যের টাকায় তাঁহার দোকানের এত গৌরব! অন্যে এত টাকা দিল কেন? বিশ্বাসে। এইরূপ বিশ্বাসেই লক্ষপতিকে কোটিপতি বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কেন বোধ হয়? বাস্তবিক তাঁহার নিকট কোটি টাকা আছে কি? টাকা যে নাই, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু এ টাকা তাহার নহে, অন্যের; বিশ্বাসের জোরে তাহার নিকট গচ্ছিত আছে মাত্র। উন্নতি করিবার সহজ উপায় এ জগতে বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নাই।

আমরা অদৃষ্ট মানি—না। ঈশ্বরের নিকট টাকা নাই। নিশ্চিত জানিও, ওগো বাবুরা! ঈশ্বরের নিকট টাকা নাই। তিনি একজনকে মুটে এবং একজনকে রাজা করেন নাই। এ সবই কর্ম্মক্ষেত্রের ফল। যে ভাল সঙ্গী পায়, যে ভাল দলে থাকে, যে যে অবস্থার লোকের সঙ্গে সর্ব্বদা বাস করে, সে সেইরূপ কর্ম্মক্ষেত্র পায়, তাহার সেইরূপ উন্নতি হয়। তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে চাও, মহাজন এবং রাজাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার চেষ্টা কর, এস—পথে এস। অমুক রাজার সঙ্গে কাহার আলাপ খুঁজিয়া দেখ। তাহা দ্বারা ক্রমে রাজার সঙ্গে পরিচিত হও। কিছুদিন পরে দেখিবে, তোমার অবস্থা ফিরিয়াছে। তোমার অবনতি সঙ্গীর জন্যই হইয়াছিল।

কর্ম্মবীর তুমি; তুমিই সেই দেবতা! এখানে কেন দেব! তুমি মুটে সাজি-য়াছ? এখানে কেন দেব! তুমি চাকর হইয়াছ? এখানে কেন দেব! তুমি আফিসের কেরাণী? হারাইয়াছ—হারাইয়াছ, বুদ্ধি হারাইয়াছ, বিদ্যা হারাই-য়াছ,—হারাইয়াছ বিশ্বাসে! তাই এই অবনতি। সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র; এস—বিদ্যা, বুদ্ধি, সঙ্গী এবং বিশ্বাসকে সঙ্গে লইয়া মহাজন হইবে, এস। এই বিশ্বাসকেই ব্যবসায়ীরা "পশার" বলে।

শ্রীঃ—

বিষ্ণুপুরের তামাকের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বর্গীয়

শ্রীপতি করের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত।

ইনি ৺গঙ্গানারায়ণ করের পুত্র; ইঁহার মাতার নাম শ্রীমতী হরমোহিনী দাসী (এখনও জীবিতা)। ইনি ১২৫০ সালে বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ইঁহার পিতা তাদৃশ সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন না। মৃত্যুকালে সন্তানগণের ভরণ পোষণ জন্য কোনও রূপ সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইনি বিদ্বান্ ছিলেন না; কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। একমাত্র সঙ্গীত ব্যতীত, শ্রীপতি পিতার আর কোন বিষয়ের অধিকারী হইতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর পরিবার প্রতিপালনের ভার শ্রীপতির উপর পড়িল। পৈতৃক সম্পত্তি কিছুমাত্র ছিল না; ব্যবসায়-বাণিজ্যেও তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। বাল্যকালে লেখাপড়া না শিখিয়া, জাতীয় ব্যবসায়ে উপেক্ষা করিয়া, গীতবাদ্যে শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় নিজের উদরান্নের সংস্থান ও তদুপরি পরিবার প্রতিপালন অন্য লোকের পক্ষে যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাপ্রদ, ক্লেশকর ও চিন্তার কারণ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চিন্তা কাহাকে বলে, শ্রীপতি আশৈশব তাহা জানিতেন না। কোনরূপ ক্লেশকরী চিন্তাও কখনই তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। আজীবন তিনি মনের আনন্দে ছিলেন। তাঁহার আর একটী অমানুষিকী শক্তি ছিল,—তাঁহার সহিত কথোপকথনে অত্যন্ত বিষাদিত ও তাপিত প্রাণও ক্ষণকালের জন্য সংসারের দুঃখ শোক তাপ ভুলিয়া, এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিত। তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া, লোকে বলিত—"শ্রীপতি মরা মানুষকে হাসাইতে পারে"।

যাহা হউক, শ্রীপতি নিজের এবং পরিবারের প্রতিপালনের জন্য এক দিনের জন্যও চিন্তিত হয় নাই।

বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। এক্ষণে তথায় আর তাদৃশী সঙ্গীতচর্চ্চা হয় না, সত্য, কিন্তু শ্রীপতির বাল্যাবস্থাকালে বিষ্ণুপুরের প্রতিগৃহে সঙ্গীতচর্চ্চার অতিসুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। ২।৪টী অতি উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ যাত্রার দলও ছিল। শৈশবকালে ইনি কোন একটী যাত্রার দলে বালক সাজিতেন, পরে যৌবনে তিনি সং সাজিতে বেশ শিখিয়াছিলেন। সন ১২৭৯ সালে তিনি কোন একটী

আমার দলের আসামী হইয়া, পঞ্চকূটাধিপতির রাজধানী কাশীপুরে গান করিবার জন্ত গমন করেন। তৎকালে তাঁহার বয়স ২৯ বৎসর। অন্ত লোকে বলে যে, শ্রীপতি গান করিবার জন্য কাশীপুরে গিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, লক্ষ্মীদেবীর সম্বর্দ্ধনা ও সঙ্গে আনয়ন জন্ত শ্রীপতি কাশীপুরে গমন করিয়াছিলেন। কাশীপুরে গমন হইতেই তাঁহার ভাগ্যোদয়ের সূত্রপাত হয়। এক্ষণে বিষ্ণুপুর যেমন তামাকের জন্ত প্রসিদ্ধ, তথন কাশীপুরও সেইরূপ ছিল। কিন্তু কাশীপুরের রাজার খাসের তামাক রাজা ভিন্ন অন্ত কেহ ব্যবহার করিতে পাইতেন না।

শ্রীপতির গীতাভিনয়ে কাশীপুরাধিপতি তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে কতকখানি খাস তামাক উপহার দেন এবং তৎসঙ্গে ইহার প্রস্তুতি-প্রণালী শ্রীপতিকে শিখাইয়া দিবার জন্ত তামাক প্রস্তুত-কারীকে আদেশ করেন। শ্রীপতি বিষ্ণুপুরে প্রত্যাগমন করিয়া, পর বৎসর সন ১২৮০ সালে নিজ বাটীতে তামাকের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

অল্পকালের মধ্যেই শ্রীপতির তামাক চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ও তৎসঙ্গেই প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। তামাকের কাট্‌তী দেখিয়া, তিনি অধিকতর উৎসাহে নিজ কারখানার আয়তন বাড়াইলেন এবং বর্দ্ধমান, কলিকাতা, মেদিনীপুর, ঘাটাল প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বন্দরে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির সহিত তাঁহার স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। পূর্ব্বের ন্তায় সম্পন্ন অবস্থাতেও তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী ও হৃষ্টচিত্ত ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন,—দেবদেবী ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল।

তিনি পরোপকারীও ছিলেন—পরদুঃখ অপনয়ন জন্ত বা দুর্ব্বিপাকের প্রতিকারার্থ তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালের দুর্নিবার শক্তিবশে তিনি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের যথোচিত ব্যবহার করিবার সময় পাইলেন না। সন ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণে শোকার্ত্তা জননীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, নিঃসন্তান অবস্থায় পরকালের শান্তি-নিকেতনে গমন করিলেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

বিষ্ণুপুর, স্কুল-সবইন্‌স্পেক্টর।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা; শ্রাবণ, ১৩১০ সাল।

দেশী ও বিলাতী সব্‌জী চাষ।

(কাশীপুর প্র্যাক্‌টিকেল ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে লিখিত)

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

পটল। ইহার পক্ষে সসার দোঁয়াস মৃত্তিকা প্রশস্ত। পলি মৃত্তিকাতেও ইহা উৎপন্ন হয়। জল বদ্ধ না থাকে, এরূপ উচ্চ ভূমিই পটলের পক্ষে উপযোগী।

ইহার গাছের গ্রন্থি হইতে চারা প্রস্তত করিতে হয়। কার্ত্তিক মাসে চারা জন্মাইবার প্রকৃত সময়, অগ্রহায়ণ মাসেও চারা হইয়া থাকে।

পটল গাছের প্রায় সকল গ্রন্থি (গাঁইট) হইতে শিকড় নির্গত হইয়া মৃত্তিকার নিম্নে প্রবিষ্ট হয়। সেই সকল গাঁইটের দুই পার্শ্বে এবং শিকড়ের ২ ইঞ্চি নীচে কর্ত্তন করিয়া শিকড়-সহ এই খণ্ড খণ্ড গ্রন্থিগুলি কোন একটী পাত্রে রাখিয়া, কেবল শিকড় সকল ভিজে, এরূপ গোময়ের সারযুক্ত জল দিবে; তাহার অধিক দিবে না। এইরূপ আধ ঘণ্টা জলে রাখিবার পর, উহা ক্ষেত্রে রোপণ করিবে।

ক্ষেত্রে সার দিয়া উত্তমরূপে চাষ করিয়া, ঢেলা ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করিবে ও ক্ষেত্রে জল বদ্ধ হইতে না পারে—এ নিমিত্ত প্রতি চারি হাত অন্তর এক একটী নালা কাটিবে।

দুই নালার মধ্যবর্ত্তী স্থানে তিন সারি করিয়া মূল রোপণ করিবে। প্রত্যেক সারিতে তিন তিন হস্ত অন্তর প্রত্যেক স্থানে ২।৩ খণ্ড মূল রোপণ করা কর্ত্তব্য।

উত্তাপে শুষ্ক হইতে না পারে, এজন্য জমির উপরে পাতলা করিয়া খড়ের চাপা দেওয়া উচিত। যত দিন গাছের কুঁড়ি বাহির না হয়, ততদিন অল্প পরিমাণে জল সেচন করিতে হইবে। চারা বড় হইলে, এবং মৃত্তিকা সরস থাকিলে জল সেচন বন্ধ করিবে।

ফাল্গুন, চৈত্র মাস হইতে ফল উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয় এবং ৬ মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। একবার চারা জন্মিলে প্রায় ৩ বৎসর পর্য্যন্ত উত্তম ফল পাওয়া যায়।

কোন কোন স্থানে মাচা বান্ধিয়া তাহাতে পটল গাছ উঠাইয়া দেয়; ইহাতে ফল বড় হয়। আর কোন কোন স্থানে জমিতে গাছ বাড়িয়া ফল প্রদান করে। পটল বড় উপকারী তরকারী।

লাউ। পরিমাণ মত সার-যুক্ত প্রায় সর্ব্ব প্রকার ভূমিতেই ইহা উৎপন্ন হয়। কিন্তু দোঁয়াস ও পলি মৃত্তিকাই ইহার পক্ষে প্রশস্ত। গো-শালার নিকটবর্ত্তী স্থানে এই গাছ উত্তমরূপে উৎপন্ন হয়। যে স্থানের মৃত্তিকাতে বালির ভাগ অধিক, তথায় ঐ মৃত্তিকাতে অধিক পরিমাণে সার দিয়া তাহাতে ইহা রোপণ করিবে। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে ইহার বীজ রোপণ করিতে হয়। এই সকল গাছের ফল শীতকালে যথাপরিমাণে উৎপন্ন হয়। ফাল্গুন মাসে বর্ষাতি লাউয়ের বীজ রোপণ করিতে হয়। যে স্থানে ইহার বীজ রোপণ করিতে হইবে, তথায় একটী গর্ত্ত করিয়া উহাতে পচা গোবর ১ ভাগ, দোঁয়াস মাটী ৩ ভাগ পূরণ করিবে, তাহার পর ঐ মৃত্তিকা খুঁড়িয়া এক স্থানে ৩।৪টী বীজ রোপণ করিবে। যেস্থানে রৌদ্র উত্তমরূপে লাগে এরূপ স্থানেই ইহাকে রোপণ করা উচিত। যৎকালে বীজ রোপণ করিবে, তৎকালে যেন তাহা ২ অঙ্গুল মৃত্তিকার নিম্নে না যায়। যত দিন অঙ্কুর উৎপন্ন না হয়, ততদিন সন্ধ্যার সময় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল সেচন করিতে হইবে। চারা উৎপন্ন হইলে তাহার নিকট ৫।৬ খানি ডাল এবং কঞ্চি পুঁতিয়া দেওয়া উচিত। তাহা অবলম্বন করিয়াই গাছ উঠিতে থাকিবে। পরে মাচা বান্ধিয়া বা গৃহের চালে তুলিয়া দিতে হয়। জমি সরস রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা আবশ্যক। ২।৩টী সতেজ চারা রাখিয়া অপর গুলি তুলিয়া ফেলিবে।

কুষ্মাণ্ড—চাল কুমড়া, কুমড়া, পানি কুমড়া। ইহা রসযুক্ত সসার মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয়। যে মৃত্তিকায় বালির ভাগ অধিক, তাহাতে অধিক পরিমাণে সার মিশ্রিত করিয়া ইহা রোপণ করা কর্ত্তব্য। ইহার গাছের গোড়ায় জল বদ্ধ হইলে গাছ মরিয়া যায়।

চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাস ইহার বীজ রোপণের প্রশস্ত সময়।

এক হস্ত পরিমিত গর্ত্ত করিয়া সসার মৃত্তিকা দ্বারা তাহা পূরণ করিবে।

পরে কয়েক দিবস তাহাতে অধিক পরিমাণে জল সেচন করিবে। তৎপরে ৩।৪ দিন জল দেওয়া বন্ধ করিয়া, মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে, তাহা হস্ত অথবা অস্ত্র দ্বারা খনন করত চূর্ণ করিবে। আর ঐ মৃত্তিকা হস্ত দ্বারা সমতল করিয়া তাহাতে ৩।৪টী বীজ রোপণ করিবে। যতদিন অঙ্কুর বাহির না হইবে, ততদিন সন্ধ্যার সময় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল সেচন করা উচিত। চারা বাহির হইলে তাহার আশ্রয় জন্য কাটি পুঁতিয়া দিবে। তৎপরে চালে উঠিবার সুবিধা থাকিলে তাহাতে তুলিয়া দিবে, নচেৎ মাচা বান্ধিয়া তাহাতে উঠাইয়া দিবার উপায় করিবে। ইহা সুস্বাদু পবিত্র আহার্য্য বস্তু। ইহার ফল মৃত্তিকাস্পৃষ্ট না হইলে দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না।

গিমি কুমড়া। পলিযুক্ত চরভূমিতে ইহার আবাদ হয়। যে স্থানের জমিতে বালির ভাগ অধিক, তাহা ইহার আবাদ পক্ষে প্রশস্ত। অন্যত্র ইহার আবাদ করিতে হইলে সার ও বালির ভাগ সমান করিয়া, তদ্দ্বারা একটী গর্ত্ত পূরণ করত তাহাতে ইহার বীজ রোপণ করিবে।

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাস ইহার বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

যে স্থানে ইহার বীজ রোপণ করিবে, তথাকার জমি উত্তমরূপে দুই বার চাষ করিয়া ক্ষেত্র সমতল করিতে হইবে। তৎপরে ৩।৪ হাত অন্তর অন্তর চারিটী করিয়া বীজ রোপণ করিবে। পরে উহা কিঞ্চিৎ বড় হইলে ক্ষেত্রে যে সকল ঘাস জন্মিবে, তাহা একবার নিড়ান কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রে জল জমিলে সার নষ্ট হইয়া যায়; এজন্য যে স্থানে জল না জমিতে পারে, তথায় ইহার আবাদ করা উচিত। বৃষ্টির জল বাহির করিয়া দিবার জন্য জমিতে জোল কাটিয়া দিতে হয়। ইহার গাছ মৃত্তিকার উপর বর্দ্ধিত হইয়া প্রচুর ফল প্রদান করে।

মৃত্তিকা বিবেচনা করিয়া বাটীর নিকটস্থ স্থানেও ইহার বীজ রোপণ করা যায়। জমিতে সার দিয়া ইহার বীজ রোপণ করিয়া কয়েক দিবস জল সেচন করা কর্ত্তব্য। পরে চারা বাহির হইয়া ভূমির উপরই বর্দ্ধিত হয় ও ফল প্রদান করে।

কুষ্মাণ্ডের তুল্য ইহার স্বাদ ও গুণ এবং ইহা দীর্ঘকাল রাখা যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

গালার কারখানা।

গালার কুঠি বা কারখানা মানভূম জেলায় ঝাল্‌দে পূর্ব্বে ছিল ২০।২২টা, এক্ষণে ২৭।২৮টা আছে। দীর্ঘ-নগরে পূর্ব্বে ছিল ৬।৭টা, এখন ১৬।১৭টা আছে। মানকরে পূর্ব্বে ৩টী কুঠি ছিল, এক্ষণে তথায় একটীও নাই। সোণামুখীতে পূর্ব্বে অনেক ছিল, এখনও ৪০।৫০টা গালার কুঠি তথায় আছে। বাঁকুড়া জেলায় "মেজেয়" নামক স্থানে পূর্ব্বে ৮টা ছিল, এক্ষণে ১৬টা হইয়াছে। রঘুনাথপুরে পূর্ব্বে অনেক গালার কারখানা ছিল, এখন আদৌ নাই। ইহা ভিন্ন বলরামপুর, চাইবাসা, সাঁওতাল পরগণা, চাষ চটি, রাঁচি, তুলিন এবং মৃজাপুরে গালার কুঠি অনেক আছে। কলিকাতার ভিতরেও ২।৩টী গালার কারখানা আছে। ইহার অধিকাংশ কুঠি বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত, কেবল মাত্র কয়েকটী কুঠি ইংরাজ এবং হিন্দুস্থানী দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

গালার কারখানা বারমাস চলে। সঞ্চিত "বিউলী" কুঠিতে মজুত থাকে, তজ্জন্য বারমাস কারখানা চলে। নচেৎ প্রতি বৎসর ৩ বার "লা" উৎপন্ন হয়। বৈশাখী কিংবা জেটো-"লা" ইহা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়। আষাঢ়ে ফুকি লা হয় এবং আশ্বিন মাসে যে 'লা' হয়, তাহাকে রঙ্গিন—লা বলে। পলাশ এবং কুল প্রভৃতি বৃক্ষে যে লা পোকা উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা যে গালা হয়, তাহাকে রঙ্গিন গালা বলে। কুসুম গাছে যে গালা পোকা জন্মে, তদ্দ্বারা যে গালা হয়, তাহাকে কুসুমী গালা বলে। যেমন মানুষের গায়ে দাদ হয়, সেই-রূপ বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখায় দাদের মত পোকা হয়। ইহা স্বভাবেও হয় এবং সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য বন্যজাতিরা ইহার চাষও করে। লা কীটের বাসা ভাঙ্গিয়া উহার ভিতর যে সকল কীট থাকে। তাহা উড়িয়া যাইবার সময় "লা ফুকি" বলে। এই অবস্থায় পলাশ, কুল প্রভৃতি গাছে উহারা পূর্ব্বোক্ত ফুকি লা-কাঠি কাপড় জড়াইয়া বাঁধিয়া আইসে। তৎপরে গাছময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠির গাত্রে যেন দাদের মত হয়। সাঁওতালেরা উক্ত সকল শাখা প্রশাখা যুক্ত গালার কাঠি ভাঙ্গিয়া আনিয়া কুঠিয়ালদের বিক্রয় করে।

এই কাঠি সহিত গালা কীট থাকে বলিয়া, কাঠি বাদ দিয়া উহা লইতে হয়। এই কাজকে "কুত করা" কহে। ✓১ সের কাঠি শুদ্ধ লা ওজন করিয়া

অনুমান করা হয়, ইহাতে কাঠি কত পরিমাণ হইবে? ইহাকে "নজর কুত" বলে। সচরাচর নজর কুতে সের করা অর্দ্ধপোয়া, তিন ছটাক কাঠি বাদ যায়। এই হিসাবে মণের উপর কাঠি বাদ দিয়া আমরা ইহা সাঁওতালদিগের নিকট হইতে ক্রয় করি। কাঠি সহিত 'লা' কে "খারা-লা" বলে। নজর কুতে স্থির না হইলে শিল নোড়া দিয়া ভাঙ্গিয়া কাঠি বাহির করিয়া কুত করিতে হয়। সাঁওতালেরা "খারা-লা" যেমন বিক্রয় করে, তেমনই উহারাই কাঠি ভাঙ্গিয়া "খাঁটি লা"ও বিক্রয় করে। উহাদের বিক্রয়ের দর আমার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা ফলে আমি দেখিয়াছি "খারা-লা" নিম্ন দর ১৮৲ হইতে উচ্চ দর ৩২৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। এবং আমাদের বিক্রয়ের দর খাঁটি লা উর্দ্ধে ৩৫৲ হইতে নিম্নে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে দেখিয়াছি।

কাঠি ছাড়ান "খাঁটি-লা" র অপর নাম "বিউলী"; এই বিউলী প্রস্তুতের জন্য একদফা লোকের প্রয়োজন। ইহারা কেবল বৃক্ষশাখাকে থেঁতো করিয়া বিউলী বাহির করে। তৎপরে ইহাকে আতালে অর্থাৎ চৌবাচ্ছা-বিশেষে লইয়া গিয়া, তন্মধ্যে বিউলী রাখিয়া, যত বিউলী রাখা হইবে, তাহার একটা ওজন স্থির করিয়া উহার সঙ্গে সের-করা এক ছটাক হইতে অর্দ্ধপোয়া সাজিমাটী মিশাইয়া জল ঢালিয়া ইহাকে ঘসিতে হয়। এ কাজের জন্য অন্য এক শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন। ইহারা বিউলীর ধাত্ বুঝিয়া সাজিমাটী মিশায়, এবং ঘসিতে থাকে। ঘসার দরুণ বিউলীর আকৃতি ও বর্ণ পোস্ত-দানার ন্যায় স্বর্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়। চৌবাচ্ছার জলটা লাল হয়। ইহা থিতাইলে নিম্নে লালবর্ণের কঠিনাংশ পতিত হয়। পূর্ব্বে এই কঠিনাংশ লাল রং শুকাইয়া বাট বাঁধিয়া কলিকাতায় চালান দিতাম। ইহার বিদেশী গ্রাহক ছিল, সিপ্মেণ্ট হইত, রেলি ব্রাদার্স প্রভৃতি মার্চ্চেণ্টরা এই রং অনেক লইতেন। এখন মেজেণ্টার রং বাহির হইয়া ভারতের এই রংকে একবারে নষ্ট করিয়াছে। এখন ইহা দ্বারা আল্‌তা প্রভৃতি হয়, এবং জমিতে সার দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত পক্ষে এখন ইহাকে একরূপ ফেলিয়া দেওয়াই হয়।

পোস্তদানার মত স্বর্ণবর্ণের ঘসা বিউলী চৌবাচ্ছা হইতে তুলিলে, ইহার নাম পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এখন ইহাকে "যো" বলে। এইবার পশুরীর কথা। পশুরী শব্দটা শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে কোন প্রকার ওজনের পরিমাণ-বিশেষকে বুঝায়। অবশ্য তাহার বানান স্বতন্ত্র। সে পশুরীর বানান এইরূপ "পস্থরী।" এখানে পশুরী অর্থে বেট। আপনারা কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর রাস্তায়

জল দিবার কাপড়ের নল দেখিয়াছেন? ইহাও ঐরূপ মোটা কাপড়ের নল। ইহাও লম্বা ২০৷২২ হাত। মার্কিন মোটা কাপড়ে ইহা প্রস্তুত হয়। গালার কারখানায় এই নল ৩৷৪ বার ব্যবহারের পর নষ্ট হইয়া যায়, এবং প্রত্যেক বার ব্যবহারের পর ইহাকে সাজিমাটীর জল দিয়া কাচিয়া লইতে হয়। এই কাপড়ের নল তৈয়ারী করিবার জন্য দর্জ্জির সঙ্গেও এ কারখানার খুবই সম্বন্ধ আছে। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত যৌ চৌবাচ্ছা হইতে তুলিয়া উহার সঙ্গে রজন মিশান হয়। রজনের দর কম বলিয়া ইহা মিশাইয়া গালার পড়তা কম করা হয়। যেমন খাঁটি দুধ সহরে পাওয়া যায় না, সেইরূপ খাঁটি গালা কোন কারখানায় হয় না। কুঠীয়ালদিগের কারখানার স্বভাবের ইতর-বিশেষ হইলে রজন-মিশ্রিত করিবারও ইতর-বিশেষ হয়। গালা বিদেশী বণিকেরা লইয়া থাকেন। তাঁহারা সুসভ্য ইংরাজ প্রভৃতি জাতি। বেশী রজন দিলে ইহারা পূর্ব্বে ধরিতে পারিতেন না। কিন্তু দুধে জল দিলে যেমন ল্যাক্টমিটার দ্বারা ধরা হয়, গালায় রজন মিশান ধরিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব বেশী চালাকী এখন আর চলে না। তবু সের করা অর্দ্ধ ছটাক বা এক ছটাক রজন মিশান অবাধে হয়। ইহাই এখনকার খাঁটি গালা। রজনের দর মণকরা ৩৸৹, ৪৲ টাকা মাত্র। গালার বৈদেশিক বণিককে বিক্রয়ের দর উপস্থিত ৬০৲ টাকা মণ।

যৌ সকল পূর্ব্বোক্ত নলে রজন মিশাইয়া পূরিতে হয়। তৎপরে উনান করিয়া উহাতে কাষ্ঠের অগ্নি করিতে হয়। পাথুরে কয়লার আঁচে এ কাজ হয় না, জলন্ত অগ্নিতেও এ কাজ হয় না। কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া গিয়া যে আগুন হয়, সেই অগ্নির তাপে যৌ-পূর্ণ নলকে তাতাইতে হয়। ইহা এক শ্রেণীর লোকের কাজ। গালার কারখানায় এই শ্রেণীর লোকের বেতন অধিক। ইহাদিগকে "গালনদার" বলে। কলাগাছের খোলা এই শ্রেণীর কারখানায় খুবই প্রয়োজন। কলার খোলা বিছাইয়া রাখা হয়। যৌ অগ্নিতাপে নলের মধ্যে গলিয়া ক্রমে উহা কাপড়ের ছিদ্র দিয়া যেমন বাহির হইয়া আইসে, সেই সময় নলকে নিংড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত কলার খোলায় ফেলা হয়। কলার খোলার শীতলতা গুণে উত্তপ্ত গালা বাতাসার আকৃতিতে শীঘ্র শীঘ্র শীতল হয়, অথচ উহাতে আটকাইয়া যায় না। নচেৎ মাটীতে ফেলিয়া শীঘ্র না তুলিলে উহা মাটিতে আটকাইয়া যায়। কলার খোলায় ফেলিয়া এই যে গালা হয়, ইহাকে চাপড়া গালা কহে।

মৃজাপুর প্রভৃতি স্থানের কারখানাওয়ালারাও ঠিক এই নিয়মে গাল্লা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কলার খোলায় গালা গলাইয়া নিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারা টিন কিংবা তাম্রের যন্ত্র-বিশেষ (ইহাকে রোলার বলে) দ্বারা উহার উত্তপ্তাবস্থাতেই রুটি বেলার মত করিয়া ফেলেন। ইহাতে গালা খুব পাত্‌লা হয়। এই পাত্‌লা গালাকে "চাঁচ গালা" কহে। চাঁচ গালার দর পূর্ব্বোক্ত "চাপ্‌ড়া গালা" অপেক্ষা প্রায়ই মণকরা ১০৲ টাকা বেশী হয়। যৌ-পূর্ণ কাপড়ের নল তাতাইয়া নিংড়াইয়া সমুদয় গালা যে উহার ভিতর হইতে বাহির হয়, তাহা নহে। উহার ভিতর ময়লা-মাটী-পূর্ণ কিছু গালা থাকিয়া যায়। তাহাকে "নাদ" কহে। একমণ যৌ গলাইলে ৩০ সের গালা হয় এবং ।০ সের নাদ পড়ে। এই নাদ দ্বারা গালার চুড়ি ইত্যাদি খেলানা হয়। ঠিক দশ সের নাদও আদায় হয় না, কেননা কাপড়ের গায়ে এমন ভাবে অনেক নাদ থাকে যে, তাহা উঠে না, সাজিমাটী জলে ধৌত করিলে তবে উহা উঠিয়া যায়। এইরূপ /২ /২॥০ নাদ ২০।২২ হস্ত লম্বা বেটর গায়ে নষ্ট হয়। গালার নাদের মণ বড় জোর ১০৲ টাকা। প্রত্যেক কারখানায় ১০টা হইতে ৩০।৪০টা পর্য্যন্ত উনান জ্বালান হয়। ১০টা উনান জ্বালিলে ৫০।৬০ জন লোক চাই—অবশ্য সমুদয় শ্রেণীর লোক ধরিয়া ৫০।৬০ জন চাই। গালা তৈয়ারী হইলে, বড় বড় আম্র কাষ্ঠের প্রত্যেক বাক্সে তিন মণ গালা ধরে, এইরূপ বাক্স আমরা কারখানাতেই তৈয়ারী করাই; এজন্য ছুতার মিস্ত্রী, করাতি ইত্যাদিও রাখিতে হয়। কাষ্ঠের সঙ্গে আমাদের যখন নিত্য সম্বন্ধ, তখন কাজেই গাছ জমা লইতে হয়। বন জঙ্গলের নিকট ভিন্ন গালার কারখানা হওয়াই দুর্ঘট। গালার কারখানার সঙ্গে কাষ্ঠ বিভাগ না রাখিলে চলে না।

দশ হাজার টাকার কমে গালার কারখানা হয় না। দশ হাজার উর্দ্ধে যত টাকা ইচ্ছা খাটান চলে; কিন্তু অনেক লোক বিউলী ইত্যাদির কার্য্য করিয়াও প্রতিপালিত হইতেছেন। মধ্যে গালার কাজ মন্দা গিয়াছিল; এখন বেশ চলিতেছে। গ্রামের মধ্যে কয়েকটী গালার কারখানা থাকিলে, সে গ্রামের সমুদয় দুঃখী লোক ইহা দ্বারা প্রতিপালিত হয়; অনেকস্থলে ইহাও হইতেছে। কিন্তু একাজের গ্রাহক বিদেশী বণিক। নতুবা এদেশী লোকে গালার ব্যবহার এখনও শিক্ষা করেন নাই। যাঁহারা বলেন, এদেশী মাল বিদেশে গেলে দেশের সর্ব্বনাশ হয়, বাস্তবিক তাঁহারা ভুল বুঝেন।

বিদেশে গালার রপ্তানী বন্ধ হইলে, মানভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ হইয়া পড়িবে নিশ্চিত! ছুতার মিস্ত্রী, করাতি, দর্জি, জলের ভারি, দুঃখিনী বিধবা কামিনী (কারখানা ইহাদের কামিন্‌ বলে, ইহারা কাঠি হইতে বিউলী বাহির করে) এইরূপ গ্রামের মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর দরিদ্রের সম্বন্ধ এ কারখানায় নাই। ইহাদের সকলকেই রোজে খাটাইতে হয়, প্রত্যহ ইহাদের প্রত্যেকের বেতন তিন আনা চারি আনা মাত্র। কেবল গালনদারেরা এক মণ যৌ গলাইয়া কলার খোলায় ফেলিয়া দিলে আট আনা পায়। আমাদের যে টাকা খাটে, তাহা মহাজনের হইলে সুদ দিতে হয়।

মোটামুটি আমরা ১/০ মণ গালার উপর এইরূপ পড়তা ধরি।

জমা—		খরচ—	
ত্রিশ সের চাপ্‌ড়া গালা		১/৬ মণ খাঁটি লা	
উপস্থিত দর ৬০৲ হিসাবে		উপস্থিত দর	২২৲
	৪৫৲	গালনদার	॥০
নাদা /৭॥ সের		কুলি ৩ জন	৸০
১০৲ হিসাবে	১৸৵০	রজন /২॥	।০
বাদ জল্‌তি /২॥		কাষ্ঠের কয়লা	।০
আদায় ১/০ মণ	৪৬৸৵	সাজিমাটী /২॥	৵০
খরচ বাদ	৩০৲	পশুরী তৈয়ারী থান ১টা	৪৲
মুনফা—	১৬৸৵০	গমস্তা ইত্যাদির বেতন	১৲
		কারখানার বাটী ভাড়া (পল্লিগ্রাম বলিয়া)	॥০
		বাক্স ১টা	৵০
		টাকার ব্যাজ ১ মণে	৵০
		ট্যাক্স, খাজনা, গাছ জমা প্রভৃতি মণকরা	।৵০
			৩০৲

এক মণে ১৬৸৵০ উপস্থিত বাজারে লাভ হইলেও ইহাতে এখনও রেলভাড়া এবং কলিকাতার আড়তদারী ইত্যাদি খরচ আছে। কিন্তু গালার কাজে রাতারাতি বড়লোক এবং ফকির হইতে হয়। কেন না, সময়ে গালার মণ

৫৲ টাকা হইতে ১৩৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে, আমরা দেখিয়াছি। এই কারখানায় ৭।৮ জন বেতনভোগী কর্ম্মচারী রাখিতে হয়, অন্যান্য লোক ঠিকায় বা রোজে পাওয়া যায়।

শ্রীহরিদাস দত্ত।

মানকর।

বায়স্কোপ্।

আজ ৪।৫ বৎসর হইল, বিদেশ হইতে এক প্রকার ছায়াবাজীর বাক্স এদেশে আনীত হয়। রাত্রিকালে কাপড় টাঙ্গাইয়া এই বাক্সের ছবি দেখান হয়। ছবিগুলি ফটোগ্রাফি এবং উহা নড়িতে চড়িতে থাকে। ইহাকে বায়স্কোপ বলে। ইহার ছবি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। উক্ত যন্ত্রের বাক্স অন্যবিধ প্রণালীতে গঠিত, দ্রব্যটি কিন্তু একবিধ। ইহাকে সিনামটোগ্রাফ বলা হইল। দেখিতে দেখিতে এই সজীব চিত্রিত ছবি লৌহ-নির্ম্মিত বাক্সে এবং একটী ষ্ট্যাণ্ডের উপর রক্ষিত হইয়া, প্রায় পাড়ায় পাড়ায় ঘর ভাড়া করিয়া এইরূপ কতকগুলি বাক্স এক ঘর রাখিয়া বাজী দেখান হইতে লাগিল। এই বাক্সের বাজী দেখা জন্য কাপড় টাঙ্গাইতে হয় না, একটী ডবল পয়সা ইহার গর্ত্ত-বিশেষে নিক্ষেপ করিয়া এই যন্ত্র-পাত্রস্থিত একটা হ্যাণ্ডেল ঘুরাইলেই পয়সাটী যেমন সরিয়া পড়ে, তৎসঙ্গে সশব্দে উহার ভিতর একটা আলোক বাহির হইয়া ছবি দেখা যায়। অদ্যাপি এ শ্রেণীর বাক্স রেলওয়ের ষ্টেসন-বিশেষে রাখা হইয়াছে। কলিকাতায় এই যন্ত্রের উন্নতি অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রসারিত হইল। বাস্তবিক ইহা দেখিতেও অত্যাশ্চর্য্য।

প্রাচীন ইতিহাস আমাদের এই কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যে, ভারতবর্ষ মনোবিজ্ঞানে বা ধর্ম্মবিজ্ঞানে অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এদেশী লোক ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন; ইহাদের রচিত বেদান্তদর্শন গ্রন্থে কত যুগাযুগান্তর পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, এ জগৎ ভ্রম; মানুষের কথা কওয়া, চলা ফেরা, সবই ভ্রম; মানুষের খাদ্য ভ্রম, খাওয়া ভ্রম, সবই ভ্রম; এ জগৎ ছায়াবাজী, কিছুই স্থায়ী নহে। প্রত্যহ রূপের পরিবর্ত্তন, নিত্যই নূতন।

অথচ সবই আছে, সবই যায় ; সবই থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতবর্ষের বেদান্তদর্শন উন্নতির চরম সীমায় ঠিক যে পর্য্যন্ত উঠিল, পাশ্চাত্য প্রদেশ জড়বিজ্ঞান লইয়া বরাবর আলোচনা করিয়া ঠিক সেই পর্য্যন্ত উন্নতির চরমে উপনীত হইল। এই জন্য আমরা ইহাকে "সচিত্র সজীব বেদান্ত দর্শন" নাম দিতে পারি।

লোকে বলে ইহা ইলেক্‌ট্রিকে হয় ; বস্তুতঃ বায়স্কোপের সঙ্গে বিদ্যুতের অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রিকের কোন সম্বন্ধ নাই। একটা লৌহ জারে কেমিষ্টের মতানুসারে অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয় এবং এই জারের গাত্রস্থ রবারের নল দ্বারা উক্ত বাষ্প অন্য পাত্রে (ইহাও একটা বাক্সবিশেষ) সংগ্রহ করা হয়। এই বাক্স হইতে রবারের নল দ্বারা সংগৃহীত অক্সিজেন ব্যয় করা হয়। যথায় ইহা ব্যয়িত হয়, এক্ষণে তাহার কথা বলি।

ফটোগ্রাফের ক্যামেরা, যাহা দ্বারা পর্ব্বত, বন, নদ, নদী প্রভৃতির ফটো লওয়া হয়, সেই ক্যামেরা বা ছবি তুলিবার বাক্সের মুখে একটা ছাদের নলের মত চোঙ্গ থাকে। এই চোঙ্গের মুখে একখানা গোলাকৃতি মোটা কাচ আঁটা থাকে, ইহাকে লেন্স বলে। চোঙ্গে লেন্স রাখিবার কারণ এই যে, নদ নদীর ফটো তুলিবার সময় মানুষের ছবি তুলিবার মত ত বলা যায় না যে, আপনি সরিয়া আসুন, বা কিছু দূরে যাউন ; কেন না, নদ নদী, বন সরিবার পাত্র নহে। উহার ছবি ছোট বড় করিতে হইলে, সেই চোঙ্গ সরাইয়া ছবি ছোট বড় করা হয়। এই উদ্দেশ্যে এই শ্রেণীর ক্যামেরাতে উক্ত চোঙ্গ রাখা হয়। বায়স্কোপের ক্যামেরাতেও উক্তভাবে লেন্স আঁটা একটা চোঙ্গ আছে, তাহাতেও একখানি মোটা কাচবিশেষ বা লেন্স আঁটা আছে। ইহার বাক্সে ফটো ক্যামেরার মত চারি দিকে দেয়াল নাই। ইহার দুই পার্শ্ব এবং মস্তক খোলা ; তজ্জন্য যাঁহারা এই ছবি দেখান, তাঁহাদের দিকে খুব আলো থাকে। তাঁহারা আলোয় কাজ করেন। এই বাক্সের ঠিক মধ্যস্থলে একটী লৌহ শলাকা থাকে। এই শলাকায় একখণ্ড শুষ্ক চূণ আবদ্ধ করা হয়। এই চূণখণ্ড ইংরাজদের মণিহারী দোকানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ইহার আকৃতি গুলিসূতার বাণ্ডিল যেমন গোলাকার হয় এবং উহার মধ্যস্থলে যেমন গর্ত্ত আছে, এই চূণখণ্ডেরও মধ্যস্থলে তদ্রূপ গর্ত্ত আছে। এই গর্ত্ত শলাকায় বিঁধাইয়া উহাতে আবদ্ধ করা হয়। যাঁহারা এই ছবি দেখান, তাঁহাদের নিকট এই চূণখণ্ড অনেক রাখা হয় ; কেন না,

মধ্যে মধ্যে ইহা পুড়িয়া গেলে, উহাকে বদলাইয়া দেওয়া হয়। এই চূণ খণ্ডকে "লাইমষ্টোন" বলে। শলাকায় বিদ্ধ লাইমষ্টোনের নিম্নে একটা স্পিরিট ল্যাম্প থাকে। এই ল্যাম্পের অগ্নিশিখা চূণখণ্ডকে দগ্ধ করিতে থাকে, এজন্য উক্ত চূণখণ্ড তাতিয়া বা দগ্ধ হইয়া লোহিতবর্ণ হয়। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সংগৃহীত অক্সিজেন বাষ্প রবারের নল দ্বারা বাহিত হইয়া নলের মুখে সংলগ্ন পিত্তল-নির্ম্মিত একটী বাঁকনল হইতে বাহির হইয়া, যেমন চূণখণ্ডে অক্সিজেন লাগিতে থাকে, তৎক্ষণাৎ উহা হইতে ইলেক্‌ট্রিকের আলোর মত উজ্জ্বল আলো বাহির হয়। এই আলোর এত তেজ যে, তাহার দিকে চাওয়া যায় না। ইহার ছায়া পড়ে না। এই আলো অভ্র-ভেদী হইয়া দর্শকের চক্ষুতে উপস্থিত হয়। এই আলো দেখিয়াই লোকে অনুমান করে, বায়স্কোপের সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিকের সম্বন্ধ আছে। যাহা হউক, এক্ষণে ছবির কথা বলা যাউক।

মাছ ধরিবার হুইল দেখিয়াছেন? ঐরূপ হুইলে, পথমাপা ফিতার মত অভ্রের ফিতা আছে। এই ফিতায় তিন সারি বা চারি সারি দিয়া মক্ষিকার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফটোর ছবি সাজান আছে। যাহা হউক, এই ফিতা পূর্ব্বোক্ত হুইলে জড়ান। ছবির দীর্ঘতানুসারে ফিতার দীর্ঘতা হয়, কোন ফিতা ১৫০ হস্ত, কোনটী বা ৭০০ হস্ত ইত্যাদি। ছবির প্রয়োজনীয়তা এবং ফিতার দীর্ঘতানুসারে ইহার মূল্যের তারতম্য হয়; কোন ফিতা ১০০, কোন ফিতা ৩০০ টাকায় বিক্রয় হয়। এদেশে এতদিন ইহা প্রস্তুত হইত না, সম্প্রতি এই ফিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদি কলিকাতায় আসিয়াছে। এই ফিতার জন্য স্বতন্ত্রভাবে ফটো লইতে হয়। ইহার ফটো লইবার ক্যামেরা স্বতন্ত্র। ইহার জন্য যখন যে বিষয়ে ফটো লইতে হয়, সেই বিষয়টী সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্যামেরার মুখ খোলা রাখিতে হয়। মনে করুন, সার্কাসের বা থিয়েটারের কোন অঙ্ক বায়স্কোপে দেখাইতে হইলে, সেই অঙ্ক শেষ হইতে যতক্ষণ সময় লাগিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্যামেরা খোলা রাখিয়া নেগে-টিভ লইতে হইবে। তৎপরে উহাকে লক্ষ লক্ষ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ঐ ফটো ফিতায় তুলিবে। প্রত্যেক ফিতায় নির্দ্দিষ্ট এক বিষয়ের ফটো থাকে। অভ্র-বিশেষ দ্বারা এই ফিতা প্রস্তুত হয়। কেন না, অভ্র কাচের মত স্বচ্ছ এবং তাহাকে হুইলে জড়াইবার উপযুক্ত করা যায়। পূর্ব্বোক্ত চূণ এবং অক্সি-জেনের আলোক এই ফিতা ভেদ করিয়া ইহার উপরিস্থ ফটোকে ভাসাইয়া

লইয়া গিয়া দর্শকের সম্মুখস্থ দৃশ্যপথরূপ বস্ত্রখণ্ডে উপস্থিত হয়। প্রত্যেক বিষয়ের ছবি প্রত্যেক হুইলে জড়ান থাকে, এই জন্য এক বিষয় দেখান হইয়া গেলে, হুইল বদ্‌লাইতে হয়, কাজেই ইহা সময়-সাপেক্ষ। এই সময় ষ্ট্যাণ্ডার্ড পিক্‌চর বা স্থায়ী ছবি, যেমন একটা পাখী, গরু বা অমর দত্ত প্রভৃতির ছবি দিতে হয়।

বায়স্কোপ যন্ত্রের যথায় লেন্স আছে, ঐ লেন্সের মস্তকোপরি একটা শিকে এই হুইল আট্‌কাইয়া রাখা হয়। পরন্তু বায়স্কোপ যন্ত্রের গাত্রে দুইটী চাকা আছে, এই চাকার হ্যাণ্ডেল্ আছে। হুইলের ফিতার সঙ্গে এমন ভাবে এই চাকাদ্বয়কে সংযোজিত করা হয় যে, একখানি চাকা এক ব্যক্তি ঘুরাইলে, হুইল হইতে ফিতা খুলিয়া আসে, এবং অপর চাকাখানি অন্য ব্যক্তি ইহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইয়া এই খোলা ফিতা অন্য হুইলে জড়াইয়া দেয়, অর্থাৎ এই ছবি দেখাইবার সময় দুইজন লোককে পরিশ্রম করিতে হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি হস্তস্থিত হুইলে ছবির ফিতা জড়ায়। ইহার সঙ্গে আর একটী কাজ হয়; তাহা এই যে, বায়স্কোপ যন্ত্রের লেন্সের মুখে একখানি অর্দ্ধচন্দ্রাকার পিত্তল-নির্ম্মিত হুইল আছে। শেষোক্ত ব্যক্তি চাকাখানি ঘুরাইয়া যেমন ছবির ফিতা জড়াইতে থাকে, সেই সঙ্গে এই অর্দ্ধচন্দ্রাকার চাকাখানিও সজোরে ঘুরিতে থাকে, এই জন্য একটী শব্দ হয়। একজন চাকা ঘুরাইয়া ছবি খুলিয়া লেন্সের ভিতর দিয়া তাড়াতাড়ি লইয়া আইসে, ইহাতে ফিতার ক্ষুদ্র ছবি উক্ত লেন্স বা কাচের গুণে বড় হয়; পরন্তু সে ফটো বিশৃঙ্খল, কোথাও হাত, কোথাও ধড়, ইত্যাদি। অর্দ্ধচন্দ্রাকার হুইলখানি আলোক এবং ছবি বাহির হইবার পথে দাঁড়াইয়া সজোরে ঘুরিয়া ছবির বিশৃঙ্খলতা ঘুচাইতে গিয়া ছবিকে সজীব করিয়া তুলে। এই চাকাখানি বিশৃঙ্খলরূপে ঘুরাইলে অর্থাৎ যাঁহার এ কাজে অভ্যাস নাই, এমন নূতনলোকে ইহা ঘুরাইলে, চাকাখানি সজোরে ঘুরিবার সময় কাঁপিতে থাকে। এই জন্য বাহিরে দর্শকের চক্ষুর উপর সজীব ছবি প্রকাশ হইয়া কাঁপিতে থাকে।

দর্শকের সম্মুখে যথায় ছবি আইসে, সে স্থানটী মোটা কাপড়। উক্ত বস্ত্রে মধ্যে মধ্যে জলের পিচ্‌কারী দিয়া উহার সচ্ছিদ্র পথ বন্ধ করিলে ছবির স্পষ্টতা সুন্দর প্রকাশমান হয়। এই জন্য বস্ত্রে জল দেওয়া হয়।

শ্রীঃ—

জাহাজী কাজ।

সিপ্‌মেণ্টকে আমরা জাহাজী কাজ বলিলাম। ইহা দুই প্রকার। প্রথমতঃ বিদেশ হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া মাল এদেশে আইসে, ইহাকে বাঙ্গালায় আমদানীর কাজ এবং ইংরাজীতে ইহাকে ইম্‌পোর্ট কহে। দ্বিতীয়তঃ এদেশী মাল জাহাজে করিয়া বিদেশ যাত্রা করে, ইহাকে বাঙ্গালায় রপ্তানী এবং ইংরাজীতে "এক্সপোর্টের" কাজ কহে। এদেশী মাল যত বিদেশে যায়, তত ভাল, ইহা আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি। দেশের শ্রীবৃদ্ধি এই কাজেই হইয়া থাকে। এদেশী যে দ্রব্য বিদেশে যায় না, তাহার আদর নাই, সে কাজেরও আদর নাই। এদেশী যে দ্রব্য বিদেশে যায়, সে দ্রব্যের জন্য এদেশের শত শত লোক প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্যই এদেশে বড় বড় আফিস হইয়াছে; নচেৎ দেশের শ্রীবৃদ্ধি কিছুই থাকিত না। কেবল কলিকাতা বা মান্দ্রাজ, মুম্বাই বলিয়া নহে; ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মন, অষ্ট্রেলিয়া, কোন দেশেরই তাহা হইলে আদর থাকিত না। বিদেশের বড় বড় নাম যাহা শুনা যায়, তাহা কেবল ঐ সকল দেশের দ্রব্য বাহির হইয়াছে বলিয়াই উহাদের বড় নাম, বড় গৌরব। এই কাজের জন্যই ভারতবর্ষের বৃক্ষপত্র এবং বৃক্ষ ফেঁস বিক্রয় করিয়া কত লোক কোটী কোটী মুদ্রার বাণিজ্য চালাইতেছে। এদেশী যে সকল মাল বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহাতে দেশের লোক কিছু না কিছু পায়। জিনিসের কাট্‌তি বৃদ্ধি হইলেই তাহার গৌরব বৃদ্ধি হয়; তাহাতে মানুষেরও উন্নত অবস্থা হয়, যাহা দশজনে চাহে। মালেও তাই। এক একখানি বিদেশী জাহাজ বড় ছোটখাট নহে, কোন কোন জাহাজে ১ লক্ষ মণ, কোন কোন জাহাজে দেড় লক্ষ মণ মাল বোঝাই হয়। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের ব্যবহার্য্য সমুদয় দ্রব্য ওজন করিলে যাহা হয়, বোধ হয় প্রত্যেক জাহাজে তাহা অপেক্ষা মাল অধিক বোঝাই হয়। অতএব এত মাল এদেশ হইতে যায়। যে মাল যায়, তাহার গৌরব হয়, কাজেই রপ্তানীর কার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি।

তাহার পর আমদানীর কাজের কথা। ইহা জুয়াখেলার মত কাজ। কাপড়ের কাজই বলুন, লোহের কাজই বলুন, হার্ডওয়্যারের কাজই বলুন, এবং চিনি প্রভৃতি আমদানীর যে কোন কাজই বলুন, আমাদের বিশ্বাস,

ইহা জুয়াখেলার কাজ। পথের ধারে কুপন খেলা হয়, দেখিয়াছেন? কতকগুলি জুয়াচোর, পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে যেন জানা শুনা নাই, সেও যেন পথিক, এইরূপ ভাবে যদি তাহারা তোমাকে আমাকে পায়, তাহা হইলে এমন ভাবে খেলে যে, প্রথমটা ২।১ বার বাজী জিতাইয়া দিয়া বলে "আবার খেল" লোভ লাগাইয়া দেয়; শেষে যাহা তুমি জিতিয়াছিলে, তাহার চতুর্গুণ দণ্ড দিয়া আসিতে হয়। তবু লোকে এ কাজ করে। আমদানীর কাজও তাই। এদেশী লোকের জাতিটা হাঁড়িতে। বিদেশে গেলে জাত যাবে। এখন যেন ২।১০ জন বিদেশে যাইতেছেন, তাহাতে দেশ রক্ষা হয় না এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্যও স্বতন্ত্র। ব্যবসায় জন্য এদেশী লোক বিদেশে কত জন যাইতেছেন? মুম্বাই, মান্দ্রাজের যে কয়জন গিয়াছিলেন, তাঁহারা ধনবানও হইয়াছেন। আমদানীর কাজে ক্ষতি হইবার একটা প্রধান কারণ, আমরা সে দেশের সংবাদ রাখি না। আঁধারে নাচিতে থাকি; কিন্তু তাহা দেখে কে? প্রায়ই গর্ত্তে পড়ি! বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা এদেশে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মনে সে দেশ এবং এদেশের ছায়া রহিয়াছে। আমাদের নিকট কেবল এদেশের ছায়া। ইহা একটী আমাদের মস্ত অভাব। এই অভাব পূরণের উপায় কি?

এদেশী ব্যবসায়ী মাত্রেরই ইহা বুঝা উচিত যে, অধিক মাল এদেশে আসিতে দিব না। এদেশের যেমন ক্ষুধা, সেইমত দ্রব্য দিতে হইবে। কিন্তু বৈদেশিক মহাজন ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী নিশ্চিত! কেন না, তাঁহাদের দুই লক্ষ মণী জাহাজ ভারতে ঘন ঘন পাঠাইতে হইবে; খালি জাহাজ না আইসে, সে চেষ্টা অবশ্য তাঁহারা প্রাণপণে করিবেন। এদিকে তোমাদের উচিত, উহা বুঝিয়া যাহাতে তোমাদের দেশের ক্ষুধার অতিরিক্ত মাল না আইসে, তাহার চেষ্টা বিধিমতে করা। যদি ইহা না কর, যদি আমাদের কথা না শুন, তাহা হইলে তোমাদের পাপেই যে ভারতবর্ষ নষ্ট হইবে এবং হইতেছে, তোমাদের পাপেই যে ভারতে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে এবং হইবে, তাহা নিশ্চিত!

সে কি মহাশয়! বলেন কি? দেশের ক্ষুধার অতিরিক্ত মাল আসিতেছে কি না, তাহা কিরূপে বুঝিব? বুঝা খুব সহজ। উদাহরণ দিতেছি। এই চিনির কাজ। বাজার নরম। গ্রাহক নাই। ক্ষতি হইতেছে। আমদানী অল্প আছে। ক্রমে আরও অল্প হইল, ক্ষুধার কম মালে পড়িল। গ্রাহক

চাহিল, আর কিছু দিউন, ক্ষুধার শান্তি হয় নাই। তুমি দিলে, ভাবিলে বাজার চড়িল। অন্যান্য দশজন দোকানদ তোমার সঙ্গে তারস্বরে চীৎকার করিল, বাজার তেজ। ইহা করা অ. নহে, কেন না তাঁহাদের ক্ষতির জন্য প্রাণান্ত হইতেছিল। বাজার চড়িল। তামার নিকট আগামী ৪।৫ দিন মধ্যে এক জাহাজ আসিবে, এবং এইরূপ প্রত্যেক মা. র সিপে মাল ক্রয় করা আছে, তাহা এখনও বিক্রয় হইল না, কেবল ঘরের মাল বিক্রয় হইল, অথবা আগামী সিপের মাল যাহা ৪।৫ দিনে আসিবে, তাহাও না হয় বিক্রয় হইল। এমন সময় দালাল জুটিল। তাহারা বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। মহাশয়! বাজার চড়িতেছে, এই সময় আগামী ৪।৫ দিনের মধ্যে সিপ্ যাহা আসিবে, তাহাত বিক্রয় করিয়াছেন; অতএব উহার পর যে ষ্টীমার আসিবে, তাহাতে কিছু মাল আনাইবেন। চড়ার মুখে দোকানদার ভাবে, বুঝি এইরূপ বিক্রয় বার মাস হইবে। কাজেই তাহার মন নরম হয়, দালালদের কথা শুনিয়া বসে। ইহারা অন্যায় কাজ করে, বুঝে না যে, ইহাতে দেশের এবং নিজের কত অনিষ্ট করিলাম। কথাটা ভাল করিয়া বুঝুন।

একখানা জাহাজ ৪।৫ দিন পরে আসিবে, অপর একখানা ১৫।১৬ দিন পরে আসিবে। এইরূপ পর পর জাহাজ আসিবে। ঐ সকল পর পর জাহাজে পর পর লোকের সওদাও আছে। হরির মাল ১৫ই আসিবে, শ্যামের মাল ৪ঠা আসিবে। ৪ঠা যাহা আসিবে, শ্যাম তাহা বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া হরির মাল দালালেরা শ্যামকে গতাইল। এইবার হরিকে পুনরায় মাল ক্রয় করিয়া দিল। ফলে ১৫ই তারিখে কেবল হরির মাল আসিত; এক্ষণে এই কাণ্ড হইয়া রহিল যে, সেই দিনই হরি এবং শ্যামের এই উভয়েরই মাল আসিয়া পড়িল; এক গুণের স্থানে, দুইগুণ মাল আসিল। কাজেই বাজার পড়িয়া যায়, ক্ষতি হয়। এই উপায় দ্বারা দেশে মাল অধিক কি কম আসিল, বেশ বুঝা যায়। কোন্ মাল দেশে কম বা বেশী আছে, তাহা দরেই বুঝা যায়।

বিলাতি শণের চাষ।

(৩)

নেপ্‌লস্ প্রদেশে শণকাটী হস্ত দ্বারা শণ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথকীকৃত হয়। উপরোক্ত কর্ম্মকারী লোকেরা শক্ত কাঠের দুইটী বিম বা (কাঁড়ি) ব্যবহার করিয়া থাকে। এই দুইটী কঠিন কাষ্ঠের মধ্যে একটী দৃঢ়-সংলগ্ন, অন্যটী সঞ্চরণশীল। এই দুইটী কাষ্ঠের মধ্যে শণ স্থাপন করিলে শণকাটী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, শণকাটীগুলি পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে, কেবল মাত্র সূক্ষ্ম তন্তুগুলি রহিয়া যায়। এই কার্য্য অতি কঠিন এবং দুরূহ, এইজন্য ইহা সম্পন্ন করিতে অধিক সময় আবশ্যক করে। লেভার বা ভার পরিমাণ দণ্ড ২৫ কিলোস পরিমাণ ওজনে হয়,—২৫ কিলোসের ইংরাজি পরিমাণ এক কোয়ার্টার। শণকাটী বাহিরকারীরা ১২ ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করিয়াও ৫৫ কিলোসের বেশী পরিমাণ শণের সূক্ষ্ম তন্তু উৎপন্ন করিতে পারে না।

কেবলমাত্র উপরোক্তি উপায়েই যে শণ পরিষ্কৃত সম্পূর্ণরূপে হইয়া থাকে, তাহা নহে। ইহা পরিষ্কার করিতে আরও অনেক প্রণালীমত কার্য্য করিতে হয়। এই কার্য্যের পর শণকাটী বাহিরকারীরা পিটুনি যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা শণগুলিতে আঘাত করিতে থাকে। এইরূপেই শণ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয়। সচরাচর ১৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া উহারা ৩ লায়ার (ইং ৩ শিলিং) উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে উহারা কল দ্বারা শণকাটী বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তদ্ধেতু হান্‌গারি এবং ফ্রান্স হইতে বোলগনা এবং ফেরারা প্রদেশ সমূহে যে সমস্ত কল ব্যবহৃত হইত, তাহা তাহারা আনয়ন করিয়াছিল; কিন্তু দুঃখের মধ্যে ফল বিপরীত ঘটিয়াছিল। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে নূতন কলের আমদানী হওয়ায় অনেকে তাহার ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু কোনরূপ কলের দ্বারা আশানুরূপ ফল ফলে নাই। তাহাতে হয়ত শণ বেশী রকম নষ্ট হইত, নয় শণ অত্যন্ত কম পরিমাণে হইত; কেন না কম শণের দ্বারা বৎসরের মধ্যে তিন মাস কর্ম্মোপযোগী করিবার জন্য যে খরচ হইত, তাহা সরবরাহ হইত না।

যে যে প্রদেশে শণ উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্থানে একটা ভয়ানক কু-প্রথা প্রচলিত আছে। সেই কু-প্রথা এই—

উৎপাটিত শণের কিয়দংশ শণের মস্তকে বা শিকড়ে সংস্থাপন,—এই হস্ত-

কৃতকর্ম্ম শণকাটী-বাহিরকারীরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। শণের সমান দরে এই উৎপাটিত অংশ বিক্রয় করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমস্ত উৎপাটিত অংশ (যাহা পূরক দ্রব্য বলিয়া অনুমেয়) দ্বারা সচরাচর শণ পরিষ্কার করিবার পিন ভাঙ্গিয়া যায়, ইহাতে উপরোক্ত সামান্য লাভ-সূচক পূরক দ্রব্য অপেক্ষাও ক্ষতির পরিমাণ বেশী রকম লক্ষিত হয়। অতএব এইরূপ কাজের প্রশ্রয় দেওয়া সম্পূর্ণ বিগর্হিত।

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, এই সমস্ত উৎপাটিত শণের পরিমাণ শতকরা ১ মাত্র অর্থাৎ ১০,০০০ কিলোসে ১০০ কিলোস হইয়া থাকে। এই সমস্ত অপরিষ্কৃত শণ লম্বাতন্তু-বিশিষ্ট হইয়া থাকে; এবং উহার ১০০ কিলোসের দাম ৬০ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ ইংরাজী ১ হানড্রেটওয়েটের দাম ২৫ শিলিং মোটামুটি হিসাবে শণের মূল্য ৮০ ফ্র্যাঙ্ক বা ৩৩ শিলিং। অতএব হস্তকৃত কর্ম্ম দ্বারা লব্ধ উপায় শতকরা এক-চতুর্থাংশ মাত্র।

অন্যপক্ষে তন্তুবায়েরা সম্পূর্ণরূপে বলিয়া দিতে পারে, ইহা তাহাদের পক্ষে কত ক্ষতিজনক!—

এই অপরিষ্কৃত শণের উন্নতিকল্পে কিংবা একবারে বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন চেষ্টাই এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু ইহা কেমন একটা সাধারণ রীতি বা পদ্ধতি হইয়া পড়িয়াছে যে, এরূপ পদ্ধতি বিলোপ করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

ফ্রেটামেপিয়োর এবং য্যাফ্রেনোলা প্রদেশের লোকেরা হস্ত দ্বারা শণ আঁচড়াইয়া বা পরিষ্কার করিয়া থাকে এবং এই আঁচড়ান বা পরিষ্করণ প্রণালীকে ইংরাজিতে হ্যাণ্ড হেকলিং বলে। ইহার দ্বারা দুই রকম শণ উৎপন্ন হইয়া থাকে,—

(১) রপ্তানি করিবার নিমিত্ত সজ্জিত শণ।

(২) ইতালি প্রদেশে হস্ত দ্বারা বুননার্থ সজ্জিত শণ।

রপ্তানি করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত শণকে স্পোনটিটি বলে। ইহাতে রসারসি প্রস্তুত বেশ সুচারুরূপে হইয়া থাকে। অপরিষ্কৃত শণকে পুনরায় আঁচড়ান হয় এবং সরু শণতন্তুগুলি শণের লাইনের সঙ্গে সংযোজিত হইয়া থাকে।

ছোট তন্তুশূন্য স্পোনটিটিও রপ্তানি হয়; সচরাচর স্পোনটিটি অপেক্ষা শতকরা ২।৩ টাকা বেশী মূল্যে বিক্রীত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামময় পিরি।

আধুনিক চিনির কণ্ট্রাক্ট।

(২)

৫ম কথা—সিপ্‌মেণ্ট বা চালান সম্বন্ধে।

যে চালান খরিদ করা হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া কণ্ট্রাক্টে লেখা থাকার বিশেষ দরকার। Time extension বা সময় বৃদ্ধি বিক্রেতাকে কোনও ক্রমে দেওয়া উচিত নহে। কারণ, যখন দূর আমদানীর সওদা হয়, তখন যে সময়ে চালান দিবার কথা হয়, সেই সময়েরই উল্লেখ থাকা উচিত। সময় বৃদ্ধির কথা বিক্রেতারা কেবল নিজের সুবিধার্থ লিখাইয়া লইয়া থাকে। ফলতঃ দৈব দুর্ঘটনা, যথা—কল হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেলে এবং তজ্জন্য চিনি তৈয়ারি হইতে দেরি হইলে, জাহাজ চড়ায় আটকাইয়া গেলে বা জলে ডুবিয়া গেলে, বা যে কোন যুদ্ধ বা বিপ্লবে পথ বন্ধ হইয়া জাহাজ না আসিতে পারিলে, ধর্ম্মঘটবশতঃ মাল সম্বন্ধে যে কোনও গোলযোগ হইলে, তাহার জন্য ক্রেতাকেই দায়ী হওয়া চাই। কণ্ট্রাক্টে সে সব দায়িত্ব হইতে বিক্রেতা মুক্ত থাকেন; কিন্তু ক্রেতারা কিজন্য ঐ সব দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লয়েন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। এ দোষ বিক্রেতার নহে—ক্রেতার।

আর উক্ত clause বা স্বত্বটী থাকায় বিক্রেতারা অনেক সুযোগ পায়। বাজার চড়া পড়া অনুসারে বিক্রেতা নিজের সুবিধা চেষ্টা করিতে পারে এবং কোনও কোনও বিক্রেতা এইরূপ সুবিধার ফলভোগ করিয়াও থাকে। অতএব শুদ্ধ কোন্ মাসে বা জাহাজে বোঝাই হইবে, তাহাই স্পষ্ট লিখাইয়া লওয়া উচিত। ইংরাজীতে গুটীকতক এমন ছোট কথা আছে, যাহার মানে প্রকাণ্ড গোছের বা তাহার মানের পরিণাম-ফল প্রকাণ্ড গোছের। But, if, owing to, unavoidably, for, similar ইত্যাদি অনেক কথার পরিণাম ফল ঐরূপ প্রকাণ্ড গোছের। দৈব দুর্ঘটনার দরুণ সময় বাড়াইতে হইলে কিম্বা সিপ্‌মেণ্টের কতক অংশ যে কোনও রূপেই হউক নষ্ট হইয়া গেলে এবং উক্ত মাল না পাইবার দরুণ ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বিক্রেতার নিকট হইতে কোনও difference claim করিতে পারিবে না। বাঃ! কি চমৎকার clause! যে সব কণ্ট্রাক্টে এরূপ clause আছে, সেই সব কণ্ট্রাক্ট মহাজনদিগের গদির ত্রি-সীমায় আনিতে দেওয়া কোনও ক্রমে উচিত নহে।

।৬ষ্ঠ কথা—নিষ্পত্তি বিষয় অর্থাৎ মালের quality র ইতরবিশেষ হইলে বা কণ্ট্রাক্টের কোনও স্বত্বের খেলাপ হইলে, সেই খেলাপ নিষ্পত্তি করিবার জন্য সালিশী অমুক করিবে, এইরূপ লেখা থাকে। কিন্তু অধিকাংশ কণ্ট্রাক্টে লেখা থাকে যে, কোনও ইউরোপীয় মহাজন বা দালাল নিষ্পত্তি করিবে, এবং তাঁহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হইলে তাঁহাদের উভয়ের দ্বারাই নিয়োজিত ইউরোপীয় মধ্যস্থ দ্বারাই নিষ্পত্তি করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত খারাপ নিয়ম। যে সব কণ্ট্রাক্টে এইরূপ স্বত্ব লিখিত থাকে, তাহা কোনও মহাজনেরই লওয়া উচিত নহে। কেন, এদেশে কি এমন কোনও মহাজন বা দালাল নাই যে, বিনি মাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহেন? অবশ্য তাহা নহে। বিদেশী সওদাগরগণ নিজের সুবিধার বা স্বার্থরক্ষার জন্য এইরূপ নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। কারণ, তাহারা বুঝে যে, অন্য কোনও জাতি দ্বারা গোলযোগের নিষ্পত্তি করিতে গেলে, তাহারা স্বজাতির দিকে টানিয়া স্বজাতির পক্ষই সমর্থন করিবে ও তাহাতে তাহাদের (বিদেশীয় বণিকদের) স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে। সেই কারণে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ইউরোপীয় দ্বারা নিষ্পত্তি করাইয়া লইতে পারিলে তাহাদের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে বুঝিয়া, তাহারা এই নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এই স্বত্বের কথা যে সব কণ্ট্রাক্টে লিখিত হয়, তাহা কোনও মহাজনের লওয়া দূরে থাকুক, কাছেও আনিতে দিতে নাই। আর আমরাই বা কোন্ আক্কেলে সেই সব কণ্ট্রাক্ট লইয়া তাহাদের ইউরোপীয় সালিশীর অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকি! ইহা কি আমাদের দোষ নয়? উহারা নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে জানে, আর আমাদিগকে তাহাদের কাছে "ভাই-পো" হইয়া থাকিতে হয়! ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়!

।৭ম বা শেষ কথা—মালের দাম দেওয়া সম্বন্ধে। এইটীই বিশেষ কথা। আর এইটীতেই আমাদের মহাজনগণের মন যতই বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়, ততই তাঁহাদের পক্ষে ভাল বই মন্দ নয়। এদেশীয় মহাজনগণ এ বিষয়ের জন্য কিছুই ভাবেন না। তাঁহারা অধিকাংশস্থলেই আগে সম্পূর্ণ টাকা বিক্রেতাদিগের নিকট জমা দিলে, তবে মাল ডিলিভারি পান; কিন্তু তাঁহারা এটা বুঝেন না যে, ইহাতে বিক্রেতার নিকট তাঁহাদিগকে কত "হীনতা" স্বীকার করিতে হয়!! আর যাহারা দেখে বা শোনে যে, মহাজন এইরূপ আগে

টাকা দিয়া মাল ডিলিভারি লয়, তাহারাই বা কি মনে করে? কিন্তু দুঃখের বিষয় বুঝিয়া সুঝিয়াও তাঁহারা ইহার কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন না। কেন করেন না, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। আর এ নিয়মের পরিবর্ত্তন না করা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই লজ্জাস্কর ও ঘৃণাস্কর বিষয়। যাহাতে মাল ডিলিভারি লইয়া পরে টাকা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার বিশেষরূপে চেষ্টা করা সকল মহাজনেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার ফল এই হইবে যে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর বিক্রেতাদিগের হাতে পড়িয়া "ভাই-পো" হইয়া থাকিতে হইবে না। আর এরূপ নিয়মের প্রবর্ত্তন হইলে দালালেরাও যাহাকে তাহাকে (চুনো পুঁটীদিগকে) মাল বেচিতে পারিবে না। কারণ কোনও বিক্রেতা সহজে টাকা ধারে ছাড়িতে চাহিবে না—বিশেষতঃ এদেশীয় মহাজনদিগের নিকট। সেই কারণে দালালকেই হউক, বা মুচ্ছুদ্দীকেই হউক, যাহাকেই হউক, একজনকে টাকার দায়িত্ব ভার লইতেই হইবে এবং এই কারণে তাহারা বা তাহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ ভাল ভাল ধনী মহাজনদিগকে ব্যতীত অপরকে মাল বেচিতে পারিবে না।! ইহাতে ধনী মহাজনগণের ভার খুবই হইবে—কেন না চুনো পুঁটীরা ধারে পাইবার আশা করিতেও পারিবে না। আর দায়িত্বাধীন লোকও চুনো পুঁটীকে মাল ধারে কোনও ক্রমেই দিতে সাহস পাইবে না। আর তাহা হইলে চুনোপুঁটীদিগকে নিজ কার্য্যোদ্ধারের জন্য রুই কাৎলার দরজায় আসিতে বাধ্য হইতে হইবেই। তাই বলি, এই নিয়মের প্রবর্ত্তন করা খুবই ভাল এবং ইহার পরিণাম-ফলও খুব ভাল। মহাজনেরা নিজে এ বিষয়ের চেষ্টা বিশেষরূপে না করিলে ইহা অপরের দ্বারা সাধিত হইতে কখনও পারে না।

লেখা ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতেছে। অতএব মোটামুটি একটা কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করা যাউক। ফলকথা এই, উপরোক্ত যে সমস্ত স্বত্বগুলির কথা লেখা হইল, তাহার বিষয় প্রত্যেক মহাজন যেন ভাবেন ও বুঝেন এবং তদনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে চলেন। নতুবা সকল বিষয়েই তাঁহাদিগকে বিদেশী সওদাগরগণের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে ও তাহাদের হাতের ক্রীড়াপুত্তলিকার মত থাকিতে হইবে। ক্রীড়া-পুত্তলিকা এই জন্য বলি যে, যখন তাহাদেরই স্বার্থপূর্ণ কণ্ট্রাক্টের স্বত্বে তাঁহারা মাল খরিদ বিক্রয় করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে তাহাদের হাতের ক্রীড়া-পুত্তলিকা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যেরূপ স্বত্বে এদেশীয় মহাজনগণ বিদেশীয় মহাজনী

গণের পক্ষে অনুকূল স্বত্বযুক্ত কণ্ট্রাক্ট অনুসারে মাল খরিদ বিক্রয়াদি করেন, বলুন দেখি, কোন একটা সামান্য বিদেশী সওদাগর ঐরূপ এদেশীয় মহাজন-দিগের পক্ষে অনুকূল স্বত্ব বিশিষ্ট কণ্ট্রাক্ট অনুসারে স্বত্বের মাল খরিদ বিক্রয়াদি করিয়া থাকেন কি? কখনও না। ইহার কারণ কি? ইহার প্রকৃত কারণ, তাহারা এদেশীয় ব্যবসাদারগণকে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করে। ইহা ব্যতীত ইহার দ্বিতীয় কারণ নাই। অতএব আমাদেরও উচিত যে, তাহারা যে নিয়মে আমাদের মালামাল খরিদ বিক্রয় করিতে চায়, আমা-দিগেরও ঠিক সেই স্বত্বে উহাদিগকে মাল খরিদ বিক্রয় করা। সকল বিষয়েই আমরা উহাদের হাতের পুতুলের ন্যায় হইয়া পড়িতেছি এবং মাত্র সেই জন্যই আমরা ব্যবসায়ে অধঃপতিত হইতেছি ও আত্মমর্য্যাদা হারাইয়া ফেলিতেছি। বলুন দেখি, কোন্ দেশী মহাজন বিদেশী মহাজনকে মাল ডিলিভারি দিয়া in part এর জন্য ঘোরাঘুরি না করে? আরও কি না, আগে পুরা টাকা জমা দিয়া মাল ডিলিভারি লই, পরে বিলের দরুণ টাকা পাওনা থাকিলে দৌড়াদৌড়ি করি। তাই বলি, যতদিন আমরা আমাদের স্বার্থ বুঝিয়া কার্য্য করিতে না শিখিব, ততদিনই আমাদের এ দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। অতএব যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাহাতে আমাদিগকে বিদেশীয় বণিক-দিগের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকা না হইতে হয়, তাহারই চেষ্টা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে করা উচিত। একজন করিলে হয় না—একত্র সমগ্র মহাজন চেষ্টা করিলে সবই হইতে পারে। উদ্যমে না হইতে পারে, এরূপ কোনও কার্য্য নাই। অতএব যাহাতে বিদেশীয় ব্যবসাদারগণের অনুকূল স্বত্বগুলি আর কোনও অঞ্চলে বিশেষতঃ চিনিপটী অঞ্চলে না চলিতে পারে এবং তাহার পরিবর্ত্তে উভয়পক্ষের সমান স্বার্থপূর্ণ স্বত্ব চলিত হয়, তাহার চেষ্টা সকলে সমবেত হইয়া করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কার্য্য ঠিক হাসিল হইয়াছে। যদি বলেন, কোনও বিদেশীয় সওদাগর তাহা সহজে করিতে চাহিবে না, তবে আমরা বলি, একথা ঠিক নহে। কিছুদিন না করিতে পারে; কিন্তু সেই কার্য্য যদি তাঁহারা রাখিতে বা চালাইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রবর্ত্তিত নূতন নিয়মে কার্য্য করিতেই হইবে। যদি কার্য্য চালাইতে চান, তাহা হইলে "করিব না" বলিতেও কিছুতেই পারিবে না; কিম্বা এক্ষণে সব বিদেশী ব্যবসাদারগণ উক্ত নিয়ম সহসা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিবেন না, তাঁহারা বিলম্বে করিতে নিশ্চয়ই বাধ্য হইবেন। আর না করেন, ঐ বৈদেশিক-

গণের ভিতর এমন সব ন্যায়পরায়ণ সওদাগরগণ আছেন, যাঁহারা নূতন প্রবর্ত্তিত নিয়মে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক আছেন। আপনারা যদি বলেন যে, এইরূপ নূতন নিয়ম ব্যতীত আমরা অন্য কোনও স্বত্বের বাধ্য হইয়া কার্য্য করিব না এবং ঐ সঙ্কল্প দৃঢ় মনোযোগের সহিত পালন করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, শীঘ্রই ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আবার বলি, এই সুনিয়মের প্রবর্ত্তন করা উচিত। না করেন, দোষ আপনাদেরই। অন্যকে দোষ দেওয়া আপনাদের সম্পূর্ণ অন্যায়। এই বারে এই খানেই শেষ। বারান্তরে উভয় পক্ষের সমান স্বার্থযুক্ত কণ্ট্রাক্টের খসড়া ও দালাল সম্বন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

পুনশ্চ—আপনারা মধ্যে মধ্যে উক্তরূপ স্বত্বের প্রবর্ত্তন করিতে চান বটে; কিন্তু গোড়ার বাঁধন ঠিক না থাকায় তাহা করিতে পারেন না। গোড়ায় বাঁধন আমাদের নাই বলিয়া আমরা এতই হেয়, ঘৃণ্য ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছি। বন্ধনে শিথিলতা থাকিলে চলিবে না। যাহাতে শিথিলতা না থাকে, তাহার চেষ্টা সকল মহাজনেরই বিশেষ যত্ন সহকারে করা উচিত।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র পাল।
১৩ মধুরায়ের গলি, শিমলা পোঃ আঃ, কলিকাতা।

স্বর্গীয় রামদুলাল সরকার।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দমদমার নিকটবর্ত্তী রেকজানি গ্রামে বলরাম সরকার নামে একজন দরিদ্র লোক বাস করিত। শেষবারের বর্গির হাঙ্গামায় ভীত হইয়া, রেকজানির অধিবাসীরা স্থানান্তরে পলায়ন করে। এক প্রান্তরে বলরামের স্ত্রী একটী পুত্র প্রসব করেন; ইহাঁরই নাম রাম-দুলাল সরকার।

বর্গির হাঙ্গামা নিবৃত্ত হইলে, বলরাম সরকার স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। কিন্তু তিনি রামদুলালকে কিছুই শিক্ষা দিয়া যাইতে পারেন নাই; কারণ, রামদুলালের শৈশবেই তিনি লোকান্তরিত হন। ইহার পূর্ব্বেই রাম-

দুলাল মাতৃহীন হইয়াছিলেন। মাতাপিতৃহীন দরিদ্র বালক উপায়ান্তর না দেখিয়া, কলিকাতায় যাইয়া মাতামহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

রামদুলালের মাতামহও বড় দরিদ্র ছিলেন। রামদুলালের আগমনের পর, তাঁহার মাতামহী মদনমোহন দত্ত নামক কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তির অন্তঃপুরে পাচিকার কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে রামদুলাল মদনমোহনের পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যৎসামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করেন। ষোল বৎসর বয়সে রামদুলাল মদনমোহন দত্তের অনুগ্রহে পাঁচ টাকা বেতনে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হন। মদনমোহন রামদুলালের পরিশ্রম, কার্য্য-নৈপুণ্য ও সত্যবাদিতা দেখিয়া, তাঁহাকে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে সরকার নিযুক্ত করিলেন। এতদুপলক্ষে রামদুলালকে প্রতিদিন জাহাজে যাইয়া বাণিজ্য দ্রব্যাদি দেখিতে হইত।

এই কার্য্যে রামদুলাল অসীম সাহস ও অনন্যসাধারণ সাধুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। একদিন নীলামে একটী দ্রব্য খরিদ করিবার জন্য মদনমোহন দত্ত রামদুলালকে টালাকোম্পানী নামক নীলামদারের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু রামদুলালের যাইবার পূর্ব্বেই উক্ত দ্রব্য বিক্রীত হইয়া যায়। তিনি যাইয়া শুনিলেন, তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট একখানি জলমগ্ন জাহাজ নীলামে ধরা হইয়াছে। তিনি মদনমোহনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়া ঐ জাহাজ ক্রয় করিলেন। পরক্ষণেই একজন সাহেব আসিয়া জাহাজের জন্য রামদুলালকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি সাহেবের ভয়ে সহজে ক্রীত দ্রব্য ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর, রামদুলাল এক লক্ষ টাকা লাভ রাখিয়া সাহেবের নিকট জাহাজখানি বিক্রয় করিলেন। রামদুলাল ইচ্ছা করিলেই লাভের লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু এই পাপকার্য্যে রামদুলালের প্রবৃত্তি হইল না। তিনি মদনমোহনের নিকট সমস্ত টাকা রাখিয়া বিনীতভাবে ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। মদনমোহন উক্ত টাকা গ্রহণ করিলেন না; উহা রামদুলালের সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে দান করিলেন।

এক্ষণে রামদুলালের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হইল। রামদুলাল ঐ লক্ষ টাকা লইয়া বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তিনি কঠোর পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অবিচলিত অধ্যবসায় এবং অসাধারণ কার্য্য-কুশলতা ও সাধুতার গুণে

ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সে সময়ে কলিকাতায় অদ্বিতীয় ধনী হইয়া উঠিলেন। তিনি এত ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, একদিন মহাজনদিগকে একসঙ্গে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন।

তাঁহার অর্থের অধিকাংশই পরোপকারে ব্যয়িত হইয়াছিল। একবার মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ হইলে, দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেন। রামদুলালের কৃতজ্ঞতাও অসাধারণ ছিল। বাল্যকালে কোন বালকের সহিত বিবাদের সময় অন্য একটী বালক তাঁহার সাহায্য করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি যতদিন জীবিত ছিল, রামদুলাল তাহার ভরণপোষণ করিয়াছিলেন। একবার দোলযাত্রার সময় একজন দোকানদার রামদুলালের মাতামহের কোন আত্মীয়কে উপায়ন দেওয়ার জন্য বিনামূল্যে একটী দ্রব্য দিয়াছিল। রামদুলাল উক্ত দোকানদারের পুত্রদিগকে মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। একদা কোন কারণে মদনমোহন দত্তের বংশের একব্যক্তি সমাজচ্যুত হন। রামদুলাল মদনমোহন-কৃত পূর্ব্ব-উপকার স্মরণপূর্ব্বক অকাতরে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহাকে সমাজে তুলিয়া দেন।

রামদুলাল একদিনও গর্ব্ব প্রকাশ করেন নাই। তিনি অতি সামান্য ভাবে থাকিতেন। একদিন তাঁহার পুত্রের সহিত কাহারও বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি অতিশয় নম্রভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রধান ধনী হইলেও, যতদিন মদনমোহন দত্ত জীবিত ছিলেন, ততদিন রামদুলাল সেই সামান্য সরকার-ভাবে পূর্ব্বের ন্যায় পাদুকা বহির্ভাগে রাখিয়া, মদনমোহনের বাটীতে প্রবেশ করিতেন এবং প্রতিমাসে আপনার সেই সরকারগিরির বেতন ১০৲ টাকা লইয়া আসিতেন। সাধারণের নিকট আপনাকে মদনমোহন দত্তের সামান্য সরকার বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ইহাতে তাঁহার মান-সম্ভ্রমের হানি হয় নাই; বরং তাঁহার ঈদৃশ বিনয়গুণে তৎপ্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়িয়াছিল।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিশ্বাস।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
৩য় খণ্ড, ৭ম সংখ্যা; ভাদ্র, ১৩১০ সাল।

গঞ্জাম-বহরমপুর।

আমরা মহাজনবন্ধুর উন্নতি কল্পেই এখানে আসিয়াছি। কোন্ দেশে কি কি দ্রব্যের ব্যবসায় হইতে পারে, কোন্ দেশে কি কি জাতীয় লোকের বাস এবং তাহাদের ভাষা কি, ইত্যাদি তথ্য প্রচার করাই মহাজনবন্ধুর কাজ। বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইংরাজের মত বসবাস করিয়া যাহাতে জগতের ভিতর একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী জাতি বলিয়া উন্নত হইতে পারেন, তজ্জন্য উত্তেজনা করাই মহাজনবন্ধুর প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়াই আজ আমরা এখানে। এতদিন বাঙ্গালী শিক্ষার জন্য দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়াছে, এতদিন বাঙ্গালী আমোদের জন্য দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করিয়াছে, আজ আমরা ব্যবসায় জন্য দেশ-দেশান্তর ঘুরিব সঙ্কল্প করিয়াছি।

ভারতে বহরমপুর দুইটী, একটী বঙ্গে; অপরটী মান্দ্রাজে। আমরা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি বহরমপুরে আসিয়াছি। কলিকাতা হইতে এই বহরমপুর দূরত্বে ৩৭৪ মাইল। বেঙ্গল নাগপুর রেলের একটী ষ্টেশন বহরমপুর। উক্ত রেলের মান্দ্রাজ মেলে রাত্রি ১॥০টার সময় উঠিলে পরদিন বেলা আন্দাজ ১টার সময় এখানে আসা যায়। দেশটী চতুর্দ্দিকে পাহাড়ে ঘেরা। কূপ ও পুষ্করিণী অনেক আছে। অল্প জল হইলেই পর্ব্বতের উচ্চ ভূমি হইতে জল আসিয়া সরোবরে জল বৃদ্ধি হয়। এদেশে যত সরোবর দেখিলাম, সকল গুলিতেই পদ্ম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। হরিদ্রা খণ্ড এবং নীলকণ্ঠেশ্বর ইত্যাদি সরোবরগুলি এখানকার বিখ্যাত জলাশয়। মান্দ্রাজ বিভাগে গঞ্জাম একটী বিখ্যাত জেলা। এই জেলার প্রধান স্থান বহরমপুর। বাঙ্গালার বহরমপুর হইতে ইহাকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই ইহাকে "গঞ্জাম-বহরমপুর" বলে।

বাঙ্গালার সমুদয় গাছই এখানে আছে। এক ধামা কালজামের মূল্য এক পয়সা, আতা ফল পয়সায় ৪টী। যে পাখা কলিকাতায় একখানা দুই পয়সা বা দেড় পয়সায় বিক্রীত হয়, এখানে উহার ৩ খানা এক পয়সায় পাওয়া

যায়। আবার কোন দ্রব্য এখানে দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। সরিষার তৈল এখানকার ভাল নয়। এদেশবাসী তেলেগুরা তিলের তৈল ব্যবহার করেন। কলিকাতা অপেক্ষাও এদেশে সরিষার তৈলে ভেজাল অত্যন্ত বেশী, এবং এক পয়সা তৈল একজন লোক গা'য়ে মাখিলেই ফুরাইয়া যায়। তামাক এখানে /১ সের দশ আনা। কলিকাতায় ইহা বোধ হয় চারি আনা সের হইবে। মুসলমান অধিবাসীরা এই তামাক খায়, নচেৎ ইহারা দোক্তা তামাকের চুরুট করে। এ চুরুট দেখিতে কলিকাতার বর্ম্মার চুরুটের মত; উহা কলিকাতায় দুইটী এক পয়সায় বিক্রয় হয়। এখানে উহা এক পয়সায় ৬ টা। কেরসিন তৈল এক বোতল পাঁচ পয়সা। পাঁঠার মাংস /১ সের তিন আনা। ঘৃতের দর কলিকাতার মত, এবং অন্য দেশ হইতে উহা আইসে না। মহিষ ও গোদুগ্ধ যথেষ্ট পাওয়া যায়, দুগ্ধ ১ সের পাঁচ পয়সা। পাট কার্ত্তিক মাস হইতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। খুব ভাল চাউল টাকায় ৷১৷৷৹ সাড়ে এগার সের। মৎস্যও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এদেশবাসী উচ্চ জাতিরা মৎস্য মাংস ব্যবহার করেন না। মুর্গীর ডিম্ব যথেষ্ট পাওয়া যায়, মূল্য (অল্প লইলে) প্রত্যেকটী এক পয়সা। কলা ও নারিকেল ফল প্রচুর পাওয়া যায়। খুব বড় নারিকেল একটা এক পয়সা। কলা কাঁচা ও পাকা ৩টা করিয়া পয়সায়। দেশী পান এক শত এক পয়সা। চাউল এই জেলার প্রধান শস্য। এই দেশের অপর্য্যাপ্ত চাউল কলিকাতার রামকৃষ্ণপুরে গিয়া বিক্রীত হয়। কুল্‌তি যাহাকে বাঙ্গালায় কুলত্থকলাই বলে, তাহাও এদেশে অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। এই কুল্‌তি বিলাতে অশ্বের প্রধান আহার। এখান হইতে কুল্‌তি কলিকাতার মার্চ্চেণ্ট-গণ ক্রয় করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান, তথা হইতে ইহা বিদেশে যায়। উপস্থিত এক মণ কুলতির দাম দেড় টাকা। এখন ইহার বাজার চড়া। কলিকাতা হইতে বিলাতী সুতা এ দেশে আইসে। বহরমপুরে এখনও অনুমান ৮।৯ শত তাঁত আছে। এদেশে তাঁতির ব্যবসায় এখনও মরে নাই। কেবল বহরমপুরে ২৬ হাজার লোকের বাস। ইহার মধ্যে তেলেগু এবং উড়িয়া বেশী, তৎপরে মুসলমান; বাঙ্গালী এখানে ৫টী মাত্র। তন্মধ্যে ইহারা দুইজনই উকিল। কেল্‌নার কোম্পানীর এজেণ্ট একজন, এবং রেলওয়ে ষ্টেশনে কাজ করেন এক জন। ইহা ভিন্ন এদেশের কালেক্টর ছিলেন বাঙ্গালী। ইনি স্বর্গীয় ব্যারিষ্টর মনোমোহন ঘোষের পুত্র মিষ্টার মহীমোহন ঘোষ। সম্প্রতি তিনি বদলী হইয়াছেন, ইঁহার পদে একজন ইংরাজ আসিয়াছেন।

এখানে প্রচুর লঙ্কা হয়। ইহা চারি প্রকার। নিম্ন শ্রেণীর লঙ্কার দর উপস্থিত ৮৲ টাকা; সর্ব্ব উচ্চ শ্রেণীর লঙ্কার দর ১০৲ টাকা। বাজার এখনও চড়া। এই লঙ্কা ১২৷৷০ টাকা হইয়াছিল, এখন ৮৲ টাকা অপেক্ষা কমিবার সম্ভাবনা আছে। এই সকল লঙ্কা কলিকাতা, কটক, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর চালান যায়। হরিদ্রাও ঐরূপ এই স্থান হইতে অন্যান্য স্থানে চালান যায়। ছোলা এখানে হয় না, অন্য স্থান, যথা—কটক প্রভৃতি স্থান হইতে এখানে আইসে। উপস্থিত এখানে হরিদ্রা এক বস্তা ২৷০ মণের মূল্য ৭৲ এবং ছোলা এক বস্তা ২৷০ মণের মূল্য ৬৷৷০ টাকা। ভুট্টা এখানে অনেক পাওয়া যায়। কেরসিন ও দেশালাই অন্যান্য স্থান হইতে এখানে আমদানী হয়। এদেশে ফস্‌ফরাসের লাল দেশালাই বিক্রয় হয়। মণিহারীর দোকান এখানে কয়েক খানি আছে। ল্যাম্প, ছুচ্, সূতা, চিরুণী, আর্সি সবই পাওয়া যায়। পাউরুটির দুইখানি দোকান আছে। ইহারা এ সকল অধিকাংশ মাল মান্দ্রাজ হইতে আনিয়া থাকেন এবং কলিকাতা হইতেও কিছু কিছু আইসে। তেঁতুল এখানে খুব শস্তা। পরন্তু জুতাও খুব শস্তা। এক জোড়া চটি জুতা ৵০ আনা এবং এক জোড়া ভাল ক্যান্‌বিসের জুতা আট আনায় ক্রয় করিয়াছি। কলিকাতায় ইহার দাম ন্যূন সংখ্যায় দেড় টাকা হইবে।

এখানে বাড়ী ভাড়া শস্তা। ৬৲ ৮৲ টাকায় সমুদয় বাড়ী পাওয়া যায়। অনেক বাটীর পাইখানা নাই; যাহাদের আছে, তাহাও দুই দিকে দুই খানা বড় প্রস্তর পাতা, ইহাতে বসিয়া মৃত্তিকায় মলত্যাগ করিতে হয়। বাটীর ছাদ নাই। সহরের ভিতর ২।৪টা ছাদওয়ালা বাটী যাহা আছে, তাহাতে জল পড়ে। গভর্ণমেণ্টের কাছারি, বাংলা এবং পোষ্টাপিস প্রভৃতিও আমাদের কলিকাতার খোলার ঘরের মত খোলা দিয়া ছাওয়া। এই খোলা করিবার জন্য এখানে দুইটী কোম্পানী আছে। আমাদের দেশের খোলা অপেক্ষা এই খোলা চটাল এবং গঠনও কিছু বিভিন্ন। বাটীর থাম ছোট ছোট কারুকার্য্যযুক্ত। গৃহের জানালা প্রশস্ত নহে। প্রস্তরের দেয়াল কোন বাটীতে ইষ্টকের দেয়াল, কোনটা বা মৃত্তিকার দেয়াল। গৃহের ছাদে ঢালুভাবে তক্তা দিয়া টাইট করা, ইহার উপর খোলার ছাউনী। সম্মুখের বাটীতে গৃহলক্ষ্মীরা চাউল-বাটা দিয়া নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র ভাবে অঙ্কিত করেন। মধ্যবিত্ত প্রত্যেক গৃহস্থের বাহির বাটীতে সদর রাস্তার ধারে একটী

করিয়া ঘর আছে। ঘরটী ছোট। বাটীর যে কোন স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতু হইলে এই ঘরে তিন দিন থাকিতে হয়। মাসিক ঋতু গুলিও ইহাদের নিকট আতুড় ঘরের মত। দুইটী গির্জ্জা আছে। মঠ বা মন্দির অনেক আছে। এই সকল মন্দির-প্রস্তুত-প্রণালী আমাদের দেশের মত নয়, বৌদ্ধ মঠের মত। সমুদয় বাটীই উচ্চ ফ্লোরের উপর নির্ম্মিত। বাটীর সম্মুখে দাওয়া প্রায় সকল বাটীতেই দেখিলাম। রেলিং বারাণ্ডাওয়ালা বাটীও অনেক আছে। এখানকার সমুদয় রাস্তা পাকা ও প্রশস্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এজন্য এদেশীয় মিউনিসিপালীটিকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। পথে কেরসিন ল্যাম্পের সরকারী আলোক দিবার ব্যবস্থা আছে। পাহারাওয়ালার পোষাক আমাদের কলিকাতার মত। কেবল পা'য়ে জুতা নাই, ইহারা তেলেগু পাহারাওয়ালা। তেলেগু ভদ্রলোকেরাও পরিষ্কার দেশী বস্ত্র, এবং ইংরাজী কোট গায়ে, মস্তকে টুপি, কাহারও বা হিন্দুস্থানী পাকৃড়ি, হাতে স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত বলয়, কর্ণে কড়া, অধিকাংশ স্বর্ণের কড়া, মস্তকের সম্মুখদিকের চুল খুব ছোটি। বাঙ্গালার বাবুরা যেমন ঘাড়ে দিকে চুল ছোট করেন, ইহাদের সেইরূপ সম্মুখ মস্তকের চুল চোট এবং পশ্চাৎ মস্তকের চুল বড়; কাহার কাহার পশ্চাতের চুল এত বড় যে, স্ত্রীলোকের মত চুল বাঁধা। চাদর ইহারা প্রায় ব্যবহার করেন না। পোষাক পরিষ্কার, মাড়য়ার অপেক্ষা ইহারা আচারে ভাল, কিন্তু পা'য়ে জুতা নাই। পা'য়ে জুতা দিলে ইহাদের জাতি যায়, তবে ইংরাজী শিক্ষার ফলে ক্রমশঃ জুতা চলিবে। আমাদের মধ্যে যেমন অনেকেই ইংরাজী জানেন, ইহাদের ভিতরেও তাই। অনেকে ইংরাজী জানেন। নচেৎ ইহাদের তেলেগু ভাষা কিছুই বুঝা যায় না, এদেশের উড়িয়া অধিবাসীরা বরং বাঙ্গালীর কথা অনেক বুঝিতে পারেন, কিন্তু তেলেগুরা কিছুই পারেন না। উড়িয়া ভাষা তেলেগুরা অনেকেই জানেন। তেলেগু ভাষায় কিন্তু আর্ম্মনী, সংস্কৃত, উড়িয়া এবং ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার কথা মিশ্রিত। আমি তেলেগু পণ্ডিত রাখিয়াছিলাম, তাঁহার নিকট তেলেগু শিক্ষা করিতাম। এই পণ্ডিত ইংরাজী এবং তেলেগু ভাষা জানেন, অন্য ভাষা জানেন না; ইংরাজীতে বলিলে, ইনি তাহার তেলেগু অর্থ বুঝাইতেন। তেলেগু ভাষার কথা বিস্তারিতরূপে অন্য প্রবন্ধে বলিব।

এদেশে এখনও চাল চলনে, ব্যবসায়ে বহু পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই পুরাতন নিয়মে বাটী ঘর করা। সেই দেশী দ্রব্যের ব্যবহার

ইহাদের মধ্যে খুবই প্রবল। এদেশেও ইংরাজী শিক্ষার স্রোত আমাদের দেশের মত প্রবল; এখানেও বালিকা বিদ্যালয় আছে, সভা-সমিতি হয়, হিতবাদিনী নামক এক খানা সংবাদ পত্র বহরমপুর হইতে উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত হয়। হিতবাদিনী সম্পাদকের নাম শ্রীগণেশাশাস্ত্রী। ইনি জাতিতে উড়িয়া, পরিচ্ছদে বাঙ্গালী, ভাষায় ইংরাজ; কেন না তাঁহার সঙ্গে যাহা কিছু কথা হইয়াছে, সবই ইংরাজীতে। তিনি নিজের ভাষায় কাগজ লেখেন, কিন্তু বিদেশীর সঙ্গে উড়ে কথা বলিতে লজ্জা পান, ইহা ভাল নয়। এখানে একটী খৃষ্টানদিগের পাঠাগার আছে। প্রোগ্রেস্ প্রভৃতি ইংরাজী, উড়িয়া ও তেলেগু ভাষার পত্র পত্রিকা চৈতন্য লাইব্রেরীর টেবিলের মত সাজান, অনেক পাঠক তাহা পাঠ করিতেছেন। আর একটী ক্লাব আছে; এই ক্লাবের সৃষ্টিকর্ত্তা বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ। ইঁহার নিবাস চুঁচুড়া। এক্ষণে এখানে সপরিবারে বাস করেন। শরৎ বাবুর ভদ্রতা আমরা জীবনে ভুলিব না। ইনিই কেল্‌নার কোম্পানীর এজেণ্ট।

প্রায় দেশী দ্রব্য ভিন্ন বহরমপুর-বাসীরা অন্য দ্রব্য ব্যবহার করেন না। বিলাতীলবণ এদেশে প্রবেশ করে নাই, কটকেও করে নাই। গঞ্জাম, ইচ্ছাপুর এবং নৌপদা (Naupada) এই তিন স্থানে দেশী লবণ প্রস্তুতের কুঠি আছে। ঐ সকল স্থানে লবণ প্রস্তুতি হয়। ইহা দেখিতে মিছিরির ছোট ছোট টুক্‌রার মত, শুভ্র বেশী নয়। প্রতি মণ ।৵০ আনা, গভর্ণমেণ্টের ডিউটী ২৲ টাকা। ইহা গঞ্জামের লবণ। গঞ্জামের লবণ এক ওয়াগানে দুই শত বস্তা হইতে ২০৫ বস্তা পর্য্যন্ত যাইতে পারে। ১৬৮ পাউণ্ডের বস্তা, গভর্ণমেণ্টের লোকে ওজন করিয়া দেন, ডিউটী কালেক্টরীতে জমা দিতে হয়, লবণের মূল্য কারখানাওয়ালারা লয়। গঞ্জাম সমুদ্রের তীরে। সমুদ্রতীরের বালি ও সমুদ্রের জল ছাঁচিয়া এই লবণ হয়। ইহার প্রতি মণ দুই টাকা তিন আনা হইলেও ইহাকে অন্যত্র চালান দেওয়া হয়, স্থানীয় দালালেরা ইহার ভার লয়েন। এই মাল ষ্টেশনে আনিবার জন্য গরুর গাড়ী, কুলি, সুতলী, (বোরা কিন্তু মহাজনের), এবং তাঁহাদের দালালী এক ওয়াগানে মোট চুক্তি ১৮৲ বা ১৯৲ টাকা, এই খরচা ভিন্ন স্বতন্ত্র রেল ভাড়া লাগে।

যাহা হউক, দেশী দ্রব্যের উপর ইহাদের এখনও অচলা ভক্তি। ম্যালেরিয়া নাই। বেশ্যা অনেক আছে; এজন্য সিফিলিস্ আছে। জুবিলি হাঁস্‌পাতাল

আছে। তেলেগু ভাল ডাক্তার কয়েকজন আছেন। ইংরাজ ডাক্তার এক-জন আছেন। জ্বর প্রায় হয় না। সময়ে সময়ে কলেরা হয়। সেন্‌সাসে স্থিরীকৃত ২৬ হাজার লোক এদেশবাসী। এদেশী স্ত্রীলোকের মুখ অনেকটা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মত। সঙ্গীতের সুর তাল বাঙ্গালার মত। হার-মোনিয়াম, পাখয়াজ, বাঁয়া তবলা, এবং ইংরাজী বাঁশী, করনেট, ক্ল্যারনেট প্রভৃতি যথেষ্ট আছে। নহবৎ ও ঢাকের বাজনাও আছে; কিন্তু তাহাতে তেলেগু আওয়াজ হয়। এদেশী স্ত্রীলোকেরা বাঙ্গালিনীর মত মস্তকে শীঘ্র টাক পড়িবে এরূপ ভাবে চুল টানিয়া খোপা করেন না। পশ্চাতের চুল আল্‌গা, অথচ খোপার মত বাঁধা সুন্দর দেখিতে। ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা প্রায় পুরুষের মত কাপড় পরিধান করেন। পুরুষদের কাপড় পরিধান সম্মুখে এবং পশ্চাতে দুই দিকেই যেন কোঁচা ঝুলিতেছে। অনেক পুরুষেও গহনা, যথা—হস্তে বলয়, কানে কড়া, গলায় হার ব্যবহার করেন এবং মস্তকের চুলে উড়েদের মত খোপা বাঁধেন। ভাপুর, সান্‌বাজার, বড়বাজার প্রভৃতি স্থান সকল এদেশে বিখ্যাত। বহরমপুর এবং ভাপুরের মধ্যস্থলে একটী ছাদখোলা বাজার আছে। এই বাজারে এবং ভাপুরের বাজারে ও বহরম-পুরের বাজারে মৎস্যাদি বিক্রয় হয়। ছাদখোলা বাজারে শনিবারে শনিবারে হাট বসে। হাটে দেশী বস্ত্র, মাদুর ইত্যাদি প্রচুর বিক্রয় হয়; কিন্তু বঙ্গের দেশী বস্ত্রের প্রচার দেখিলাম না। এ সকল মান্দ্রাজী দেশী কাপড়। রেশমের কাজও এদেশে আছে। কলিকাতা হইতে ১০ নং ১২ নং এবং ১৪ নং চস্‌মা মার্কা সূতা এখানে আমদানী করা যাইতে পারে। ইহা প্রচুর বিক্রয় হয়। এদেশী মন্দিরগুলিতে শিব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। গণেশ পূজা এদেশে খুবই প্রচলিত। বহরমপুর হইতে গোপালপুর ৯ মাইল ব্যবধান। এক্কা-গাড়ীতে যাইতে হয়, যাতায়াতের ভাড়া ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা। ষ্টেশন হইতে বহরমপুরে আসিবার এক্কাগাড়ী ভাড়া দুই আনা বাঁধা দর। এই এক্কার ছাউনী আছে। তিন চারিজন লোক বসা যায়। এদেশবাসী ইহাকে “ঝট্‌কা” বলে। ইহা ভিন্ন গরুর গাড়ীও যথেষ্ট পাওয়া যায়। ধনবান গ্রামবাসীদের নানাবিধ ফ্যাসানে প্রস্তুত গোযান এবং সুন্দর ঝট্‌কা গাড়ী আছে। ইহা ভিন্ন দুই একটী ধনী কলিকাতার ধরণে আফিস গাড়ী ও টম্‌টম্ ইত্যাদি লইয়া গিয়াছেন। গোপালপুরে গমন করিলে সমুদ্র-তীর পাওয়া যায়। আমরা গিয়াছিলাম। তথায় মিঞ্চিনি কোম্পানীর ষ্টীমার

আফিস আছে। বিলাতী জাহাজ সকল এই গোপালপুরে একবার টচ্ করিয়া যায়। সমুদ্রে লাইট হাউস আছে। ৭০০ হস্ত লম্বা সমুদ্রতীর হইতে সমুদ্রের উপর পর্য্যন্ত একটী জেটি আছে। এত বড় জেটিকে ইংরাজীতে Pier বলে। এখানে জাহাজ আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এখন সমুদ্র তীরে ভয়ানক ঢেউ। সমুদ্রের দূরদেশে তরঙ্গ আদৌ নাই। সাগরের যত উৎপাত কূলেই! এইজন্য এই কয় মাস জাহাজ জেটি ছাড়া আরও ৩৫০ শত গজ দূরে আসিয়া দাঁড়ায়। প্যাসেঞ্জার এবং মাল ইত্যাদি এক প্রকার বোটে করিয়া জাহাজ হইতে নামান এবং উঠান হয়। এ বোট বড় বড় তক্তার ফালি বোট্টাকৃতিতে কাটা এবং এক তক্তার সঙ্গে অপর তক্তায় ছিদ্র করিয়া কাঁচি দড়ি দিয়া যেন সেলাই করা, কেন না, লৌহ প্রেক্ ইত্যাদি সমুদ্রের লবণাক্ত জলে হাজিয়া বা জরিয়া গিয়া খসিয়া পড়ে। ঐ ৭০০ হস্ত লম্বা জেটির উপর দিয়া মাল আনিবার জন্য ছোট রেল পাতা। সেই লৌহ রেল পেটিও সমুদ্রের বাতাসে জরিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। ইহা মাঝে মাঝে প্রায় বদ্‌লাইতে হয়। ঐ ভয়ানক Pierর লৌহ থামগুলিরও ঐ দুর্দ্দশা। সর্ব্বদাই উহা বদ্‌লাইতে হয়। এই লবণাক্ত জলের জন্য সমুদ্র-জাহাজের সঙ্গে লৌহ-সম্পর্ক নাই। থাকিলে, তাহা দিন কতক মধ্যে জরিয়া যায়। সমুদ্রের কূলেই ইঁদারা দেখিলাম, তাহার জল লবণাক্ত নহে; নচেৎ সমুদ্রের জল মুখে করা যায় না। এ স্থানের কুলিরা লবণ ক্রয় করে না, ব্যঞ্জন ইত্যাদি মিটা জলে রাঁধে। লবণ দিবার সময় কিছু সমুদ্রের জল দেয়। আস্কা, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের মাল যাঁহারা কলিকাতায় রেলে না পাঠাইয়া, কিংবা কলম্ব সিংহল প্রভৃতি স্থানে মাল পাঠাইতে হইলে, এই গোপালপুরে আনিয়া মাল জাহাজে দিতে হয়। এইজন্য ষ্টীমার আফিস এবং জাহাজে মাল দিবার কন্ট্রাক্টার-দিগের কয়েকটী গুদাম, এবং কতকগুলি কুলির বাসস্থান এবং এই লোকগুলির খাদ্যাদি যোগাইবার জন্য কয়েকখানি সামান্য দোকান ভিন্ন গোপালপুরে আর কিছুই নাই। আর আছে একটী চার্চ্চ। আমরা দেখিতেছি, যে দেশে কোথাও কিছু নাই, তথায় যদি একজন ধনবান্ ইংরাজ থাকেন, সেই সঙ্গে একটী গির্জ্জা থাকে। বহরমপুরে বোধ হয়, মিউটিনির সময় কতকগুলি ইংরাজ-হত্যা হইয়াছিল, তাহাদের সকলকে এক স্থানে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া পৃথক পৃথক গোর দেওয়া হইয়াছে। বহরমপুর হইতে

আস্কা ১৮ মাইল ব্যবধান। এক্কা গাড়িতে প্রাতঃ ৭ টার সময় যাইলে সন্ধ্যা ৭ টায় আসা চলে। ভাড়া লয় ৪।৶০ চারি টাকা ছয় আনা। আস্কায় একটী চিনির কল, উহার সঙ্গে মদ্য প্রস্তুতের কল্ আছে। ইহা ৭০ বৎসরের কল। এবৎসর ইহা মেরামত হইতেছে। এই কলে বস্তায় চিনি ভর্ত্তি করে এবং উহার সেলাই কলে করে। আস্কা কলের প্রতি বস্তা চিনির গ্রোস ওজন ১৭০॥ পাউণ্ড। নিট ওজন ১৬৮ পাউণ্ড। আস্কা হইতে গোপালপুর এবং গোপালপুর হইতে ষ্টীমার যোগে কলিকাতা পর্য্যন্ত পৌছান খরচ প্রতি বস্তায় সতের আনা অর্থাৎ প্রতিমণ ॥১০ সাড়ে আট আনা। উপস্থিত আস্কা কলের চিনির দর প্রতি বস্তা ১৪॥৶০ এবং কলিকাতায় ইহাকে আনিতে খরচা ১/০ আনা, মোট প্রতি বস্তা কলিকাতা পর্য্যন্ত পড়ে ১৫॥৵০ আনা, তাহা হইলে মণ হইল ৭৸/১০ আনা। ইহা আস্কা দানাদার চিনি। পিটি চিনি এখন কলে নাই; কাজেই দর হইল না। এদেশে কার্ত্তিক মাস হইতে প্রায় সমুদয় কাজের মরসুম হয়। চিনিও কার্ত্তিক মাস হইতে আস্কায় অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যাইবে। আস্কা কলের চিনি বহু পূর্ব্বে একবার কলিকাতায় আসিয়াছিল। এক্ষণে আসে না। ঐ কলের চিনি কটক, বালেশ্বর, বহরমপুর, গঞ্জাম প্রভৃতি স্থানে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রচুর কাটিয়া থাকে। বহরমপুরে যিনি আস্কা কলের চিনির এজেণ্ট, তাঁহার নাম "ভি, কামেশ্বরা নেইডু"। নেইডু অর্থে বৈশ্য। ইনি প্রবল ধনী, ইংরাজী জানেন, অতিশয় বিনয়ী ও ভদ্রলোক। ইঁহাকে পত্র লিখিতে হইলে পোষ্ট বহরমপুর, গঞ্জাম এই ঠিকানা দিতে হয়।

বহরমপুরে দ্রব্যাদির ওজন হয়। ১ মোড়ং বালেশ্বরী ।২ সের। বালেশ্বরী ওজন ৮০ শিক্কায়। ইংরাজী ২৪ পাউণ্ড। আমাদের কলিকাতায়ও ৮০ সিক্কার ওজন। ইহারা সেরকে বিষা বলেন, অর্থাৎ ১২০৲ টাকায় ১ বিষা। ৮ বিষায় ১ মোড়ং। কটকে ১২৫ টাকায় সের। এই জন্য ইহারা বলেন ৪ মোঁড়ং ৪ বিষা অর্থাৎ ৪॥০ মোড়ং কটকী ১ মণ হয়। তেঁতুল, গুড়, চিনি, হরিদ্রা, লঙ্কা প্রভৃতি দ্রব্য গুলি পূর্ব্বোক্ত ওজনে বিক্রয় হয়। নচেৎ জিরা, গোলমরিচ, ঘৃত প্রভৃতি দামী দ্রব্য গুলি ১১০ সিক্কার ওজনে বিক্রয় হয়। আবার সুপারি ৪ মোড়ং ৬ বিষা ১০ পড় এই ওজনে বিক্রয় হয়। ১ পড়ের ওজন ৫॥০ ভরি। ইহা ভিন্ন পাউণ্ডের হিসাবও এখানে প্রচলিত।

(B. N. R.) হাবড়া হইতে বহরমপুরে ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীর ৪৸৶০ আনা,

মধ্যম শ্রেণী ৭।৵০ আনা। এদেশ-বাসীর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে উড়িয়ারা আসিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করে। ভাই বাঙ্গালি! এস, এই সকল স্বাস্থ্যকর সুখপ্রদ স্থানে অল্প অর্থে ধনবানের সুখ ভোগ করিবে এস। চাকরের বেতন মাসিক ১৲ টাকা, রসুই ব্রাহ্মণ (অবশ্য তেলেগু) বেতন ২৲ টাকা। তেলেগুরা হিন্দুস্থানীর মত দেখিতে বলবান্, সাহসে উড়ের মত। মাম্‌লা মোকর্দ্দমা জানে না, শান্ত ধীর প্রকৃতির লোক। ই, আই, আর রেলওয়ের হিন্দুস্থানী-দেশে বাঙ্গালীরা অনেক দূর অধিকার করিয়াছে। এবার এস ভাই, তেলেগু দেশে এস। এই সকল দেশ বাঙ্গালীময় কবে দেখিব?

জাপানী গৃহ-পরদা।

এস্থলে গৃহ-পরদা সামাজিক কথার অর্থ নহে। বাঙ্গালায় ইহাকে "চিক" বলে। বাঙ্গালা ভাষায় "চিক" শব্দের অন্য অর্থ স্বর্ণালঙ্কার বিশেষ, উহা এদেশী স্ত্রীলোকেরা গলায় ব্যবহার করেন; কিন্তু ইহাও এ প্রবন্ধের অর্থ-বোধক জন্য ব্যবহৃত হইতেছে না। এদেশী স্ত্রীলোকেরা সভা প্রভৃতি সাধারণ পুরুষের সমবেতস্থলে প্রবেশ করিলে, স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী স্থান নির্ণীত হয়। সেই স্থানে যে আভরণ থাকে, সেই আভরিত দ্রব্যকে "চিক" বলে। এই প্রবন্ধে ঠিক উক্তরূপ "চিকের" বিষয়ও বলা হইতেছে না। আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন বোধ হয়, সাহেবদিগের বাসগৃহের দ্বারদেশে অথবা আধুনিক সভ্যের সভ্যতাযুক্ত বাবুদিগের বৈঠকখানা কিংবা বাসগৃহের দ্বারদেশে যে পরদা ঝুলান থাকে, সেই পরদাকেই লক্ষ্য করিয়া আমরা "জাপানী গৃহ-পরদা" নাম দিলাম।

এই পরদা এতদিন আমরা ছিটের কাপড় ইত্যাদি দেখিয়াছি। জাপান হইতে এই পরদা সম্প্রতি কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। কিন্তু ইহা কাপড়ের নহে—শরকাটির পরদা। শরকাটি অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমরা লিখিবার কলম প্রস্তুত করি। কলিকাতায় এই পরদা পাঁচ টাকা হইতে দশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এদেশীয় শিল্পীরা ইচ্ছা করিলে ইহা সহজেই প্রস্তুত করিতে পারেন। অথবা যে সকল বাবুরা উহা ক্রয় করিতেছেন, তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে ইহা তৈয়ারী করাইতে পারেন।

গৃহদ্বারের মাপে একটী তল্‌তাবাঁশ কাটিয়া লইয়া, উহার গাত্রে পিত্তলের রিং খুব ঘন ভাবে টোনদড়ি দিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আঁটিয়া দিউন। তৎপরে শরকাটি ২।৩ ইঞ্চি পরিমাণে কাটিয়া উহার গাঁইট বাদ দিয়া প্রত্যেক রিঙ্গের জন্য লম্বা টোনদড়ির গাত্রে উহাকে ফুলের মালা গাঁথিবার মত ঐ শরকাটিগুলি পরাও। যতগুলি রিং, ততগুলি করিয়া এইরূপ কর; তৎপরে উহা ঐ রিঙ্গের গাত্রে বাঁধিয়া দাও। শরকাটি গুলির ছিদ্র দিয়া যখন দড়ি পরান হয়, তখন একটী শরকাটির শেষ সীমায় অপর শরকাটি পড়িবার মুখে কাচের মালা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ২।৪টা মুক্তা দিয়া বাহার করা হয়। শরকাটি স্বভাবতঃ রং করা। নচেৎ কঞ্চির কাটিতেও ইহা হইতে পারে। কঞ্চির কাটির বর্ণ কাঁচা অবস্থায় সবুজ এবং পক্কাবস্থায় হরিদ্রা। পাটের কাটি সাদা। ইহাকে ২।১ ইঞ্চি পরিমাণে কাটিয়া, জলে হলুদ গুলিয়া উহা অগ্নিতে জ্বাল দিতে হয় এবং এই অবস্থায় সাদা পাটকাটিগুলি উহাতে সিদ্ধ করিয়া লইলে পাটকাটির বর্ণ হরিদ্রাভ হইয়া যায়। তৎপরে ইহা পরদার জন্য ব্যবহার করা চলে। দোহাই আপনাদের, এই জাপানী আমদানী পরদা এদেশবাসী কেহই লইবেন না। ইচ্ছা হয়, উহা দেখিয়া ঘরে করাইয়া লউন। ইহা বলিবার কারণ এই যে, এইরূপেই জর্ম্মণী দ্রব্য এদেশে আসিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। বোধ হয়, এমন দিন হইবে যে, জাপানের দ্রব্যও জর্ম্মণীর দ্রব্যের মত এদেশে প্রতিপত্তি লাভ করিবে। অতএব সাবধান!!!

শ্রীঃ—

চূণ।

চূণ নানা প্রকার। পাথর চূণ, জোংড়া বা গোড়া চূণ, ঘুটিং বা কাঁকর চূণ, কলিচূণ ইত্যাদি। পাথর পোড়াইয়া যে চূণ পাওয়া যায়, তাহাকে পাথর চূণ বলে। পাথর নানা রকমের; কোন পাথরে চূণের ভাগ অধিক, কোন পাথরে বালির ভাগ, আবার কোন পাথরে মাটির ভাগ অধিক। যে পাথরে চূণের ভাগ অধিক, তাহাকে চূণপাথর (Lime stone) বলিয়া থাকে এবং তাহাই চূণ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। শ্রীহট্টের খাসিয়া পাহাড়ে, দার্জ্জিলিঙ্গে, দাক্ষিণাত্যে, মধ্য-প্রদেশে, হাজারিবাগ, মানভূম

ও সিংহভূম জেলায় এই পাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কলিকাতায় যে সকল পাথর চূণ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই শ্রীহট্ট ও মধ্য-প্রদেশের সাতনা ও কাট্নি নামক স্থান হইতে আনীত হইয়া থাকে। রেল হইবার পূর্ব্বে মধ্য-প্রদেশ হইতে এদেশে চূণ আনিবার সুবিধা ছিল না, তখন কেবল সিলেট হইতেই জলপথে ইহা কলিকাতায় আসিত; কিন্তু এখন সাতনা ও কাট্নির চূণই কলিকাতায় অধিক।

চূণপাথর অন্যান্য রকমের পাথর হইতে সহজেই বাছিয়া লইতে পারা যায়। ইহার উপর ছুরী বা কোনও সূচ্যগ্র লৌহ-শলাকার দ্বারা সহজেই রেখা অঙ্কিত হয়; কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে ইহার উপরিভাগ বেশ মসৃণ বলিয়া বোধ হয়। কোন পাথরের উপর ২।৩ ফোঁটা মিউরিয়েটিক এসিড (Muriatic acid) দিলে যদি সোঁ সোঁ করিয়া শব্দ হয়, তাহা হইলে সে পাথরটিকে চূণ পাথর বলিয়া বুঝিতে হইবে।

চূণ পাথরও আবার নানা রকমের। খড়ি ও মার্ব্বল (Marble) পাথর হইতে বিশুদ্ধ চূণ পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য পাথরে মাটি, বালি, এলুমিনা (Alumina) প্রভৃতি নানা পদার্থ মিশ্রিত থাকে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জিলায় যে সকল ঘুটিং পাওয়া যায়, তাহাও এক প্রকার মাটি মিশ্রিত চূণ পাথর। এই ঘুটিং পোড়াইয়া কাঁকর বা ঘুটিং চূণ হয়। প্রয়োজন মত মাটি মিশ্রিত থাকিলে চূণ ভাল হয়; সিমেণ্ট বা বিলাতী মাটি এক প্রকার মাটি মিশ্রিত চূণ মাত্র।

সুন্দর বন ও পূর্ব্বাঞ্চলে জোংড়া বলিয়া এক রকম বড় বড় শামুক পাওয়া যায়, ইহা হইতেই জোংড়া বা গোঁড়া চূণ হয়। শামুক ও ঝিনুক পোড়াইয়া যে চূণ পাওয়া যায়, তাহাকে সাধারণতঃ কলিচূণ বলিয়া থাকে। কলিচূণ কেবলমাত্র দেওয়ালে লেপন ও চূণকাম করিবার জন্য ও অন্যান্য চূণ গাঁথনীতে ব্যবহৃত হয়। শামুক ও ঝিনুকের চূণ শুষ্ক অবস্থায় থাকিলে তাহাকে বাখারি চূণ বলে।

ক্যাল্সিয়ম নামক ধাতু ও অম্লজান (Oxygen) এই দুইয়ের রাসায়নিক সংমিশ্রণেই চূণ হয়। চূণ প্রস্তরের (Calcium carbonate) প্রধান নিদান ক্যালসিয়ম, অম্লজান ও অঙ্গারক অম্ল (Carbonic acid)। চূণ পাথর পোড়াইবার সময় আগুনের উত্তাপে ইহা হইতে অঙ্গারক অম্ল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও চূণের ভাগ পড়িয়া থাকে। সদ্যদগ্ধ চূণ প্রথমে জলের সহিত না মিশিলে,

আর কার্ব্বনিক বা অঙ্গারক অম্লের সহিত মিশিতে পারে না। এই অবস্থায় ইহা (Quick lime) জলের সহিত মিশিতে চেষ্টা করে। ইহার উপর জল ঢালিয়া দিলে, ইহা গরম হইয়া থাকে ও সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। এই অবস্থায় ইহাকে আর্দ্র চূণ (Slaked lime) বলে। সদ্যদগ্ধ চূণ যদি কোন খোলা জায়গায় রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা বায়ুরাশি হইতে জলকণা সকল আকর্ষণ করিয়া আর্দ্র অবস্থায় পরিণত হইবে। এই সময়ে বিশুদ্ধ চূণ শীঘ্র জলের সহিত মিশ্রিত হয় ও আয়তনে প্রায় দুই গুণ বাড়ে। ইহার সহিত মাটি প্রভৃতি মিশ্রিত থাকিলে আর্দ্র হইতে অনেক বিলম্ব হয় ও আয়তনে সিকি ভাগের অধিক বাড়ে না। সেই জন্য ইহাকে প্রথমে গুঁড়া করিয়া, তাহার পরে ইহার উপর জল দেওয়া উচিত। কোন কাজে চূণ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহাকে এই প্রকারে ভিজা বা আর্দ্র অবস্থায় পরিণত করিতে হয়। অনেক সময়ে প্রয়োজন মত চূণ, একটী থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া থলিয়াটীকে জলে ডুবাইয়া লওয়া হয়, ইহাতে ভিতরকার চূণ আর্দ্র হইয়া অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, এই নিয়মে আর্দ্র করিলে চূণ ভাল হয়; কিন্তু চূণ গাদা করিয়া রাখিয়া, তাহার উপর অল্প অল্প করিয়া জল দেওয়াই সাধারণ নিয়ম।

আর্দ্র চূণ বায়ুরাশি হইতে কার্ব্বনিক অম্ল গ্রহণ করিয়া, পুনরায় চূণ প্রস্তর (Calcium carbonate) হইতে চেষ্টা করে, এই সময়ে ইহার সহিত মিশ্রিত জলের অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

গাঁথনীতে চূণ ও সুরকী মিশ্রিত মশলার (Mortar) চূণ এই প্রকারে শক্ত হয় ও ইহার উভয় পার্শ্বের ইষ্টক জুড়িয়া যায়। এখন এ রকম মনে হইতে পারে যে, মশলা চূণ ও সুরকীর পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র চূণ ব্যবহার করিলে অধিক শক্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা হয় না। কেবল মাত্র বিশুদ্ধ চূণ ব্যবহার করিলে, সমস্ত মশলাই ইষ্টকের চাপ পাইয়া বাহির হইয়া আসিবে ও ইহার বাহিরের অংশই কার্ব্বনিক অম্লের সহিত মিশ্রিত হইয়া শক্ত হইবে, আর ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারায় ভিতরের চূণ নরমই থাকিবে। সিমেণ্ট ও ঘুটিং চূণ কখন কখন বালি কিংবা সুরকীর সহিত না মিশাইয়াও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পাথর কিংবা জোংড়া চূণ কখনও সুধু ব্যবহার হয় না। সাধারণতঃ চূণের সহিত পাথরের গাঁথনীতে বালি ও ইষ্টকের গাঁথনীতে সুরকী মিশাইতে হয়। বিশুদ্ধ চূণ ও বালি মিশ্রিত মশলা শক্ত

হইতে বিলম্ব হয় ও বাতাস না পাইলে মোটেই শক্ত হয় না, কিন্তু চূণের সহিত প্রয়োজনমত মাটি মিশ্রিত থাকিলে, তাহা শীঘ্র শক্ত হয় ও বাতাস না পাইলেও তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। বরং এই প্রকার চূণ জলের মধ্যে থাকিলে শীঘ্র শক্ত হয় ও বহুদিনেও নষ্ট হয় না। মাটী মিশ্রিত চূণকে এই জন্য হাইড্রলিক (Hydraulic) বা জলীয় চূণ বলে। ঘাট, পুল, গৃহের ভিত্তি, নর্দ্দমা ও যে সকল গাঁথনী জলের মধ্যে থাকে, সেই সকল স্থানে হাইড্রলিক চূণ বা সিমেণ্ট ব্যবহার করা উচিত। চূণের সহিত মিশ্রিত মাটির পরিমাণ অনুসারে সিমেণ্ট কিংবা হাইড্রলিক চূণ হয়। সাধারণতঃ শতকরা ১০ হইতে ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত মাটি থাকিলে তাহাকে সিমেণ্ট বলে। ঘুটিং পোড়াইয়া যে চূণ পাওয়া যায়, তাহা হাইড্রলিক চূণ। এজন্য গৃহের বনিয়াদ গাঁথিতে ইহাই ব্যবহার করা উচিত।

বিশুদ্ধ চূণ শুকাইয়া যাইলে আয়তনে অনেক কমিয়া যায় ও ইহাতে অনেক পরিমাণে বালি ও সুরকী মিশাইলেও ক্ষতি হয় না। মাটি ও অন্যান্য বস্তু মিশ্রিত চূণে এত অধিক সুরকী মিশাইতে পারা যায় না। নিম্নলিখিত পরিমাণ অনুসারে চূণ ও সুরকী মিলাইলে বেশ হয়।

১ ভাগ কাটনি চূণের সহিত ৪ ভাগ সুরকী।
" সিলেট " " ৩ " "
" ভাল কাঁকর " ২ " "
" সাধারণ ঘুটিং " ১ " "
" কলিচূণ " দেড় ভাগ "

শিবপুর কলেজ,—শ্রীহরিপদ ভাদুড়ি।

তেলেগু ভাষা।

আজ তেলেগু ভাষার বিষয় কিছু বলিব। ব্যবসায়ীদিগের জন্য নানাভাষা শিক্ষা, অন্ততঃ যে কোন ভাষার "ভোকাবুলারি" জানা বিশেষ আবশ্যক। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের হাবড়া হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত ১০২৯ মাইল পথে যে সকল ষ্টেশন গুলি হইয়াছে, উহার ভিতর আমরা ৪টী ভাষা প্রচলিত

দেখিতে পাই। কলিকাতা হইতে ৭২ মাইল দুর খড়্গাপুর এবং কলিকাতা হইতে ৮০ মাইল দুর মেদিনীপুর; এইখানে আসিয়া বাঙ্গালা ভাষার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আমরা বলি, "খাইবে না, যাইবে না" তত্রত্য অনেক বাঙ্গালী বলেন, "খা'বেক নি, যা'বেক নি" ইত্যাদি। তৎপরে কলিকাতা হইতে ১৪৪ মাইল দূর "বালেশ্বর" এখানে ভাষার "নৃসিংহ মূর্ত্তি" অর্থাৎ অর্দ্ধেক উড়ে, অর্দ্ধেক বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষা। বালেশ্বরের পর ষ্টেশন খন্তাপাড়া, শোরো এই সকল দেশ গুলি সম্পূর্ণ উড়ে ভাষা। এই উড়ে ভাষা ভদ্রক, কটক, খুরদারোড (অপর নাম জাটনি), পুরী দিয়া সমুদ্রতীর পাইয়া গোদাবরী পর্য্যন্ত, এদিকে বেঙ্গল-নাগপুর রেলের বহরমপুরে আসিয়া, উড়ে এবং তেলুগু ভাষায় যেন ঢ় মারামারি! যেমন বালেশ্বরে উড়ে এবং বাঙ্গালা ভাষায় ঢ় মারামারি হইয়া, শেষে উড়ে ভাষার জয় জয়কার হইয়াছিল, এখানে তেমন তেলেগু ভাষার জয় জয়কার।

যাহা হউক, এখন কথা হইতেছে যে, গুজরাতি, বাঙ্গালা এবং উড়ে ভাষায় বড় তফাৎ নহে; কেন না, তবু উহা বাঙ্গালীর অবোধ্য নহে। বিশেষতঃ উড়িয়া ভাষার সহিত বাঙ্গালার বড়ই মিশামিশি। যেমন আমরা বলি, "যাইতেছি", উহারা বলে "যাউচু"। আমরা বলি, "যাইব" উহারা বলে "জিব" প্রভেদ এই মাত্র। বহরমপুরে আসিয়া তেলুগু এবং উড়ে ভাষায় বালেশ্বরের মত পূর্ব্বোক্ত ভাব সহজেই উপলব্ধি হয়। ইহার পর ষ্টেশন গোলেনতারা, এই ষ্টেশন কলিকাতা হইতে দুর ৩৮০ মাইল। এখানে আর উড়ে ভাষার তেজ নাই। এখানে ইংরাজীর ওয়েলকাম, বাঙ্গালার আসুন, উড়িয়ার "আস" চলে না, এখানে আস হইয়াছে "ইক্রেড়ি কিরেণ্ডি।" কটক ষ্টেশনে বলে, বাবু "দুধ অ" চাই, এখানে আসিয়া সেই দুধ "পালু" "পালু" শব্দ। এখানে পানিপাড়ে বলিয়া ডাকিলে কিছুই বুঝিবে না, উড়ের "জল অ" বা পাণি এখানে চলে না, ইহারা জলকে বলে "নিলু।" কিন্তু রম্ভা, হুমা, গঞ্জাম, বহরমপুর পর্য্যন্ত তবু উড়ে ভাষা বলিলে তত্রত্য গ্রামবাসীরা কিছু কিছু বুঝেন। পলাসা, নৌ-পদার ওদিকে আর উড়ে ভাষা চলে না। উক্ত সকল প্রদেশে কেবল "তেলেগু ভাষা।" তাহার পর আবার তেলেগুকে পরাস্ত করিয়া মান্দ্রাজের দিকে তামিল ভাষার উত্থান, নিজ মান্দ্রাজের ভাষা তামিল। কলিকাতার ভাষা বলিলে আমরা বলিব, এখনকার ভাষা বাঙ্গালা। তৎপরে এই সহরে অনেক ইংরাজ বাস করেন, অনেক হিন্দুস্থানী,

অনেক মুসলমান, এবং অনেক ইহুদী প্রভৃতি বহু জাতি আছেন, কাজেই সহরে বহু ভাষা প্রচলিত। মান্দ্রাজ সহরেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। ইংরাজী ভাষা যে মান্দ্রাজের মাতৃ ভাষা হইয়াছে, ইহা কেহই মনে করিবেন না; হাঁড়ির একটা ভাত টিপিলেই বুঝা যায় যে, উহার সব ভাত হইয়াছে কি না, সেইরূপ একটা সহর দেখিলেই সমুদয় সহরের অবস্থা বুঝা যায়। কলিকাতার পাউরুটীওয়ালারা এবং আয়ারা, এমন কি ইংরাজ-টোলায় অনেক কুলিও ইংরাজী বলিতে পারে। সেইরূপ মান্দ্রাজের অনেক দুঃখীরাও ইংরাজী বলে, নচেৎ তাহাদের মাতৃ ভাষা কেহই পরিত্যাগ করে নাই। কলিকাতার মফঃস্বলে যেমন ইংরাজী ভাষার তেজ নাই, মান্দ্রাজেও তাই। মান্দ্রাজে উড়ে ভাষাও বেশ চলিত আছে। যাহা হউক, সমুদয় ভাষার ভোকা-বুলারি শিক্ষা করা ব্যবসায়ী মাত্রেরই আবশ্যক।

হিন্দুস্থানী খোট্টাই বুলী ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত। কেবল ভারত বলিয়া নহে, বর্ম্মা, রেঙ্গুন, দক্ষিণ আফ্রিকা, এমন কি লণ্ডন সহরেও হিন্দুস্থানী কথা সহজ প্রাপ্য, কিন্তু অল্প। এজন্যই মাড়য়ারীরা সহজে বাঙ্গালা এবং অপরাপর সমুদয় দেশ অধিকার করিয়াছে, ব্যবসায় উপলক্ষে বা চাকর রূপে ইহারা বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লিগুলিও অধিকার করিয়া বসিয়াছে; কিন্তু ইহারা আজ পর্য্যন্ত তেলেগু দেশ অধিকার করিতে পারে নহে। মাড়য়ার যে স্থানে গিয়াছে, তথায় ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীত্ব লোপ হইয়াছে। উহাদের নিজেদের খরচা কম, কাজেই দরের পড়তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেহই মাড়য়ারীর মুখে ব্যবসায় করিতে পারেন না। ইংরাজের কথা স্বতন্ত্র। এদেশীয়েরা উহাদের কিছুতেই পারেন না।

মাড়য়ারী এখনও তেলেগুর পাষাণ সদৃশ ভাষায় দাঁত বসাইতে পারেন নাই। তেলেগু ভাষা এখন কোন ভাষার "আন্না কড়ুকু" অর্থাৎ ভাইপো নহে। বুদ্ধিমান বাঙ্গালী! দাদা তোমার কিছুই নাই। তোমাদের যদি মতি গতি ফিরে, তোমরা যদি দলে দলে বিজাতীয় ভাষার দেশে তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া ব্যবসায় করিতে পার, তাহা হইলেই আমাদের মুখোজ্জ্বল হয়—তাহা হইলে আমাদের রাজ্যজয়ের ফল হয়। আমার বোধ হয়, বাঙ্গালী ইচ্ছা করিলে সহজেই তেলেগু ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন। ইহাও সংস্কৃত মূলক শব্দ। তবে যে কোন সজীব ভাষা যেমন খাঁটি নহে, তেলেগু ভাষাও তাই। উহাদের শব্দ শুনিলেই ক্রমেই তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন।

দেবনাগর অক্ষর এবং বাঙ্গালা অক্ষরে যেরূপ ভাবে সৌসাদৃশ্য আছে, তেলেগু এবং উড়িয়া অক্ষরে অনেকটা সেইরূপ সৌসাদৃশ্য। এদেশে তেলেগু অক্ষর পাওয়া যায় না, কাজেই আমরা তেলেগু অক্ষরের অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি দেখাইতে পারিলাম না। ইচ্ছা করিলে আপনারা Infant Primer Telugu নামক তেলেগু ভাষার প্রথম ভাগ পুস্তক Madras India Press—Popham's Broadway Black Town এই ঠিকানায় পত্র লিখিয়া আনিতে পারেন। মূল্য /১০ ছয় পয়সা।

তেলেগু স্বরবর্ণ ১৯টী ; যথা—অঃ, আ, ই, ঈ, উঃ, ঊ, ঋ, ৠ, লুঃ, লূ, এ, এঃ, আই, ও, ওঃ, আউ, অর্দ্ধ অনুস্বর (পূর্ণ অনুস্বর ০ বিসর্গ ঃ- ।

তেলেগু ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৭টী,—কাঃ খাঃ গাঃ ঘাঃ ইঙা। চ চাঃ ছঃ জ জাঃ ঝা ইড়ি। টা ঠা ড ঢ ণ। তা থঃ দা ধাঃ না। পা ফা বা ভা মঃ। য রা রা লাঃ ড়ঃ ওয়া শঃ সঃ ষঃ হ।

তেলেগু ভাষার সম্পর্ক, ফল, খাদ্যদ্রব্য, পশু, পক্ষী, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, বাটী, ঘর, প্রাকৃতিক দ্রব্য, প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ এবং উহার বাঙ্গালা অর্থ নিম্নে লিখিত হইল।

পিতা—ত্যানড্রি, নায়না।
মাতা—ত্যালি, আম্মা।
স্ত্রীলোক—আড়দাই।
পুরুষ—মোগয়াড়ু।
ছোট ভ্রাতা—তামুড়ু।
ভগ্নি—আপাজাল্লি।
কাকা—পিন্তাণ্ডি (কাকা)।
মামা—মামা।
বড় দাদা—আন্না।
মাসি—পিন্তাল্লি।
পিসি—আত্তা।
বড় দিদি—আপ্পা।
ছোট বুন—চেল্লি।
শ্বশুর—তাতা, মামা।
শ্বাশুড়ী—আত্তা।

পিতামহ—তাতা।
মাতামহ—তাতা।
পুত্রবধু—কোড়াল্লু।
পুত্র—কড়ুকু।
কন্যা—কুতুরু।
ঝি—কুলদাই।
চাকর—কুলিওয়াড়ু।
মেথরাণী—মালদাই
মেথর—মালওয়াড়ু।
বাদাম—বাদাম গিঞ্জুলু।
আম্রপাকা—মাউড়ি পানডুল্লু।
আম্র কাঁচা—মাউড়ি কায়া।
কাঁঠাল—পনস পানডুল্লু।
জাম—জাম পাডুল্লু।
আক্—চেরুগু।

বেল—মারেড পান ডুল্লু।
কচু—সারগ্না কান্দা।
কলা—আরটি কায়া (কাঁচা)।
ঐ পাকা—আরটি পান্‌ডুল্লু।
নারিকেল—কবরি কায়া।
ডাব—কবরি পান্‌ডুল্লু।
তাল—তাড়পান্‌ডুল্লু।
তেঁতুল—চিন্তা পান্‌ডুল্লু।
কাঁচা তেঁতুল—চিন্তা কায়া।
গোল আলু—বাঙ্গালা দোম পাল্লু।
পটল—পটলকায়া।
শাক—কোরা।
শালপাতা—ইস্‌রা আকুলু।
কলারপাতা—আরটি আকুলু।
কপি—কবিকায়া।
মূলা—মূলকন্দা।

[ক্রমশঃ।

করগেট আইরণ ব্যবহার।

Corrugated Iron অর্থাৎ দস্তার মণ্ড বা মাড় দ্বারা আচ্ছাদিত লৌহ-পাত অথবা দস্তা দ্বারা কলাই করা লোহার পাত। ইহার অন্য নাম টিন। কিন্তু টিন এবং করগেটে উৎপত্তিগত প্রভেদ না থাকিলেও "দেখিতে উভয়ে স্বতন্ত্র।" আপনারা কানেস্তারা দেখিয়াছেন; উহাই টিনের দ্বারা প্রস্তুত। টীনের কানেস্তারা লৌহপাত কত সূক্ষ্ম, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। করগেটের লৌহপাত টীন অপেক্ষা অনেক স্থূল। আজকাল নূতন রেলের অনেক ষ্টেশন, ঘোড়ার আস্তাবল এবং অনেক বাগানের ঘর করগেট দ্বারা প্রস্তুতি হইতেছে। সুবিধা এই যে, ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ করিতে যে ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা ইহাতে ব্যয় কম হয়। কিন্তু অসুবিধা এই যে, করগেটের ঘর গ্রীষ্মকালে অতিশয় উত্তপ্ত হয়, তখন ঘরের মধ্যে থাকা অতিশয় কষ্টকর হয়। রাত্রে আবার শীতল হয়। আজকাল দেখিতেছি, এই অসুবিধার জন্য করগেট-চালের নিম্নে কাষ্ঠের পাত দেওয়া হইতেছে। এক প্রস্থ কাষ্ঠ পাতিয়া তাহাতে করগেট আঁটিয়া গৃহছাদ করায় ইষ্টকের ছাদাপেক্ষা যে সুলভে হয়, তাহা আমাদের ধারণাতীত। কেন না, আমরা কলিকাতাবাসী, এখানে কাষ্ঠ শস্তা নহে; অবশ্য যে দেশে কাষ্ঠ শস্তা, তাঁহারা ইহা করিতে পারেন। আর এক কথা, করগেটের ছাদ ইষ্টকের ছাদের মত হয় না, ইহার ছাদ ঢালু। ঢালু ছাদ মানুষের ব্যবহারে আসে

না। অনেক দেশের সুরকী ইত্যাদি, বিশেষতঃ সমুদ্রতীরস্থ দেশগুলির বালী সুরকীর এত সচ্ছিদ্রতা বেশী যে, বঙ্গদেশের মত ইষ্টকের ছাদ করিলে তাহাতে জল পড়ে; এই জল পড়া কিছুতেই নিবারণ হয় না, কাজেই সে সকল দেশে ঢালু ভাবে তক্তা দিয়া খোলার আচ্ছাদনে ছাদ করা হয়। অতএব এ সকল দেশে করগেটের ছাদ বাধ্য হইয়া করিতে হয়। আমাদের দেশে তক্তার পাত দিয়া করগেটের ঢালু ছাদ করিলে ইষ্টক নির্ম্মিত ছাদের ন্যায় ব্যয় পড়ে, অথচ ইষ্টকের ছাদ ব্যবহারে আইসে। কাজেই এদেশে ইষ্টকের ছাদ বেশী। যাহা হউক, টীন যেমন আপনাদের দেখা জিনিষ, করগেটও তেমনি আপনাদের দেখা জিনিষ। এই দুই দ্রব্যই যদি দস্তার কলাই করা লৌহপাত হইল, তবে একের নাম টীন, অপরটীকে করগেট বলা হয় কেন? তাহার কারণ এই যে, করগেট দস্তার কলাই করা ঢেউ খেলান লৌহপাত অর্থাৎ করগেটের (Corrugated) ইংরাজী অর্থ সঙ্কুচিত। সঙ্কুচিত লৌহপাতকে আমরা ঢেউ খেলান বলিলাম; ইহার উপলব্ধি আপনারা করগেট দেখিয়া করিবেন। লৌহপাত অগ্রে সঙ্কুচিত করিয়া তৎপরে দস্তার কলাই করা হয়, করগেট আইরণ প্রস্তুত প্রণালী "প্রথম খণ্ড মহাজনবন্ধুতে" টীন নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে করগেট ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

লৌহপাত সঙ্কুচিত (Corrugated) করা হয় কেন? ইহা যে সকল দেশ হইতে আবিষ্কৃত, সে সকল দেশ সমুদ্রতীরে; তথায় বালী সুরকীর সচ্ছিদ্রতা বেশী, একথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। অতএব সেই সকল দেশের অভাবেই ইহা আবিষ্কৃত হইয়া ব্যবহৃত হয়, উক্ত সকল দেশ সমুদ্রতীর বলিয়া বায়ুর প্রকোপ বেশী। বহু পূর্ব্বে টীনের আচ্ছাদনেই তথাকার ঢালু গৃহছাদ প্রস্তুতি হইত, কিন্তু উহা বায়ুর প্রকোপে বক্র হইয়া যাইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই মোটা লৌহপাতকে করগেট করা হইল। এখন আর বায়ুর প্রকোপে ইহার কিছুই ক্ষতি হয় না। সচরাচর কলিকাতার বাজারে ২৷৷০×৭, ৩৷৷০×৮ ফুট বা ততোধিক মাপের করগেট আইরণ পাওয়া যায়। কলিকাতার লৌহপটি কিংবা রেলি ব্রাদার্স প্রভৃতি মার্চ্চেন্ট আফিসে ইহা পাওয়া যায়। অধিকাংশ সময়ে মার্চ্চেন্ট আফিসে অর্ডার দিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করিয়া মাল আনাইতে হয়। ঘনতানুসারে করগেট টীনের নম্বর আছে।

করগেট দ্বারা ঘর নির্ম্মাণ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। (১) এক খানা করগেট হইতে অপর এক খানা করগেটে জোড়া দিবার সময় ৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ২টী সঙ্কুচন (Corrugations) চাপা থাকিবে। (২) যেস্থলে করগেটকে কাষ্ঠ বা লৌহ বরগায় স্ক্রু দ্বারা আঁটিতে হইবে, ঐ সকল স্ক্রু উত্থিত সঙ্কুচনে Ridges উপর থাকিবে, নতুবা বৃষ্টির জল উহার ছিদ্র মধ্যে প্রবেশ করিবে। (৩) বরগাগুলি ঘরের লম্বা দিকে ঠিক একবিধ সমতলে থাকিবে; ঐ সকল বরগার দূরত্ব পাতের দৈর্ঘ্যতানুসারে স্থির করিতে হইবে। (৪) যেস্থানে ৪ খানি পাতের কোণ একত্রে থাকিবে, সেস্থানে নাচি করিয়া দিতে হইবে; ঐ সকল নাচি ১ ফুট ব্যবধান থাকিবে। (৫) প্রত্যেক নাচির উপরে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ শীল নির্ম্মিত চাকৃতি বেষ্টিত থাকিবে। (৬) নাচির ছিদ্রগুলি উহার ব্যাস অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় করা কর্ত্তব্য। নচেৎ রৌদ্রের উত্তাপে এবং রাত্রের কিংবা শীতকালের শীতলতায়, যখন লৌহপাত বর্দ্ধিত ও কুঞ্চিত হইবে, তখন উহা বক্র হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। (৭) প্রত্যেক নাচি স্ক্রু ইত্যাদি উত্তপ্ত গলিত রাংএ ডুবাইয়া শীতল হইলে পরে ব্যবহার করা উচিত।

করগেট আইরণ জোড়া দিবার স্ক্রু আজকাল রাংএ কলাই করা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। শ্রীঃ—

সুখচরের চিনির কারখানা।

এ শ্রেণীর কারখানার কথা এ পর্য্যন্ত মহাজনবন্ধুতে একটীও বলা হয় নাই। এতদিন কেবল "র" সুগার বা কাঁচা চিনির কারখানার কথা বলা হইয়াছে। ঐ সকল কারখানায় দলুয়া এবং গোঁড় প্রভৃতি চিনি হয়। এই শ্রেণীর কারখানায় উক্ত দলুয়া চিনিকে পরিষ্কৃত করা হয়। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর কারখানা বৈদ্যবাটী প্রভৃতি স্থানে অনেক ছিল। এক্ষণে প্রায় সবই উঠিয়া গিয়াছে। কেবল সুখচরে ঘর কয়েক আছে। এই ঘর কয়েক যাহা আছে, তাহাতে ইহাঁরা সম্পূর্ণরূপে এই কারখানার দ্বারা প্রতিপালিত

হয়েন না—অন্যান্য চাকুরী করিয়া থাকেন, সেই সঙ্গে এক একটা ইহাদের কারখানাও আছে। এদেশী অধিকাংশ প্রেসওয়ালা এবং সংবাদপত্রওয়ালারও এই দুর্দ্দশা। কেন না, এই সকল কাজে সম্পূর্ণভাবে কোন গৃহস্থ প্রতি-পালিত হইবার মত নহে, অথচ একটা কাজ রাখা যায়। যখন এদেশে কলের চিনি আসে নাই, এদেশী কাঁচা চিনি "গোঁড়" যখন বিদেশে রপ্তানী হইত; তখন এই শ্রেণীর কারখানার জয় জয়কার ছিল। কারণ, তখন শুভ্র চিনি ইঁহারাই করিতেন। কাঁচা চিনি দলুয়া গোড় শুভ্র চিনি নহে। উহা লইয়া ইঁহারা রস করিতেন, দুগ্ধ এবং চূণের জল দিয়া গাদ কাটিতেন, পরে খোলায় রাখিয়া, রস শীতল হইলে, ইহা জমিয়া যাইত, তাহার উপর পাটাশেওলা দিয়া উক্ত খোলার তলদেশের ছিদ্র খুলিয়া দেওয়া হইত; উহাতে রস ঝরিয়া পড়িয়া খোলার চিনি বিশেষ ভাবে কঠিন ও শুষ্ক হইত, তৎপরে চিনি কাঁকিয়া বাহির করা হইত; ইহাকে "দোবরা চিনি" বলা হয়। পরে ঐ ঝরা রস পুনরায় জ্বাল দিয়া গুড় করিয়া, খোলায় রাখিয়া পাটাশেওলা দিয়া আবার যে চিনি বাহির করা হইত, তাহাকে "একবোরা চিনি" বলা হইত। একবোরা চিনির যে রস খোলা হইতে ঝরিয়া পড়িত, সেই রস লইয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে উহা হইতে যে চিনি বাহির হইত, তাহাকে "পেতের চিনি" বলা হইত। পেতের চিনির রস লইয়া পুনরায় উহা হইতে যে চিনি বাহির করা হইত, তাহাকে "চৌফেরা চিনি" বলা হইত। এখনও এই সকল নিয়মে ঐ সকল চিনি হয়; কিন্তু অল্প। ইহাপেক্ষা সহস্র গুণে শুভ্র চিনি যাহা বিদেশ এবং স্বদেশীয় কলে প্রস্তুতি হয়, তাহার দর অনেক কম। দেশী সুখচরে দোবরা চিনি দশ টাকা হইতে সময়ে ২০৲ টাকা মণ বিক্রয় হইয়াছে; কলের চিনি ইহাপেক্ষা সহস্রগুণে শুভ্র, কিন্তু দশ টাকা মণ কখনই হয় নাই। কাজেই ইহার গ্রাহক কম। প্রায় নাই বলিলেই হয়। কেবল যে সকল হিন্দু (ইহার মধ্যে বাঙ্গালী প্রায় নাই) অর্থাৎ অনেক হিন্দুস্থানীরা কলের চিনি আদৌ স্পর্শ করেন না; তাঁহারাই ইহার গ্রাহক আছেন। এবং ঐ সকল গোঁড়া হিন্দু মহাশয়দিগের কল্যাণে অদ্যাপিও সুখচরে কয়েক ঘর "দোবরা চিনির" কারখানা আছে। শীত পড়িলেই ৭ই ৮ই পৌষ হইতে যেমন কাঁচা চিনির কারখানা, চাঁদপুর শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে আরম্ভ হইবে। ইহাদের চিনি বাহির হইলেই ঐ সকল কারখানার দলো চিনি ইহারা ক্রয় করেন; এবং ইহাদেরও কার-

খানায় উনান জ্বালেন। ৭।৮ই পৌষ নূতন দলুয়া কলিকাতায় পাওয়া যায়। উহা পূর্ব্ববঙ্গের কারখানা হইতে আইসে। উক্ত দলুয়া সুখচরের কারখানায় পরিস্কৃত হইয়া দোবরা রূপে বাহির হইতে ৯।১০ই মাঘ হয়। ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত ইঁহারা দলো খরিদ করেন। দোবরা, একবোরা, পেতে এবং চৌফেরা যাহা হয়, তাহা গুদামে মজুত রাখেন। চৌফেরার পর ইঁহারা যে রস পান, তাহাতে আর চিনি হয় না, সে রসকে চিটা বলা হয়। বৈশাখ মাসের মধ্যে ইঁহাদের চিনি প্রস্তুত শেষ হইয়া যায়। প্রত্যেকে ২।৪ শত বস্তা যাহা করেন, তাহা ক্রমশঃ মাড়োয়ারীর বিবাহে এবং শ্রাদ্ধে বিক্রয় করেন। দেওয়ালী বা কালীপূজার সময় উহাদের নূতন খাতা হয়, সে সময়ও এই চিনি ২।১০ বস্তা বিক্রয় হয়। ইহা এক্ষণে মরা কাজ। সবিশেষ সংবাদ অন্য প্রবন্ধে বলিব। হিন্দু! এই তোমার "দেশী দোবরা চিনি।"

শ্রী :—

বাঙ্গালার হস্তিদন্ত শিল্পের কথা।

উপযুক্তরূপ উৎসাহ অভাবে অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রচলিত এই দেশীয় শিল্পের বর্ত্তমানে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সরকারী কৃষি বিভাগের প্রকাশিত ঐ বিভাগেরই সহকারী ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জি, সি, দত্ত প্রণীত "আইভরি কার্ভিং ইন বেঙ্গল" নামক পুস্তিকায় লিখিত বিবরণ হইতে তাহার অনেকটাই আভাস পাওয়া যায়। সাধারণের অবগতির জন্য ঐ পুস্তিকাখানি হইতেই সংক্ষেপে এই শিল্প-সংক্রান্ত বিবরণগুলি সঙ্কলন করিয়া প্রকাশিত করা গেল—

১৮৮৩ অব্দের কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপনীর ২য় খণ্ডের ৫ম পৃষ্ঠায় জানা যায়, তখন কাকিনা, বড়বাড়ী প্রভৃতি স্থলে হস্তিদন্তে কারিগরী হইত। এখন সমস্ত রংপুর জেলার মধ্যে কুড়িগ্রাম সার্কেলের পাঙ্গা গ্রামে ৬ ঘর মাত্র কারিগর (উহারা খাঁদিকার বলিয়া পরিচিত) আছে। পাবনা, কটক, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরাতেও এই ১৮ বৎসরে শিল্পীর লোপ হইয়া গিয়াছে। বালেশ্বরে এখনও একটী লোক ঐ

কাজ করে। মুরসিদাবাদে এখনও কাজ চলিতেছে, এবং কলিকাতা বৌ-বাজার হাড়কাটা গলিতে ৩ জন কারিগর আছে।

কথিত আছে, একদা মুরসিদাবাদের নবাব নাজিম কাণ-খুঁটিবার জন্য শলাকা চাহিলে, একজন একটী খড়কে আনিয়া হাজির করিল। নবাব বলিলেন, উহা তাঁহার উপযুক্ত নহে। দিল্লী হইতে হস্তিদন্তের কার্য্য করিতে জানে, এমন একজন কারিগর আনা হইল। সে নবাবের প্রয়োজনীয় দ্রব্য হস্তিদন্তে প্রস্তুত করিতে বসিল। মুরসিদাবাদের একজন বৈষ্ণব ভাস্কর দ্বারের ফাট দিয়া উঁহাকে কার্য্য করিতে দেখিয়া শিল্পকার্য্য শিখিয়া ফেলিল। এই উদ্যম ও অধ্যবসায়শীল তীক্ষ্ণদৃষ্টি ব্যক্তির পুত্র তুলসী ভাস্করের ন্যায় প্রতিভাশালী কারিগর কেহ বাঙ্গালাদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। মুর-সিদাবাদের কারিগরগণ এখন উহাঁর নাম করিতে হইলে জোড়হস্তে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকেন।

তুলসী ভাস্কর পরম, বৈষ্ণব ছিলেন। নবাব বাড়ীতে চাকরী থাকায় তীর্থদর্শনেচ্ছা সংযত রাখিতে হইত। উহাঁর পলাইয়া যাইবার ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া নবাব উহাঁকে পাহারায় রাখিতেন। একদিন স্নানের সময় সন্তরণ করিতে করিতে তুলসী হঠাৎ ভাগীরথী পার হইয়া পলায়ন করে। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া—নবাব প্রহরীদিগকে এড়াইয়া তুলসী রাজমহলে বড়ই দুরবস্থায় পৌছে। তথায় একজন ছুতারের যন্ত্র কিয়ৎক্ষণের জন্য লইয়া একটী কাঠের ঘোড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়া ৫৲ টাকা পায়। তথা হইতে তুলসী ৺গয়াধামে গিয়া কতকগুলি দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করে এবং অর্থসংগ্রহ করিয়া ৺কাশীধামে উপস্থিত হন। তথায় হস্তিদন্ত ক্রয় করিতে পারিয়া তুলসী কয়েকটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করে ও সচ্ছল অবস্থাতেই ৺বৃন্দাবনে রাধাগোবিন্দজীর মন্দির দর্শন করিতে পারে।

এই সময়ে তুলসী ৺রাধাগোবিন্দজীর যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রাণ মনের ভক্তির সহিত প্রস্তুত করেন, তাহাতেই উহার প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। ঐ মূর্ত্তি তুলসী জয়পুরের মহারাজকে উপহার দিয়া তাঁহার আশ্রমে কিছুদিন থাকেন। এই সময়ে মহারাজার একটী ছাগীর ক্ষুদ্র মূর্ত্তি তাঁহার অনুমতি অনুসারে হস্তিদন্তে অবিকল প্রস্তুত করিয়া দিলে মহারাজার শরীরে তখন যে সকল অলঙ্কার ছিল, তাহা এবং নগদ ২ হাজার টাকা তুলসীকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। নানাতীর্থে ১৭ বৎসর ভ্রমণ করিয়া তুলসী মুরসিদা-

বাদে ফিরিয়া আসেন। তখন পূর্ব্ব নবাবের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র উহার গদিতে বসিয়াছিলেন। তুলসীকে নূতন নবাব তাঁহার পিতার ক্ষুদ্রমূর্ত্তি হস্তিদন্তে প্রস্তুত করিতে বলেন। তুলসী উহা এরূপ অবিকল ঠিক করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, নবাব তুষ্ট হইয়া উহার ১৭ বৎসরের অনুপস্থিতিকে পূর্ণ বেতনে অবকাশ ধরিয়া সমুদয় বেতন তৎক্ষণাৎ দেওয়াইলেন এবং মুরসিদাবাদ মহাজনটুলিতে একটী ভাল বাটী উহাকে পুরস্কার দিলেন। প্রতিভাও ছিল এবং দেশীয়ের প্রতিভার পুরস্কার দিবার মত মনও রাজা, মহারাজ ও নবাবদিগের তখন ছিল! তুলসী ও তাঁহার প্রধান সাগ্রেদদ্বয় নবাব বাড়ীতে ১৫৲ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি পাইতেন; তাহা ছাড়া কার্য্যের পুরস্কার ছিল। তুলসীর দুই জন ছাত্র হস্তিদন্তের শিল্পে প্রসিদ্ধিলাভ করেন; রামকিশোর এবং মাণিক ভাস্কর। প্রথমোক্তের ভ্রাতুষ্পুত্র লালবিহারী ভাস্করের অল্প দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। উহার পুত্র নীলমণি ভাস্কর নিজামে হস্তিদন্তের কার্য্য করিয়া থাকে।

নিম্নে চৌদ্দ জন বর্ত্তমান ভাস্করের নাম দেওয়া যাইতেছে। প্রথম ৬ জনের ঠিকানা—"খাগড়া-বহরমপুর" জিলা মুরসিদাবাদ। শেষোক্ত আট জনের ঠিকানা এনায়েতুল্লাবাগ—জিয়াগঞ্জ পোষ্ট আফিস—মুরসিদাবাদ।

১। গিরীশচন্দ্র, ২। নিমাইচন্দ্র, ৩। গোপালচন্দ্র, ৪। দুর্লভচন্দ্র, ৫। হরিকৃষ্ণ, ৬। নারায়ণচন্দ্র, ৭। গোপালচন্দ্র, ৮। গোপীকৃষ্ণ, ৯। নীলমণি, ১০। মুরারিমোহন, ১১। গোকুলচন্দ্র (বড়), ১২। উমেশচন্দ্র, ১৩। মহেশচন্দ্র, ১৪। শ্রীরামচন্দ্র।

ইহাঁদের সকলেরই উপাধি ভাস্কর। জাতিতে বৈষ্ণব। কলিকাতার এচ, সি, গাঙ্গুলি কোং এবং টেলেরিং কোং প্রথমোক্ত দুজনের নিকট হইতে মাল আনয়ন করেন বলিয়া পুস্তিকাতে লিখিত হইয়াছে।

হস্তিদন্তের শিল্পজাতের নাম ও মূল্য তালিকাও উদ্ধৃত করিতেছি। কাহারও যদি এই দেশীয় শিল্পজাতের কিছু বাটীতে রাখিতে ইচ্ছা হয়!

দ্রব্য	মূল্য।	দ্রব্য	মূল্য।
বর্ণমালা প্রত্যেক অক্ষর	৴০ হইতে ৴১০	৺কালী	৪০৲ হইতে ১২০৲
৺দুর্গা দশভূজামূর্ত্তি	৫০ হইতে ৩০০৲	৺জগদ্ধাত্রী	৫০৲ ,, ১২৫৲
আস্ত এক টুকরা দন্তে অর্থাৎ জোড় না দিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাহা প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার মূল্য	১৫০৲	৺জগন্নাথের রথযাত্রা	৫০৲ ,, ১৫০৲
		সুধু পাল্কী বা বেহারা;— সমেত	১৫৲ ,, ১০০৲

দ্রব্য	মূল্য।
দাবা বড়ে ১ সেট	২৫৲ ,, ২৫০৲
সুধু হাতী, হাওদা সহিত বা বাঘের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত	৫৲ ,, ১৫০৲
সুধু ঘোড়া বা সওয়ার ;— সহিত	২৲ ,, ৩০৲
গো শকট	৮৲ ,, ৫০৲
ময়ুরপংখী নৌকা	১০৲ ,, ১০০৲
সুধু গাভী বা বৎস সহ	৩৲ ,, ২০৲
সুধু উষ্ট্র বা সওয়ার সহ	৪৲ ,, [illegible]
কুকুর, শূকর, মহিষ, কুম্ভীর, হরিণ	২৲ বা ৩৲ বা ৫৲ হইতে ১০৲ বা ১৫৲ বা ২০৲
লকেট ও চেন	৫৲ হইতে ৫০৲
ইয়ার-রিং	৪৲ ,, ১০৲

দ্রব্য	মূল্য।
পুরোহিত, ধোপা, ভিস্তী, মুটে, পিয়াদা, দর্জ্জি, সিপাহী, ফকির প্রভৃতি প্রত্যেক	২৲ ,, ৫৲
কাগজ কাটার	১৲ ,, ৩০৲
বালা—রৌপ্য বা স্বর্ণপাত ভিন্ন বা উহা সহিত	২০৲ ,, ঊর্দ্ধ
কার্ডকেশ (নামের টিকিট রাখার জন্য)	৬৲ ,, ১৫৲
ফটোগ্রাফের ফ্রেম	১৫৲ ,, ৬০৲
ছড়ি	৩০৲ ,, ১০০৲
চামর	২৫৲ ,, ৭৫৲
উলবোনা কাঁটা ৪টা	।।০
ক্রুসের কাঁটা	১৲
চিরুণী	নানা মূল্যের।

এ ছাড়া যেরূপ ফরম্যাইশ হয়, তাহা এবং অন্যান্য দ্রব্যও পাওয়া যায়।

বিলাতী কারিগর আনাইয়া যন্ত্রাদির উৎকর্ষ করাইয়া বড় কারখানায় কম খরচে অধিক দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া অধিক বিক্রয় করিতে পারিলেই এই শিল্পের উন্নতি হইতে পারে।

পুস্তিকা লেখক যথার্থই বলিয়াছেন—

Had it not been for the wonderful vitality of the caste system, the art would have ceased to exist long ere this.

"বর্ণবিভাগ প্রথার এত আশ্চর্য্য জীবনীশক্তি না থাকিলে এ শিল্প এতদিন লোপ পাইত।" বাপ পিতামহের কাজ জাতীয় ব্যবসায় সহজে এমন কি প্রাণ থাকিতে কেহ কেহ ছাড়ে না বলিয়াই হিন্দুমাত্রেই এখন কারখানার ও ক্ষেতের মজুরীতে গিয়া পড়ে নাই। নচেৎ সমস্ত পৃথিবীর প্রতিযোগিতা যেরূপ ভীষণভাবে ঘাড়ে পড়িতে যাইতেছে, তাহাতে একখানা তাঁত বা চিনির কারখানা, এদেশে আজও থাকিবার কথা কি? এক একটা শিল্প লোপের সঙ্গে সেই সেই জাতীয় অনেক পরিবারই এদেশ হইতে অদৃশ্য হয়। প্রকৃতই প্রাণ দিয়া জাতীয় ব্যাপার রক্ষার চেষ্টা এ দেশীয় শিল্পীরা করে, কিন্তু দেশীয় মধ্যবিত্ত ও ধনাঢ্য লোকেরা বৈদেশিক শিল্পেই মুগ্ধ! এই মহৎ জীবন উৎসর্গ ব্যাপার উহারা দেখিয়াও বুঝিতে পারেন না।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
৩য় খণ্ড, ৮ম সংখ্যা ; আশ্বিন, ১৩১০ সাল।

দেশী ও বিলাতি সব্‌জীর চাষ।

(কাশীপুর প্র্যাকটিকেল ইনষ্টিটিউসন হইতে লিখিত।)

তৃতীয় প্রবন্ধ।

বিলাতী অথবা মিট কি ঘৃত কুষ্মাণ্ড।—ইহা প্রায় সকল মৃত্তিকাতেই উৎপন্ন হয়। তবে দোঁয়াস মৃত্তিকাতে অধিক জন্মে। সর্ব্ব প্রকার জমিতে সার দিয়া রোপণ করিলেই ইহার ফল উৎপন্ন হয়। কিন্তু যে স্থানে জল বদ্ধ হয়, সে স্থানে ইহা জন্মে না। গিমি কুমড়ার ন্যায় আবাদ করিয়া অন্য যে কোন স্থানে ইহার বীজ রোপণ করিলেই গাছ উৎপন্ন হইয়া ফল প্রদান করে।

প্রায় সকল মাসেই ইহার বীজ রোপণ করা যায় ; তন্মধ্যে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসই প্রশস্ত। বীজ রোপণ করিলে যতদিন না চারা বাহির হয়, ততদিন উহাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল সেচন করা কর্ত্তব্য। ইহার গাছ মৃত্তিকার উপর বর্দ্ধিত হইয়া ফলিত হয়।

ইহার তরকারী সুস্বাদু। সুপক্ক ফল অধিক দিন রাখা যায়।

ঝিঙ্গা তরই।—স-সার দোঁয়াস পলি মৃত্তিকাই ইহার পক্ষে প্রশস্ত। যত্ন করিলে অন্যপ্রকার মৃত্তিকাতেও ইহা জন্মিতে পারে।

গাছের গোড়ায় জল জমিলে ইহা মরিয়া যায়। প্রায় সর্ব্বপ্রকার স্থানে ইহার গাছ জন্মে ; কিন্তু বর্ষার জল যে জমিতে জমে, তথায় ইহা উৎপন্ন হয় না।

চৈত্র, বৈশাখ মাসেই ইহার বীজ রোপণের সময়।

এক হস্ত পরিমিত একটী গর্ত্ত করিয়া, তাহাতে স-সার মৃত্তিকা দ্বারা পূরণ করিবে। একবার তাহাতে জল সেচন করিয়া ৩।৪ দিবস জল সেচন বন্ধ রাখিয়া, পরে তাহা হস্ত দ্বারা বা অস্ত্র দ্বারা খুঁড়িয়া ইহার বীজ উহাতে রোপণ করিবে। বীজ যেন অর্দ্ধ ইঞ্চি জমির নীচে না যায়। চারা বাহির হইলে কাটি পুঁতিয়া মাথা বাঁধিয়া ইহার আশ্রয় করিয়া দিবে। ইহার যথেষ্ট ফল হয়, উহা তরকারীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধুধুঁল।—ইহার চাষ ঝিঙ্গার ন্যায়। চৈত্র, বৈশাখ মাসে বীজ রোপণ করিতে হয়।

চিচিঙ্গা।—ইহারও চাষ ঝিঙ্গার ন্যায়। চৈত্র, বৈশাখ মাসে বীজ রোপণ করিতে হয়।

সিম, ছিম ; মাখন সিম।—শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে সিম দুই প্রকার। ইহা পলি ও স-সার দোঁয়াস মৃত্তিকাতে উত্তম হয়। অন্য মৃত্তিকাতেও হইয়া থাকে। গোড়ায় জল জমিলে গাছ মরিয়া যায়।

বৈশাখ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ রোপণের সময়। বীজ রোপণের পর বৃষ্টি না হইলে জল সেচন করিতে হয়, নচেৎ বিলম্বে অঙ্কুরোৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহার রোপণ-প্রণালী ঝিঙ্গার ন্যায়। ইহার গাছ উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত মাচা করিয়া দিতে হয় এবং গৃহের চালে উঠাইয়া দিলেও হয়। অধিক পত্র হইয়া নাল সকল আচ্ছাদিত হইলে ফল অধিক হয় না, এজন্য কার্ত্তিক মাস হইতে সময়ে সময়ে অনেক পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়। মৃত্তিকাতে রস না থাকিলে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ফল উৎপন্ন হয়। ইহার সুপক্ক বীজের দালি হইতে পারে। ইহার তরকারী উত্তম।

নানাপ্রকার সিম আছে যথা ;—গজাল কি গোবীজা, ঘৃত-কাঞ্চন, কলাই, কাটুয়া, লেবি, তেলাপিয়াজ, তিরাধাপ, সুন্দরকোটা, জামপুলি, কালমাচারি।

বড়বটি।—সিম যেরূপ মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয়, ইহাও তদ্রূপ মৃত্তিকায় জন্মিয়া থাকে। সিম উৎপাদনের প্রণালী আর ইহার উৎপাদন প্রণালী—একই প্রকার।

চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস বীজ রোপণের সময়। অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ইহার প্রচুর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইহার সুপক্ক বীজের দালি হয়। কাঁচা ফলে উত্তম তরকারী হয়।

কারবেল্লী, করেলী, উচ্ছে, উচতা।—ইহা পলি ও দোঁয়াস মৃত্তিকাতে উত্তম হয়। নীরস মৃত্তিকাতে ইহার বীজ রোপণ করিলে জল সেচন করিতে হয়। যে জমিতে অধিক রস আছে বা জল উঠে—তাহাতে ইহা জন্মে না।

কার্ত্তিক মাস হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ রোপণের সময়।

জমিতে জঙ্গল থাকিলে দুইবার চাষ দিয়া জমি সমতল করিয়া, দশ দশ ফুট অন্তর ৩।৪টী বীজ রোপণ করিতে হয়। মৃত্তিকার অর্দ্ধ ইঞ্চির অধিক নীচে বীজ যেন প্রবিষ্ট না হয়। মৃত্তিকায় রস না থাকিলে কয়েক দিন সন্ধ্যার সময় অল্প অল্প জল সেচন করিবে। জল না দিলে অঙ্কুর বাহির হইতে বিলম্ব হইবে। অঙ্কুর উদ্গত হওয়ার পর মধ্যে মধ্যে জল দিলে মৃত্তিকাতেই বর্দ্ধিত হইবে। গাছের নীচে খড় পাতিয়া দিলে ফল অধিক বড় হয়।

ফাল্গুন মাস হইতে ফল হইতে আরম্ভ হয়, বর্ষার সময় অধিক ফল জন্মে। ইহা তরকারীতে ব্যবহার করা হয়।

কারবেল্ল, করলা, কল্লা।—উচ্ছে যে প্রকার মৃত্তিকাতে উৎপন্ন হয়, ইহাও সেইরূপ ভূমিতে জন্মিয়া থাকে। ক্ষেত্রে রোপণ করিলে ভাল হয় না। সিম প্রভৃতি যেরূপে উৎপন্ন হয়, ইহাও তদ্রূপে উৎপাদন করা উচিত।

কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ রোপণের সময়। মাঘ মাসে রোপণের ফল খুব বড় হয়।

এক ফুট পরিমাণ একটী গর্ত্ত করিয়া সার-সহ মৃত্তিকা দ্বারা পূরণ করিয়া হস্ত দ্বারা দাবিয়া, এক এক স্থানে ৩।৪টী বীজ রোপণ করিবে। আবশ্যক মত জল দিবে। ইহার গাছ মৃত্তিকাতে ভাল হয় না ও অধিক ফল দেয় না বলিয়া, ইহার জন্য মাচা করিয়া দিতে হয়। ফাল্গুন মাস হইতে ফল দিতে থাকে। উচ্ছে অপেক্ষা ইহার ফল বড় ও দীর্ঘ হয়। ইহা তরকারীতে ব্যবহৃত হয়।

কার্কটিক, কাঁকরোল।—পলি ও দোঁয়াস মৃত্তিকাই ইহার চাষের পক্ষে প্রশস্ত। যে স্থানের মৃত্তিকাতে বালির ভাগ অধিক—তথায় ইহা অল্প পরিমাণে জন্মে। যে স্থানে জল বদ্ধ হয় ও বর্ষার সময় যে স্থানে অধিক জল হয় না, তথায় ইহা জন্মে না।

চৈত্র মাসের শেষ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ইহার মূল ও শিকড় হইতে স্বতঃ অঙ্কুর বাহির হয়। সেই উদ্গত চারা সহ মূল কি শিকড় উত্তোলন করিয়া রোপণ করিতে হয়, অথবা চারা জন্মিবার পূর্ব্বে মূল উঠাইয়া আনিয়া রোপণ করিতে হয়। সেই মূল অগ্নির তাপ দিয়া রোপণ করিলে ফল বড় ও অধিক উৎপন্ন হয়। চারা বড় হইলে মাথা বাঁধিয়া দিতে হয়। বৈশাখ মাসের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ফল হয়। শীতের সময় গাছ মরিয়া যায়। একবার রোপণ করিলে ৫।৭ বৎসর ঐ মূল হইতে চারা জন্মিয়া ফলিত হয়। ইহা উত্তম তরকারী।

ত্রপুসী, শশা, সোঁয়াস।—শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে শশা দুই প্রকার; ইহা সরস সসার সর্ব্বপ্রকার মৃত্তিকাতেই উৎপন্ন হয়। পলি ও দোঁয়াস মৃত্তিকাতে অধিক জন্মে ও ফসল বড় হয়। খিয়ারু মৃত্তিকাতে ফল ছোট হয়; কিন্তু উত্তম স্বাদ হয়। গাছের গোড়ায় জল বদ্ধ হইলে গাছ মরিয়া যায়।

চৈত্রের শেষার্দ্ধ হইতে জ্যৈষ্ঠের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ইহার বীজ রোপণের সময় ও ইহাতে ফল বড় হয়। অন্য সময়ও আবাদ হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে ইহার আবাদ করে না, বাটীর নিকটস্থ স্থানে চারা জন্মায়। রোপণের সময়ানুসারে ইহার ফল সর্ব্বসময়ে পাওয়া যায়।

সিমাদি যেরূপে রোপণ করিতে হয়, ইহাও সেই নিয়মে রোপণ করা কর্ত্তব্য। উহাদিগের ন্যায় ইহারও মাচা বাঁধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ইহার অধিক ফল হয়। ৭।৮ মাসের অধিক ইহার গাছ জীবিত থাকে না। জলযোগে ও নিরামিষ তরকারীতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

[ক্রমশঃ।

চীফ্ কমিস্যারিয়েট্ বিভাগের কার্য্য।

কলিকাতায় কমিস্যারিয়েটের কার্য্য দুই স্থানে আছে,—বালুঘাটায় অর্থাৎ খিদীরপুরের নিকট এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সন্নিকট। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সন্নিকট কমিস্যারিয়েটের যে আফিস আছে, তাহাকে "চীফ্ কমিস্যারিয়েট" আফিস কহে। ইহার সঙ্গে বালুঘাটার আফিসের কোন সম্বন্ধ নাই। শুনা যায়, ভারত গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের প্রেসিডেন্সি বিভাগে, যথা—কলিকাতার কেল্লা, দমদমা এবং বারাকপুর প্রভৃতি স্থানের সৈন্যদিগের খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় বস্তু এই আফিস হইতে ক্রয় করিয়া সরবরাহ করা হইয়া থাকে। বালুঘাটাস্থিত আফিসের এবং এই আফিসের কার্য্যের সেরেস্তা একবিধ আছে। বলিতে পারি না, এই সকল আফিসের কার্য্যের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের অনুমোদিত কোনও নিয়মাবলী আছে কি না। অনেকের ধারণা ঐ সকল আফিসের জেনারল আফিসর মহোদয়েরা স্ব-ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া অথবা তাঁহাদের নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের পরামর্শ মতই দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকেন। আজ আমরা চীফ্ কমিস্যারিয়েটের কার্য্য-প্রণালীর নিয়মাবলী এই

স্থলে উল্লেখ করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত নিয়মে দ্রব্যাদি এই আফিসে লওয়া হইয়া থাকে। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সকল সময়ে ইঁহাদের নিয়মের স্থিরতা থাকে না।

এই আফিসের যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহার একটী তালিকা অন্ততঃ ২।৪ দিন পূর্ব্বে এক্সচেঞ্জ গেজেটে বিজ্ঞাপন স্তম্ভে বাহির হয়। আর আফিসের দ্বারদেশেও উহা বিজ্ঞাপন-বোর্ডে লিখিত হয়। উক্ত বিজ্ঞাপনে সমুদয় বিষয়ই লিখিত হয়, "কবে মাল দিতে হইবে?" "কি কি মাল দিতে হইবে?" "বায়না (আর্ণেষ্টমনি) কত টাকা দিতে হইবে?" ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ই থাকে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহাদের লিখিত একখানি বিজ্ঞাপন এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

Supply and Transport.

NOTICE.

Verbal offers will be received by the Chief Supply and Transport Officer Calcutta at 12 noon on the 19 September.

Tumeric	...	960 lbs.
Chillies	...	960 „
Gaulic	...	960 „
Ginger green	...	1,920 „
Dall Arhar	...	6,640 „
„ Moong	...	6,640 „
„ Channa	...	6,720 „
Ghee	...	10,000 „
Gour	...	4,800 „

Amount of earnest money Rs 125.

উহাতে দেখিলেন, প্রথম টেমারিক অর্থাৎ হরিদ্রা ৯৬০ পাউণ্ড, দ্বিতীয় চিলি অর্থাৎ লঙ্কা ৯৬০ পাউণ্ড, তৃতীয় গ্যালিক অর্থাৎ লশুন ৯৬০ পাউণ্ড, চতুর্থ জিঞ্জার গ্রিণ অর্থাৎ আদা ১৯২০ পাউণ্ড, পঞ্চম দাউল অড়হর ৬৬৪০ পাউণ্ড, ষষ্ঠ দাউল মুগ্ ৬৬৪০ পাউণ্ড, সপ্তম দাউল চানা বা ছোলা ৬৭২০ পাউণ্ড, অষ্টম ঘৃত ১০০০০ পাউণ্ড, এবং নবম গুড় ৪৮০০ পাউণ্ড দিতে হইবে।

এবার নয় দফা দ্রব্য আছে; কিন্তু কোন বার তিন দফা হইতে পারে, কোন বার ১২ দফা বা তদূৰ্দ্ধ দফা হইতে পারে। সাধারণের দর লইয়া, যাঁহার দর কম হইবে, তাঁহাকেই মাল দিতে হইবে। দ্রব্যগুলি প্রথম শ্রেণীর ভাল দ্রব্য চাই, কিংবা কিরূপ দ্রব্য চাই, দর দিবার পূর্ব্বে, বায়নার টাকা জমা দিলেই তাহা আপনাকে দেখান হইবে। আপনি ইচ্ছা করিলে এই আফিসে আসিয়া Earnest money জমা দিয়া দর দিতে পারেন। সাধারণকেই এজন্য আহ্বান করা হয়। ইঁহাদের টেণ্ডার ফারম নাই। স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নিলামের মত দর দিতে হয়! ইহাতে যে জিনিষটীর দর যাঁহার কম হইবে, তিনিই সেই দ্রব্যটী সরবরাহ করিবার ভার প্রাপ্ত হইবেন। দর দিবার পূর্ব্বে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, উক্ত সকল দ্রব্যের দর হাণ্ড্রেট্ ওয়েটের উপর দিতে হয়। আমাদের কলিকাতার বাঙ্গালা ওজন ৮০ সিক্কা মণের উপর দর হয় না। হাণ্ড্রেট্ পাউণ্ডের উপর দর দেওয়ার হিসাবটীও বেশী শক্ত নহে। 'আমাদের বাঙ্গালা ১৴০ মণ ⁄৮ সের ॥৵০ ছটাকে উঁহাদের এক হাণ্ড্রেট্ হয়, অতএব ব্যবসায়ীরা তাড়াতাড়ি এইরূপ হিসাব করে। মনে করুন, গুড়ের দর ৪॥০ টাকা (বাঙ্গালা), উহার ১৴০ মণ ।০ সেরের দাম কত? তাহা হইলে ৪॥০ টাকার সিকি ধরিতে হয়, ৪৲ টাকার সিকি ১৲ টাকা, ॥০ আনার সিকি ৵০ আনা, মোট হইল ১৵০ আনা; ইহা ৪॥০ টাকায় যোগ দিলে ৫॥৵০ হয়; অর্থাৎ ১৴০ মণ ।০ সের গুড়ের দাম ৫॥৵০ হইল। আপনাকে ১৴৮॥৵০ গুড়ের দর দিতে হইবে। তাহা হইলে যদি ১।০ সেরে ৫॥৵০ হয়, তবে উহা হইতে ⁄১।৵০ পোয়ার দাম বাদ দিলেই ১৴৮॥৵০ ছটাকের দাম হইবে। ৪॥০ টাকা মণ, ⁄১।৵০ পোয়ার দাম ৵৫ পয়সা। তাহা হইলে ৫।৶১৫ হইল। বাজার অনুসারে আপনি ৫॥০ সাড়ে পাঁচ টাকা এক হন্দর গুড়ের দর দিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আরও কথা আছে। উক্ত দ্রব্য কোথায় দিতে হইবে, সে স্থান পর্য্যন্ত গরুর গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি যাহা কিছু খরচা, তাহা আপনাকে দিতে হইবে। উহাও একটা আন্দাজী ধরিয়া মণ প্রতি যাহা হয়, তাহা ধরিতে হইবে। ইহা ভিন্ন উঁহাদের আফিস খরচ কিছু আছে কি না, তাহাও জানা দরকার। এই আফিস খরচ যে কেন এবং কি, তাহা আমরা জানি না। শুনিতে পাই, যে সকল ঠিকাদার ইহাদের মাল যোগান দেন, তাঁহারা গুড়ের খরচা মণকরা ।৵০ আনা ধরিয়া মাল দিয়া থাকেন। ইহাতে

গরুর গাড়ীর ভাড়া, কুলী, দালালী এবং মালের কম্‌তা ইত্যাদি যাহা কিছু, সমুদয় থাকে। দ্রব্যের দর অনুসারে খরচার ইতর-বিশেষ হয়।

যাহা হউক, পূর্ব্বে ধরিয়াছিলাম, এক হন্দর গুড়ের দর ৫।৷০ পাঁচ টাকা আট আনা এবং খরচা ধরুন ।৵০ আনা, ৫৸৵০ হইল। লাভ ধরুন ৵০ আনা, মোট ৬৲ টাকা। এইরূপ সমুদয় দ্রব্যগুলি বাজার দর যাচাই করিয়া, উহা ১৵০ মণ ৮ সের ১০ ছটাকে কসিয়া, উহার খরচা এবং লাভ রাখিয়া, প্রস্তুত হইয়া আসিয়া, বায়নার টাকা জমা দিয়া নিলাম ডাকিতে থাকুন। ইহাতে যাহার অদৃষ্টে যাহা হুকুম, হইল। আর একটা কথা আছে। লেখা আছে, ঘৃত দশ হাজার পাউণ্ড; কিন্তু উহা কত মণ, ইহাও দর দিবার সময় জানিতে ইচ্ছা হয়। এইজন্য ব্যবসায়ীরা ইহার একটা সঙ্কেত বাহির করিয়াছেন, দক্ষিণের দুইটা অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে যাহা থাকে, তাহার সিকি ধরিয়া একটা আন্দাজী মণ ধরা হয়। কেন না, এক মণ আট সের দশ ছটাকে ইংরাজী মণ বা হন্দর। এখন ধরুন ১০০০০ দশ হাজার, ইহার দুইটা অঙ্ক ছাড়িয়া দিউন অর্থাৎ ০০ দুইটা শূন্য বাদ গেল। তাহা হইলে ১০০ রহিল। এই ১০০ শতের সিকি ২৫। অতএব ঘৃত দশ হাজার পাউণ্ডে ১২৫ মণ আন্দাজী ধরা হইল।

এখন ধরুন, আপনার অদৃষ্টক্রমে আদা, ঘৃত এবং মুগের দাউল হইল। আপনার বায়নার টাকা তথায় জমা রহিল, আপনার স্বাক্ষর লওয়া হইল। আপনি আনন্দিত মনে বাটী আসিলেন। কেন না, আপনি একরূপ অগ্নি পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু ও হরি! কিছুই নহে, উহা সর্ব্বই মিথ্যা। সে দিন আপনার টাকা এবং মাল যাহা যাহা হইয়াছিল, স্বাক্ষর লইবার সময় আপনাকে বলিবে, "আপনি যান্, সংবাদ যাইবে।" সে সময় আপনি ভাবিবেন, কোথায় মাল দিব, তাহাই বোধ হয় পত্রে লিখিবে। কিন্তু ষোল কড়াই কাণা! সংবাদ আর আইসে না। ২।৩ দিন গেল। কাজেই আপনাকে সেই আফিসে ছুটিতে হইল; কেন না, ৪ দিনের মধ্যে মাল দিতে হইবে। তথায় গিয়া শুনিলেন, আপনার যাহা যাহা হইয়াছিল, সাহেব তাহা "রিজেক্ট" করিয়াছেন। "অতএব আপনি বায়নার টাকা ফেরত লইয়া যাউন।" এরূপ হয় কেন? ইহাকেই "ফারম অফারের" কাজ বলে, অর্থাৎ তুমি মাল দিবে, তোমার পাকা, তুমি বায়না দাও, না দিতে পার, বায়নার টাকা কাটিব। আমি মাল লইব কি না, তাহা সন্দেহ। ইচ্ছা

হইলে লইতে পারি এবং নাই লইলাম, তাহাতে তুমি কিছু করিতে পারিবে না। চাকর মনিব সম্পর্কে যেমন ইতর-বিশেষ আছে, সাহেবি লাথিতে দরিদ্র ভারতবাসীর মৃত্যু হইলে, সাহেবের যেমন কিছুই শাস্তি হয় না, সেইরূপ ব্যবসায়ীদিগের ভিতর "ফারম অফার।"

সে দিন "হাইয়েষ্ট বিডে" তোমাদের দর লইয়া, তাহাতে যাহার কম দর ছিল, তাহার নিকট ফারম অফারে স্বাক্ষর করান হইল। তৎপরে সাহেব বাজারে লোক পাঠাইয়া, দর যাচাই করিলেন। তুমি ৵০ আনা লাভে মাল বিক্রয় করিয়াছ, ইহা সাহেব জানিলে, তাঁহার গোমস্তা দিয়া সেই মাল বাজার হইতে ক্রয় করিলেন, তোমার বায়নার টাকা ফেরত দিলেন। এই রূপ করা হয় কেন? যদি আমাদের নিকট মাল লইবে না, কেবল দর লইবে, ইহা পূর্ব্বে বলিলেই হইত! তাহার একটা কারণ আছে। বাজার স্থির থাকে না। দরের বাজারে জোঁয়ার ভাঁটা খেলে। তুমি যে দ্রব্যটীর দর এই মাত্র ৫৲ টাকায় এখানে বিক্রয় করিয়া গেলে, পরদিন উহার দর ৫।।০ টাকা হইল। এই সব সময় বাঁচাইবার জন্যই এই কৌশল! যাহা হউক, তোমার দর কম হইলে তোমাকে নিশ্চিত বলা হইবে, "তুমি অমুক দিনের মধ্যে অমুক স্থানে এত পাউণ্ড দ্রব্য উপস্থিত করিবে।" তুমি তাই করিলে, কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই।

যে সকল মাল তুমি পাঠাইয়াছ, এইবার তাহার পরীক্ষা হইবে। এস্থলে যদি তোমার অদৃষ্ট খুব ভাল হয়, ঘুসের বল বেশী থাকে, তবেই নিস্তার। নচেৎ তোমার অতি উৎকৃষ্ট মাল হইলেও তাহা "রিজেক্ট!" বিচার আচার নাই। ইহা গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের সৈন্য বিভাগের কাজ। এদেশী লোক, যাহারা এ কাজ করে, তাহারা ঘুসের জোরে ঘোড়া বিক্রয় করিয়া ভেড়া চালাইয়া আইসে, তাহাও চলিয়া যায়। কিন্তু চীফ্ কমিস্যারিয়েটে ঘোড়ার স্থানে ভেড়া চলে না বটে; বালুঘাটের কমিস্যারিয়েটে ইহা পূর্ব্বে চলিত। এখন তথায়ও নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন হইতেছে। কি পরিবর্ত্তন হয়, তাহা পরে বলিব। ফলে, কমিস্যারিয়েটের কার্য্যে সাধারণকে জানান হয় বটে, কিন্তু সাধারণ ভাবে সরল পথে কোন কার্য্য হয় না। সাধারণের মধ্যে যাঁহারা অসাধারণ পাকা জুয়াচোর, তাঁহারাই ঘুস-ঘাসের বলে এ কাজ করিতে পারে। শ্রীঃ—

নৌপদা।

এদেশের ইংরাজী বানান এইরূপ Naupada. ইহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তেলেগু দেশের একটী ক্ষুদ্র পল্লিগ্রাম অর্থাৎ মফঃস্বল। হাবড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৫।।১০,মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া ৮৸৵০। নৌপদায় ষ্টেশন আছে। ষ্টেশন হইতে গ্রামের ভিতর যাইতে ২।।০ মাইল পথ। অশ্বযান এ গ্রামে আদৌ নাই; গো-শকট আছে। গ্রামের লোকসংখ্যা অতি অল্প; বোধ হয় এক হাজার লোক আছে। কলিকাতা হইতে নৌপদা ৪৩৬ মাইল দূর। এই ষ্টেশনে আসিতে হইলে রেলের পথে চিল্কা হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রাম হইতে সাগর ৪ ক্রোশ দূরে। রাত্রিকালে এই গ্রাম হইতে সমুদ্রের তরঙ্গের গর্জ্জন শুনা যায়। ষ্টেশন হইতে গরুর গাড়ীর ভাড়া তিন আনা, চারি আনা বড় জোর। এই গ্রাম হইতে চাউল, কুল্তি এবং লবণের ব্যবসা করা যাইতে পারে। আমরা ভাদ্র মাসে এই গ্রামে গিয়াছিলাম। এখন এখানে চাউল, কুল্তি পাওয়া যায় না, ষ্টোরে সঞ্চিত লবণ পাওয়া যায়। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাস হইতে লবণ, চাউল, কুলতি সবই পাওয়া যাইবে। এদেশের মাটিতে সমুদ্রের জল ছাঁচিয়া লবণ তৈয়ারী হয়। ইহা দানাদার লবণ। সমুদ্র হইতে একটা ক্যানাল দ্বারা এদেশের লবণক্ষেত্রের নিকট জল আনা হইয়াছে। এদেশের লবণ কটক, পুরী, জাজপুর, ভদ্রক প্রভৃতি স্থানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রীত হয়; কিন্তু ইহার মধ্যে কটকেই বেশী। এদেশের ওজন ইংরাজী; অতএব কলিকাতার সঙ্গে মিল আছে। এখানে এক মণ লবণ "তের পাওলা" অর্থাৎ তের পয়সা। পাওলা অর্থে পয়সা। মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের ডিউটী মণকরা ২৲ দুই টাকা, সুতরাং মোট এক মণ লবণ ২৶৫ পয়সা। এ গ্রামের সকলেই তেলেগু। দরিদ্র দেশ। ২।৫ জন মধ্যবিত্ত তেলেগু ভিন্ন অন্যান্য সকলেই দরিদ্র। গ্রামের মধ্যে ২।৫ জন ইংরাজী ভাষা বুঝেন, ২।৫ জন উড়িয়া ভাষা বুঝেন, অপরাপর সকলেই তেলেগু ভিন্ন অন্য কোন ভাষা বুঝেন না। কার্য্য উপলক্ষে এদেশে ১টী ইংরাজ, জন কয়েক উড়িয়া এবং কয়েকজন মুসলমান বাস করেন। ইহা ভিন্ন সব অধিবাসী তেলেগু। এদেশে ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য,

ডিম্ব, কুমড়া, কলা, তেঁতুল, লেবু, পান, সুপারি, মুড়ি, কড়াই ভাজা, চাউল, অরহর, মুগ, কলাই, হরিদ্রা, লঙ্কা, সরিষা, আমাচার পাওয়া যায়। সরিষার তৈল কিন্তু ভাল নহে। চুরুট পাওয়া যায়, বর্ম্মার চুরুটের মত ৬টা এক পয়সা। টিকে, তামাক নাই। দেশালাই এবং কেরসিন তৈল আছে। এক লবণের কাজেই এদেশের প্রায় সমুদয় লোক প্রতিপালিত। লবণের কাজের জন্য এদেশী দরিদ্রেরা কুলি, মধ্যবিত্তেরা লবণের প্রস্তুতি-কর্ত্তা, কেহ বা নুনের কুঠিতে কেরাণী। গরুর গাড়ির গাড়য়ানেরাও এই কার্য্যের জন্য এদেশ-বাসী। পূর্ব্বে এদেশে মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের লবণের কুঠি ছিল না, গঞ্জামে ছিল। এখনও গঞ্জামে আছে, তবে ইছাপুরে (গঞ্জাম জেলা) এবং নৌপদায় এই দুই স্থানে কিছুদিন হইল হইয়াছে। ইহাতেই বোধ হয়, এদেশ পূর্ব্বে মাঠ ছিল। এখানে লবণের একটী কুঠি। ইহার ৪টী প্ল্যাটফরম। এই ৪টী প্ল্যাটফরমকে ৪টী গুদাম বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ গুদামের ছাদ নাই, দেয়াল নাই, ৪টী শূন্য মাঠে এক এক স্থানে স্তূপাকারে, যেন বাঙ্গালা দেশের ইটের পাঁজার মত সাজান। ইহাকে লবণের কাঁড়ি বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক কাঁড়ি বিচালি দ্বারা ছাওয়া অর্থাৎ খুব স্থূলভাবে বিচালি দিয়া ঢাকা। এই এক কাঁড়িতে ২৪ শত মণ লবণ থাকে। প্রত্যেক প্ল্যাট্‌ফরমে বোধ হয় ৫০টা করিয়া লবণের কাঁড়ি আছে। এইরূপ ৪টা প্ল্যাট্‌ফরম। হিসাব করিয়া দেখুন, এই স্থানে বৎসরে কত লবণ সঞ্চিত থাকে। প্রত্যেক কাঁড়ির গাত্রে এক খণ্ড কাষ্ঠফলকে সন এবং কাঁড়ির নম্বর লেখা আছে। প্রতি বৎসর যে এই সঞ্চিত লবণ সমুদয় বিক্রীত হয়, তাহা নহে। তবে অধিকাংশ বিক্রীত হয়। ১০।২০টা পুরাতন কাঁড়ি থাকে মাত্র। লবণের ৪টী প্ল্যাটফরম কিছু দূরে দূরে অবস্থিত। নৌপদা ষ্টেশন হইতে ২॥০ মাইল পথ কেবল এই লবণের জন্য একটী রেল লাইন খোলা হইয়াছে। ৩ নম্বর প্ল্যাট্‌ফরমে আসিয়া এই রেলপথ থামিয়াছে। এজন্য ১নং, ২নং ও ৪নং প্ল্যাট্‌ফরমের লবণ গরুর গাড়ী করিয়া আনিয়া ৩ নম্বর প্ল্যাটফরমে মাল বোঝাই দিতে হয়; কিন্তু ৩নং প্ল্যাটফরমে লবণ লইলে মহাজনের উক্ত গরুর গাড়ীর ভাড়া বাঁচিয়া যায়, উহা কেবল কুলি দ্বারা সমাধা হয়। এইজন্য ৩ নং প্ল্যাটফরমের লবণের দরও কিছু বেশী।

বঙ্গদেশের মাঠের চারিদিকে যেমন আলি-দেওয়া শস্যক্ষেত্র দেখা যায়, এখানে আসিয়া সেইরূপ আলি-দেওয়া লবণক্ষেত্র দেখিলাম। এই সকল ক্ষেত্রের

নিকট সমুদ্রের ক্যানাল অর্থাৎ খাল। বর্ষাকালে এদেশে লবণ তৈয়ারী হয় না। অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে এই সকল ক্ষেত্রে কুলি দিয়া সমুদ্রের খালের জল ছাঁচিয়া দেওয়া যায়। আইলের উচ্চতানুসারে মাঠে সমুদ্রের জল যেন চৌবাচ্ছায় ধরা হইয়াছে, তখন মাঠের অবস্থা দেখিতে এইরূপ হয়। এক দিন রাখিয়া পরদিন আল খুলিয়া মাঠ হইতে জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়। পুনরায় উহাতে সমুদ্রের জল ছাঁচিয়া ধরা হয়, পরদিন আবার উহাকে ছাড়া হয়। এইরূপ করিতে করিতে ২।৩ দিন পরে মাঠের জল বাহির করিয়া দিলে দেখা যায় যে, লবণের দানা সকল মাঠে জমিয়াছে। উহা কোদাল দিয়া চাঁচিয়া লওয়া হয়। মাঠের মৃত্তিকা বাহির হইলে চাঁচা বন্ধ করা হয়। যাহার যে মাঠ জমা, তাহাকে খরচা করিয়া ইহা করিতে হয়, এবং প্রত্যহ যে লবণ উৎপন্ন হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টের গুদামে তুলিয়া দিয়া আসিতে হয়। তথায় তাহার নামে হিসাবাদি থাকে। এই লবণ-গোলায় ১৫।১৬ জন মান্দ্রাজী সৈন্য আছে। তাঁহা ভিন্ন গ্রামে পুলিস নাই, মিউনিসিপ্যালিটী নাই। অথচ পথ ঘাট পরিষ্কার। এদেশের মোকর্দ্দমাদি বহরমপুরে হয়। ইহার ভিতর এখনও ইংরাজী বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই। জর্ম্মাণীর প্রস্তুত দ্রব্য এদেশে দেখিলাম না। নানাবিধ ব্যাধির উৎপাতও নাই। গ্রামে একটী স্কুল আছে, তথায় ইংরাজী, উড়িয়া ও তেলেগু পড়ান হয়। ৩টী শিব মন্দির আছে। গির্জ্জা দেখিলাম না। পাইখানা নাই। ইষ্টকের বাটী নাই বলিলেই হয়। মৃত্তিকার দেয়াল, খড়ের চালই বেশী। গৃহের জানালা নাই। কুটীরের দাওয়া আছে। ঘরের চাল দাওয়ার সহিত প্রায় একত্রীকৃত। পোষ্টাফিস আছে। দেশের লোক সকলেই সুস্থ এবং বলবান; কিন্তু সাহস কম। পুষ্করিণী দেখি নাই। প্রত্যেক বাটীতে ইঁদারার মত বৃহৎ পাতাকুয়া আছে। কূপের ২০।২৫ হস্ত নিম্নেই জল। ধুতুরা এবং বেল, জুঁই ফুলের গাছ দেখিলাম। ঝাউ গাছ অনেক আছে। এক আঁটি কাষ্ঠের মূল্য দুই পয়সা। ঘৃত এক ছটাক এক পয়সা। মৎস্য পাওয়া যায়, দামও শস্তা। শুক্না মৎস্যও আছে দেখিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এদেশী লবণ কটক, প্রভৃতি স্থানে চলে। ৯০০ টাকা মূলধনে এক ওয়াগান লবণ লইয়া কটকে বিক্রয় করিলে একটা লোকের পোষায়। কটক প্রভৃতি অঞ্চলে লবণ ২/০ মণী বস্তার হিসাবে বিক্রয় হয়। এক বস্তায় ২/০ মণের স্থলে ১৫৭ কিংবা ১৫৫ সের হইলেও তাহার

মূল্য ২/০ মণের হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয়। এক ওয়াগানে ৪০০/০ মণ হইতে ৪১০/০ মণ পর্য্যন্ত লবণ লওয়া যায়। দুই মণী বস্তা হইলে উহাতে ২০০ শত হইতে ২০৫ বস্তা পর্য্যন্ত হয়। কিন্তু ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীরা মণের হিসাবে লবণের মূল্য গবর্ণমেণ্টকে দিয়া, বেশী লবণ দেয়। মনে করুন, ৪০০/০ মণ লবণ লইলে, উহা ২/০ মণী হিসাবে ২০০ বস্তা হইবে, উহার স্থলে ২০৫ বস্তা করিয়া লয়। নৌপদা হইতে কটক পর্য্যন্ত রেলের ভাড়া ৵১৫। ইহা বড় বেশী। লবণের গুদাম গুলিতে আচ্ছাদন নাই। বর্ষার সময় লবণ ওজন হয় না। ওজন করিতে করিতে জল আসিলে, মহাজনের সমূহ ক্ষতি হয়। অতএব বস্তা ওজনের স্থানে ছাউনী করা উচিত। লবণের কাঁড়ির কাছে একটা বৃহৎ দুই মণী মাপের তাম্রপাত্রের ঢক আছে। প্রথমে ইহাতে মাপিয়া লবণ বস্তায় পুরা হয়, এবং বাহিরে থাক্ দিয়া রাখা হয়। তৎপরে বিলাতী কাঁটায় শতকরা দশ বস্তা সাহেবের ইচ্ছানুসারে ওজন করা হয়। ইহাতে কম হইলে ধরিয়া পাওয়া যায়, বেশী হইলে ধরিয়া দিতে হয়।

মধু-সংগ্রহ।

ফুল ও মধু পরস্পরের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। মধুমক্ষিকারা মধুসঞ্চয় জন্য ফুলের বাগানে যায়। সুতরাং যাহারা ফুলের চাষ করে, তাহারা একটু যত্ন করিলে মধুসংগ্রহের ব্যবস্থাও করিতে পারে। উহার জন্য পরিশ্রম তেমন করিতে হয় না, এবং অসুবিধাও তেমন নাই। বিলাতে এবং ইউরোপে ইহার খুব বড় বড় কারবার আছে; ইউনাইটেডষ্টেট্সে খুবই বেশী। সম্প্রতি তথা হইতে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তদ্দারা জানা যায় যে, অন্ততঃ ত্রিশ হাজার লোক সমগ্র সময় ঐ কার্য্যেই ক্ষেপণ করিয়া থাকে। একশতাধিক সভাসমিতি ইহার জন্ত এ যাবৎ সংগঠিত হইয়াছে। মৌচাক প্রস্তুতির জন্য পনরটি বড় বড় কুঠি আছে। গড়ে বৎসরে প্রায় আঠারশত মণ মধু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

খণ্ড খণ্ড বহুসংখ্যক মোমের চাদর ফুল-বাগানে উর্দ্ধে ঝুলাইয়া রাখা হয়। মৌমাছিরা উহাতে কাজ করিবার সুবিধা পাইয়া, মধু আহরণ করতঃ

উহাতেই মৌচাক প্রস্তুত করে। কতকটা মধু সংগৃহীত হইলেই উহা ঢালিয়া লওয়া হয়। মৌমাছিরা তখন নূতন করিয়া কাজ আরম্ভ করে। বিজ্ঞান-বলে আজও মৌচাক প্রস্তুতির উপায় হয় নাই, সুতরাং উহার জন্য মৌমাছিদিগকেই কাজ করাইয়া লইতে হয়।

ভারতের লোকে এ কারবার করিতে জানে না। এখানে মধুসংগ্রহের জন্য জঙ্গলবাসী লোকদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। উহারা জঙ্গলে বেড়াইয়া মৌচাক দেখিতে পাইলে তাহা হইতে মধু সংগ্রহ করে, এবং বেনিয়ার দোকানে বিক্রয় করিয়া ফেলে। হিমালয় পর্ব্বতে এবং নীলগিরি পর্ব্বতের কোন কোন অংশে পার্ব্বতীয় লোকে তাহাদের অভ্যস্ত প্রথানুসারে মধু সংগ্রহ করে। পার্ব্বতীয় অঞ্চলে সংগৃহীত মধু অতি উৎকৃষ্ট বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। উট্‌কামুণ্ড-নিবাসী বিবি ব্যাচিলার নীলগিরি পর্ব্বত অঞ্চলে বিচরণকারী নানাজাতীয় মৌমাছির বর্ণন করিয়াছেন এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে সকল ইউরোপীয় থাকেন, তাঁহাদিগকে তথা হইতে মধু সংগ্রহ করতঃ ব্যবসায় করিয়া লাভবান হইতে পরামর্শ দিয়াছেন।

ভারতের ফুলবাগান সমূহে সমস্ত বৎসরই মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে দেখিতে পাওয়া যায়। মৌমাছিরা আকৃষ্ট হইয়া আইসে, এমন ফুলের গাছও ঐ সকল বাগানে বিস্তর পরিমাণে আছে। ধারাবাহিকভাবে একটু চেষ্টা করিলেই ঐ সমস্ত মৌমাছিকে স্থায়িভাবে ফুলবাগান সমূহে আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে। যাঁহারা সখ করিয়া ফুলবাগান করিয়াছেন, তাঁহারা যদি এইরূপে মৌমাছি পুষিয়া রাখার দিকে একটু যত্ন করেন, তাহা হইলে দেখিবেন, এ কারবারে তাঁহাদের লাভ বেশই হইবে। দুই একটা স্থলে এই কারবারে লাভ হইতেছে দেখিলে, অপরের মনেও উৎসাহ জন্মিবে। তখন এই কারবার এদেশেও অনেকটা বিস্তৃত হইয়া, লোকের অর্থাগমের একটা উপায় স্বরূপ হইবে।

দুর্ভিক্ষের কারণ কি?

আমার যাহা ধারণা, তাহাই আমি বলিব। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কংগ্রেস হইতে মহামতি মিষ্টার রমেশচন্দ্র দত্ত বাহাদুর

খাজনার আইন ইহার কারণ বলাতে দেখিতেছি, ভারত-গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের পক্ষ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার জন্য রীতিমত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া উক্ত কথার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আমি বলি, দুর্ভিক্ষের কারণ বহির্বাণিজ্য; দেশের শ্রীবৃদ্ধি এবং পতন দুই ইহাতে। মাত্রা না জানিলে যেমন বিষ ভক্ষণে মৃত্যু হয়, নচেৎ উহা অমৃত হয়; ইহাও সেইরূপ।

আমাদের দেশের চাষাভুষাকে এখন সকলে দেশের কথা, দশের কথা বুঝাইতে হইবে। অথবা নিজেরা উহা বুঝিয়া যাহাতে এদেশীয় দরিদ্রেরা অবাধ-বাণিজ্যের ফাঁদে না পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য এই শ্রেণীয় সভা-সমিতি প্রত্যেক দেশে দেশে হওয়া উচিত। ইহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরেরও মঙ্গল হইবে, তাঁহার প্রজারা সুখে থাকিবে। কথাটা এই যে, বাণিজ্য হইতে দেশ রক্ষা করিতে হইলে, যাহাতে বাণিজ্যের দ্বারা দেশের অমঙ্গল হয়, এরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় বাণিজ্য করা হইবে না। বাণিজ্যের বিষয় বুঝিতে হইলে টাকা, শস্য, দেশী ব্যবসায়ী এবং বিদেশী ব্যবসায়ী এই চারিটী বিষয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে বুঝিতে হইবে।

টাকা এবং শস্য দুইয়ে এক দ্রব্য হইলেও কিন্তু ইহা স্বতন্ত্র। কেননা, শস্য উৎপন্ন-কারী কৃষক এবং তাহাদের সাহায্যকারী দরিদ্রেরাই যখন অগ্রে দুর্ভিক্ষের হস্তে পড়ে, তখন টাকার সঙ্গে ইহাদের দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধ কি? ধনীর টাকা আছে, তিনি ৫৲ টাকা মণের চাউল ১০৲ টাকা মণে ক্রয় করিয়াও দুর্ভিক্ষ হইতে বাঁচিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর দুর্ভিক্ষই ভারতের স্থানে স্থানে প্রায়ই হয়। ইহা ভিন্ন আর এক শ্রেণীর দুর্ভিক্ষ আছে। তাহাতে ধনীর ধন থাকিলেও দ্রব্যের অভাবে বাক্সের টাকা বাক্সে থাকে, জিনিষ ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে নির্ধনী ত বহু পূর্ব্বেই মারা যায়, শেষে ধনীদেরও মরিতে হয়। কিন্তু এরূপ দুর্ভিক্ষ প্রায় হয় না। পূর্ব্বোক্ত দুর্ভিক্ষের প্রকোপই বেশী। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, শস্য ও টাকা যেন স্বতন্ত্র। এদেশী দরিদ্র যাঁহারা প্রতিবৎসরই প্রায় দুর্ভিক্ষের হস্তে পতিত হয়েন, তাঁহাদের টাকা থাকিলে এরূপ হইত কি? ভারতে রেলের বিস্তার বশতঃ টাকা থাকিলে কিছুতেই দুর্ভিক্ষের হস্তে পতিত হইতে হইবে না, ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস। তোমার দেশে এ বৎসর অজন্মা, দরিদ্রেরা দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়াছে। কিন্তু উহাদের অর্থ থাকিলে, রেলের কল্যাণে অন্য দেশের ব্যবসায়ীরা দ্রব্যের দর বৃদ্ধিতে মাল বিক্রয় করিবে,

বেশী লাভ হইবে, ইহা বুঝিলে, তাহারা তোমার দেশে লক্ষ লক্ষ মণ শস্য লইয়া গিয়া উপস্থিত হইয়া, তোমার দেশের অজন্মার দরুণ অভাব পূরণ করিয়া আসিত। অতএব টাকা উপায়ের পন্থা দরিদ্রদিগকে ভালরূপে বুঝাইতে হইবে। তাহাদের বুঝাইবার সময়, আমাদের বলিতে হইবে যে, "তোমাদের শস্যক্ষেত্র এবং পরিশ্রমলব্ধ শস্যই তোমাদের টাকা উপায়ের প্রশস্ত পথ।" উহা উৎপন্ন হইলে, তোমরা বিদেশী অর্থাৎ ভারতবাসী ভিন্ন অন্য জাতিকে উহা বিক্রয় করিও না। তাহা করিলে তোমাদের দেশ হইতে তোমাদের মা লক্ষ্মী দেশছাড়া হইবেন। তোমরা উহা তোমাদের দেশী মহাজনকে দাও। দেশী মহাজন তাহাতে লাভ করিলে, সে টাকা তোমাদের দেশেই থাকিবে। অজন্মা হইলে তাঁহারা তোমাদের পুনরায় টাকা ঋণ দিবেন। অথবা দেশে টাকা থাকিলে ধনীরা অন্নছত্র ইত্যাদির দ্বারাও তোমাদের প্রতিপালন করিবেন। নচেৎ টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া গেলে, মধু ফুরাইলে যেমন মৌমাছিরা মধুচক্র পরিত্যাগ করে, বিদেশীরা তাহাই করিবে। দেশের শস্য বিদেশে বাহির হইয়া যাউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু উহা দেশীয়দিগের নিকট দিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ তুমি যে শস্য উৎপন্ন করিলে, উহার মণ ৩৲ টাকা। কিন্তু তোমার নিকটস্থ বৈদেশিক ব্যবসায়ী যে কুঠি করিয়া বসিয়া আছেন, তাহাকে তুমি বিক্রয় করিলে ১৲ টাকা মণ। বাস্তবিক তোমার দেশে উহার দর ১৲ টাকা; উহা যে ৩৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়, তাহা তুমি জান না। ঐ কুঠিয়াল তোমাকে কুলির পারিশ্রমিক মত ১৲ টাকা এবং তোমার দেশের বাবুদিগকে কেরাণী রাখিয়া তাঁহাদিগকে ৷৷৹ আনা দিয়া এবং জাহাজ ও রেল ভাড়া মণকরা ৷৷৹ আনা দিয়া মোট ২৲ টাকায় উহা লইয়া গিয়া, স্বদেশে ৩৲ টাকায় বিক্রয় করিতেছে। ইহাতে তোমাদের দেশের মহাজন কমিয়া গিয়াছে। উহা দেশী মহাজনের নিকট দিয়া গেলে কি হইত বল দেখি? তাহা হইলে তুমি পাইতে, এদেশী কেরাণীরাও পাইত, এবং মহাজনও কিছু লইত। ইহাতে যদি দরে অসুবিধা হইত, যদি বৈদেশিকেরা মহাজনের লাভ না দিত, তাহাতে ক্ষতি কি? সে মাল তোমার দেশের লোককেই মহাজন না হয় ক্ষতি করিয়া বিক্রয় করিত, তবুত তাহা এদেশেই থাকিত। হায় হায়! কেরাণীর সভ্যতার জ্বালায়, কৃষক! তোমার সহকারীও কমিয়াছে, এখন তোমাদের ছেলেরা কিছু লেখা পড়া শিখিলেই চাকুরী করিতে উদ্যত হয়, চাকুরী করা এখন সভ্যতা হইয়াছে। এই সংস্কার

কাটিয়া এদেশ যখন কৃষক হওয়াই সভ্যতা মনে করিবে, এদেশী দোকানদারের যখন মান্য বৃদ্ধি হইবে, এদেশী মহাজন যখন বৃদ্ধি হইবে, এদেশী মহাজনেরা যখন বিদেশে গিয়া মাল বিক্রয় করিয়া আসিবে, এদেশবাসীরা যখন হইতে সমগ্র ভারতকে স্বদেশ বলিয়া বুঝিবে, ভারতের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিলে "প্রবাস" বলিয়া যখন বোধ থাকিবে না, জাপান, কাবুল, তিব্বত, পারস্য, রুসিয়া, জর্ম্মণী, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিলে সেই যথার্থ "প্রবাস" বলিয়া যখন ধারণা হইবে, বিশ্বজনীন ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা বহুবিধ 'ভাষা যখন এদেশবাসীরা আয়ত্ব করিবে, যৌথ কারবারের মহিমা যখন এদেশবাসীরা বুঝিবে, তখন হইতে ভারতের দুর্ভিক্ষ দূর হইবে। দুইটা কাজের একটা কর। "হয় সকলে কলম ছাড়িয়া লাঙ্গল ধর, ভারতের পতিত জমিকে শস্যক্ষেত্রে পরিণত কর, চাষ বাড়াও; কেন না, তোমার দেশে বিদেশী অতিথি অনেক আসিয়াছে, এবং ঈশ্বরের কৃপায় তোমাদের বংশবৃদ্ধিও যথেষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে; অতএব শস্যক্ষেত্রের বৃদ্ধি চাই।" না হয় ইহা যদি বুঝ যে, এখনও এদেশে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয়, আমার সোণার ভারত! তাহা হইলে এক কাজ কর, দোহাই তোমাদের এই কাজটী কর, "যৌথ কারবার খুলিয়া ভারতের দ্রব্য তোমরা লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া আইস।" এই দুই কাজের একটা কর।

কাম্বোডিয়া, আনাম প্রভৃতি দেশে তামাক, চাউল, তুলা, কর্পূর প্রভৃতি অনেক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু সে দেশের লোক এতই নির্ব্বোধ যে, তাহারা দেশী লোকের নিকট উহা বিক্রয় করে না। মনে ভাবে, বিদেশীকে বিক্রয় করিলে দর বেশী পাইব, এজন্য বিদেশীকে বিক্রয় করে। তাই সে দেশী মহাজন নাই অর্থাৎ দেশী লোক কেহই ধনী হয় নাই। এজন্য সে সকল দেশের শ্রীবৃদ্ধি নাই। স্বদেশী ধনী না থাকিলে দেশের নাম বাহির হয় না। ঐ সকল দেশবাসীরা খাটে খোটে, শস্য উৎপন্ন করে, অথচ সকলেই নিঃস্ব। তাহাদের লক্ষ্মী বিদেশে চলিয়া যায়। এই সকল দেশ দুর্ভিক্ষের জ্বালায় সময়ে সময়ে অস্থির হয়। দরিদ্রের দুঃখ কেইবা শুনে? তাই বলিতেছি, ভারতের যেন এ অবস্থা না হয়। আজ আমাদের মফঃস্বলের সহযোগীবর্গেরা—মেদিনীবান্ধব, নীহার, পল্লীবাসী প্রভৃতির সুযোগ্য সম্পাদকেরা এই বৎসর বঙ্গের দুর্ভিক্ষের কথা তারস্বরে যেমন শুনাইতেছেন,

কাম্বোডিয়া ও আনামের লোক যদি এইরূপ সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দুঃখের কাহিনী অনেক শুনিতে পাইতাম। "বল্মতে" যত ফল না হউক, দুঃখীর দুঃখ-কাহিনীর সে যদি পরিচয় দেয়, তাহা হইলেও তাহার মনের দুঃখের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়—নিশ্চিত। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

শ্রীঃ—

বিলাতী শণের চাষ।

(৪)

অপরিষ্কৃত শণ-শ্রেণীর মধ্যে ফৈনেলি এবং ক্যান্‌নেভিলাই নামক শণ সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ। এই ফৈনেলি এবং ক্যান্‌নেভ্‌িলাই শণের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগকে অপরিষ্কৃত শণ শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না; তবে এই সকল শণ অত্যন্ত খাট এবং দুর্ব্বল। ইহাদের তন্তুগুলি এত দুর্ব্বল এবং অপরিষ্কৃত যে, পূর্ব্বে এই সমস্ত ফসলকে একবারে প্রকৃত "শণ" শ্রেণীভুক্ত করা হইত কি না, সন্দেহ! অতএব ইহাদিগকে এক্ষণে লোকে অপরিষ্কৃত শণ নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

শণকাটি বাহিরকালীন শণকাটির সহিত যে সমস্ত শণ বাহির হয়, তাহাদিগকে ইংরাজীতে ষ্ট্র্যাপেচার বলে। ষ্ট্র্যাপেচার শব্দের অর্থ ছেঁড়া বা উৎপাটন, কিন্তু ইহার নামটা প্রকৃতিগত অর্থবোধক নহে। শণতন্তুর বলানুসারে এবং শণকাটির বেশী ও কম পরিমাণ অনুসারে ইহাদিগকে দুই শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে; যথা—ষ্ট্রাপেচার পিউলাইট এবং ষ্ট্র্যাপেচার কোরেণ্টাই—পরিষ্কার এবং স্বাভাবিক। "উৎপাটন" শব্দের প্রকৃত অর্থ এই;—মস্তক এবং শণের শেষ শিকড় শণকাটি বাহির করিবার পর যাহা ছিঁড়িয়া লওয়া হয়, তাহাদিগকে "টেষ্টি ডি ক্যানেপ" বা শণের মাথা বলা হইয়া থাকে, এবং ইহাদিগকে দুই ভাগে বিভাগ করা হয়—(১) টেষ্ট-মেণ্টি (মনোনীত) এবং (২) টেষ্ট কোরেণ্টাই (স্বাভাবিক)।

ষ্ট্রাপেচার এবং শণের মাথা, এই দুই রকমের দুই দুই শ্রেণীভুক্ত শণগুলি স্বাভাবিক অবস্থাতে রপ্তানি হয় না। উহাদিগকে কারখানাতে বলশালী শণ (ষ্টোপা ফোর্টেস) করিয়া পাঠান হয়। এই ষ্টোপা ফোর্টেস তৈয়ারি কেবলমাত্র

শণ কাটি বাহির কালীন শণকাটির যে টুকরা কাটি থাকে, তাহা বাছিয়া ফেলিয়া দিলেই ইহা সংসাধিত হইয়া থাকে। ষ্ট্রাপেচার হইতে উদ্ভূত পূর্ব্বোক্ত-রূপ শণকে ২নং ষ্টোপা ফোর্টেস এবং শণের মাথা হইতে উদ্ভূত শণকে ১নং ষ্টোপা ফোর্টেস বলা হয়।

স্বভাবতঃ যদ্যপি শণের রং বিবর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে উদ্ভূত ষ্ট্রাপেচার, শণের মাথা এবং অপরিষ্কৃত শণ সকলেরই রং বিবর্ণ হইয়া থাকে।

রপ্তানির জন্য অন্য অপরিষ্কৃত শণকে আঁচড়ান শণ বলা হয়। বিশেষতঃ স্পোনটিটাই হইতে উদ্ভূত শণকে ষ্টোপা ফাইনা বলা হয়। এই শণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুন্দর তন্তু বিশিষ্ট, ইহার রং অতীব সুন্দর এবং ইহা গাঁট বা গিরা শূন্য। এই শ্রেণীর শণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শণকে "য়্যাসেককেচিওর" বলা হয় এবং ইহা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মাত্র রপ্তানি হয়।

যাঁহারা পল্লীগ্রামে কখনও নেপলস্ প্রাদেশিক শণ খরিদ করেন নাই, ক্রেতাদের যে কিরূপ কষ্ট, তাহা তাঁহারা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহা স্বীকার্য্য যে, নেপলস্ প্রাদেশিক কৃষকেরা অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমী এবং তাহারা অত্যল্পতেই সন্তুষ্ট। আর উত্তর-দেশীয় কৃষকেরা এইরূপ কষ্টকর এবং গরিবভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দৃঢ়তর রূপে অস্বীকার করিবে; কিন্তু তাহা হইলেও নেপলস্ প্রাদেশিক কৃষকেরা অত্যন্ত ধূর্ত্ত এবং চালাক। প্রায় ৫০টী সহর এবং পল্লীগ্রামে শণ বিক্রয় হয়। প্রত্যেক পল্লী কিংবা সহরেতে দালাল বাস করিয়া থাকে। এই সমস্ত দালালেরা নিজেদের মধ্যে একটী সভা খুলিয়া থাকে, এবং এরূপ কার্য্য-দক্ষতার-সহিত শণ ক্রীত হয়, যে, ইহাদিগকে এক পার্শ্বে পরিত্যাগ করিবার চিন্তাকরা একবারে—সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। প্রত্যেক কার্য্যের জন্য তাহারা বিভিন্ন রকম কমিশন পাইয়া থাকে। স্থান অনুসারে এই কমিশন ১০০ ফিলোসে ৫০ সেণ্টাইমস্ হইতে ১ ফ্রাঙ্ক হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রতি দুই হান্ড্রেট্ওয়েটে ৫ পেন্স হইতে ১০ পেন্স পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত দালালেরা বিক্রয়কারীদিগকে তাহাদের বিক্রেয় মূল্য কমাই-বার জন্য এবং ক্রেতাগণকে দর কিছু বাড়াইয়া গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করে। মাল চালান দিবার সময় ইহারাই ওজন দিয়া থাকে, এবং সচরাচর ইহাদের নিকট হইতেই বিক্রেতাগণ টাকা পাইয়া থাকে।

বোলগনা ফেরারা রুসিয়ার ন্যায় নেপলস্ প্রদেশে ১০ টন হইতে ৪০ টনের লাট খরিদ করিতে প্রায় পাওয়া যায় না। নেপলস্ প্রদেশে এরূপ বৃহৎ

লাট কচিৎ বিক্রয় হয়। খুব বেশী রকম পরিমিত লাট কয়েক শত ফিলোস হইতে হাজার ফিলোসের পরিমাণ হয়, কিন্তু সচরাচর ৫০ ফিলোসের লাটই বিক্রয় হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—যে কৃষক ৫০০০ ফিলোস শণ উৎপন্ন করিয়াছে, সে ১০ লাটে তাহা বিক্রয় করিয়া থাকে। আবার এই সমস্ত লাট বাজারের মূল্যানুসারে বিক্রীত হইয়া থাকে। যখন মালের দর বেশী হয় এবং যখন তাহার টাকার বিশেষ আবশ্যক হয়, তখনই সে মাল বিক্রয় করিয়া থাকে।

মাল বিক্রয় করিবার ইচ্ছা হইলে, কৃষক অগ্রে দালালকে তাহা বলিয়া থাকে। দালাল তাহার নিকটে ক্রেতাগণকে লইয়া যায়। ক্রেতারা প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন সময় পর্য্যন্ত শণান্বেষণে পল্লীগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখে। যদি ক্রেতা অনুমান করে যে, দর বেশী চাওয়া হইতেছে এবং মালের দর বৃদ্ধি হইতেছে, তবে সেই ক্রেতা তখনই দালালকে বলিয়া থাকে যে, তাহার মালের আবশ্যকতা নাই। কয়েক সপ্তাহ পরেই এই একগুঁয়ে কৃষক গাঁট করিয়া যে পর্য্যন্ত না বাজারে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়, ততদিন খরিদ করিবে না—ইহাও সেই ক্রেতা দালালকে জানাইয়া থাকে। বিশেষরূপ চালাক না হইলে নেপলস্ প্রদেশে শণ খরিদ করিতে যাওয়া বড়ই কষ্টকর বিষয়। কেন না, শণ খরিদ করা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ চালাক না হইলে নেপলস্ প্রদেশে শণ খরিদ করিতে যাইলেই প্রায় প্রবঞ্চিত হইতে হয়। এ ছাড়া কৃষকদের ধূর্ত্ততাও ক্রেতার সম্যক্ পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কোন্ স্থানে বিক্রয়কারীরা খারাপ শণ রাখিয়া থাকে, এবং গাঁটের মধ্যস্থ কোন্ স্থানে ষ্ট্র্যাপেচার এবং বিবর্ণ শণ লুকাইয়া রাখে, এই সমস্তও ক্রেতার পূর্ব্বে জানা বিশেষ আবশ্যক। বিক্রয়কারীরা নমুনার জন্য মাত্র তিন খণ্ড শণ প্রদান করিয়া থাকে। অতএব শণের গাঁট দেখিয়াই ক্রেতাদের অনুমানে বিদিত হওয়া আবশ্যক যে, এই গাঁট পছন্দ করিয়া লইলে কিরূপ ফল ফলিবে। কেন না, বিক্রয়কারীরা দুই শত গাঁট পর্য্যন্ত লইলেও সমস্ত খুলিয়া দিতে কখন স্বীকৃত হয় না ও হইবে না। কতকগুলি কঠিন সমস্যা অবধারণ করা কর্ত্তব্য, এবং এই কঠিন সমস্যাগুলি বহুদিনের কার্য্যতঃ জ্ঞানের বিকাশ দ্বারা দূরীকৃত হয়। যাহাদের এই বিষয়ে পারদর্শিতা এবং বিজ্ঞতা নাই, তাহারা শণ খরিদ করিয়া যখন বাটীতে আগমন করতঃ শণ খুলিয়া ফেলে, তখনই বুঝিতে পারে যে, ইহা কিরূপ প্রবঞ্চনা; তখনই তাহারা

আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং তাহাদের দিব্যজ্ঞান উপস্থিত হয়। ইহাই যে সমস্ত বলা হইল, তাহাও নহে, আরও বাকী আছে। খরিদ করিবার দিনে শণ গুলি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক খরিদ করিয়া আনিয়াই পরদিন ক্রেতারা যখন ওজন করিতে যায়, তখন দেখিতে পায় যে, শণ ভিজা অর্থাৎ স্যাঁত-সেঁতে। অতএব এ বিষয়ও ক্রেতাদের লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। খরিদ কেবল মাত্র বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া হয়, কোন লিখিত চুক্তি পত্র দেওয়া হয় না, কারণ, অধিকাংশ কৃষকেরা অশিক্ষিত। যদি দর বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিক্রয়কারীরা শণ পূর্ব্বদিনে বাচনিক দর করিয়া বিক্রয় করিলেও চালান দেয় না। শণ খরিদ করা বহুদিন-ব্যাপী কার্য্য। বিক্রয়কারীরা ৮০ ফ্রাঙ্ক চাহিলে ক্রেতারা ৭০ ফ্রাঙ্ক দিতে চায়, তাহারা দর দস্তরি করিতে থাকে, তর্ক বিতর্ক করিতে থাকে এবং হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। শেষে বিক্রয়কারীরা ৭৬ ফ্রাঙ্ক বলে, ক্রেতারা বলে ৭৪ ফ্রাঙ্ক। তাহার পর দালালেরা মধ্যস্থ করিয়া দেয়। ক্রেতারা বিক্রয়কারীর বাটী পরিত্যাগ করে এবং পুনরায় গাড়ী সহিত আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন পর্য্যন্ত দালাল তর্ক বিতর্ক করিতেছে, একবার আসিতেছে একবার যাই-তেছে, এবং প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা তর্ক বিতর্কের পর অবশেষে ক্রেতাকে কয়েক শত ফিলোস শণ লইতে বাধ্য হইতে হয়। যাহাদিগকে চিনে না, তাহাদের প্রতি নেপলস্ প্রাদেশিক কৃষকেরা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে। এই সমস্ত কৃষকেরা নূতন ক্রেতাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারে, এবং কতিপয় ফ্রাঙ্ক তাহাকে বেশী রকম সহ্য করাইতে বিশেষ চেষ্টা করে। যদি এই চেষ্টাতে সফল-মনোরথ হইতে পারে এবং যদ্যপি সেই ক্রেতা কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করে, তাহা হইলে উহারা তাহাকে "বন্য" এবং আরও বহুলরূপ কুৎসিত সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিয়া থাকে।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে নেপলস্ প্রদেশে ডিউক্যাট মুদ্রা বিনিময়ে শণ ক্রীত হইত। দুইটি সিসিলির রাজ্যে পুরাতন মুদ্রাকেই ডিউক্যাট বলা হইয়া থাকে। আজকাল ইতালীর মুদ্রা "লাবার" বিনিময়ে মাল খরিদ করা হয়, কিন্তু ইহার ওজন ৮০ রোটিলি কারডোঁ অদ্যাবধি প্রচলিত হইতেছে। ৮০ রোটিলি কারডোঁ প্রায় ৭১।১।৪ ফিলোস।

শ্রীরামময় গিরি।

তেলেগু ভাষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তেলেগু দেশে প্রবেশ করিলে এই প্রবন্ধের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইবে। নচেৎ ইহা এখন বাজে প্রবন্ধের মত। সময়ে নিশ্চিত ইহা কাহার না কাহারও কিছু উপকার হইবে বলিয়াই, ইহা অল্প অল্প ভাবে মুদ্রিত হইবে।

শশা—দোসকায়া।
মুগ—পেসালু।
দাউল—পাপ্পু।
অড়হর—কান্দীপাপ্পু।
কলাই—মিনিউলুপাপ্পু।
কুলতি—উল্লাউলু।
লঙ্কা—মেরে পকাইলু।
জিরে—জিলাকরা।
তেজপত্র—জা-পাত্রী।
হরিদ্রা—সাসুপু।
সুপারি—[illegible]াক্কালু।
পান—তামালপাকুলু।
মুসুরি—মুসুরি পাপ্পু।
সোরগোজা—ওয়ালসুলু।
তিল—নুউলু।
ছোলা—কম্মু সেনাগল্লু।
মটর—বটানি।
চাউল—বিত্তম্, বিউইম্।
বেগুন—ওঙ্কাইলু।
সরিষা—আওয়ালু।
আদা—আলম।
কুমড়া—গুমড়িকায়া।
খরিদ—কাসু।

পেয়ারা—জামপাণ্ডু।
বেদানা—ডানিম।
কিস্মিস্—দ্রাক্ষাপাণ্ডু, কিস্মিস্ পাণ্ডু।
লাউ—আনব কায়া।
কুল—রেগপাণ্ডু।
ঘৃত—নেই।
চিনি—চিনি।
কন্দ—পঞ্চধারা।
ময়দা—পিণ্ডি, গোধুম পিণ্ডি।
খাবার—তিণ্ডি।
লবণ—উপ্পু।
তৈল—নুনি।
দৈ—পেলুগু।
দুধ—পালু।
জল—নিলু।
ভাত—কুড়ু।
মৎস্য—চাপালু।
মাংস—মান্সম।
ছাগল মাংস—মেকা মান্সম।
মুর্গী মাংস—কোড়ি মান্সম।
ডিম্ব—গুড্ডুললু।
মুর্গীর ডিম—কোড়িগুড্ডুল্লু।
ভেড়ার মাংস—গুরী মান্সম।

হরিণ মাংস—লেডি মান্সম।
সিংহ—সিংহ মন্ত।
ব্যাঘ্র—পেদ্দাপুলি।
পক্ষী—পাচ্ছী।
কাক—কাকী।
চড়াই—পারুয়া।
অশ্ব—গোড়ম্।
গরু—আউ।
ষাঁড়—ইদ্র।
বাছুর—দুড়া।
অশ্বশাবক—গোড়ম্পিলা।
পায়রা—পাওরা।
হরিণ—লেডি।
মহিষ—দুল্লপোত্তো।
মহিষী—গোদী।
হস্তী—এনগু।
ভেড়া—পুরী।
ছাগল—মেকা।
উষ্ট্র—লোটপিটা।
মুর্গী—কোড়ি।
মশা—দোমলু।
মাছি—ইগেলু।
বড় ইন্দুর—এ্যালু ক্যালু।
ছোট ইন্দুর—চুন্টু এ্যালিক্যালু।
বিড়াল—পিলিলু।
সর্প—পাপু।

ইহাতে 'লু' যোগ করিলেই বহুবচন হইবে।

স্বর্ণ—বাঙ্গারম্।
রৌপ্য—ভেণ্ডি।
তাম্র—রাগি।
লৌহ—ইনুমু।
সীসা—সিম্নম্।
মাইল কোল—বুগু।
কয়লা—বুগু।
চূণ—চুণম্।
বৃক্ষ—চেট্টু।
লতা—ইদুগুতু উল্লা চট্টু।
শালগাছ—আড্ডা কুলু চট্টু।
তেঁতুল গাছ—চিন্তা চট্টু।
লঙ্কা গাছ—মেরে পকাইলু চট্টু।
আম্র গাছ—মাউড়ি চট্টু।
অশ্বত্থ গাছ—রাভি চট্টু।
বটগাছ—মারি চট্টু।
ফুল গাছ—ফুবলু চট্টু।
গোলাপ ফুল—গোলাবী ফুবলু।
বেল ফুল—মল্লিব।
বেগুণ গাছ—ওয়ানকায়ল চট্টু।
শাল—শাল উলু।
বস্ত্র—বট্টল্লু।
জামা—কামেজ, চোকা।
চাদর—দুপটি।
জুতা—চপুল্লু।
ছাতা—গুড়ুগু।
মোজা—মেজড়ু।
ছড়ি—কারা।
আলয়ান—শাল উলু।
আংটি—উদ্দারম।
ঘড়ি—ঘড়িয়ারম্।
বোতাম—গুণ্ডিলু।

সাটী কাপড়—চেরেলু।
পুরুষের বালা—খড়িয়ালু।
স্ত্রীর বালা—গজ্জলু, চেৎ গজ্জলু।
মাক্‌ড়ি—তাম্‌মিট্‌লু।
চুড়ি—মুরুগুলু।
নাকচাবি—মুক্ক পড়কা।
নোলক—আড্‌ডাবাসা।
মল—কাল কড়িয়াল।
ঘাগ্‌রা—লাঙ্গা, পারকিনি।
হার—কাসল পেঁরু।
বাটী—ইলু মেড়া।
ঘর—গদী।
জানালা—তালপুলু।
দরজা—তালপুলু।
তক্তা—কারা, বালা।
প্রস্রাবের স্থান—নিউরুড়ি, উচা।
পাইখানা—চাম্বাটেকি।
ঠাকুর ঘর—দেমুড়ি গুড়ি।
মন্দির—ঐ।
মঠ—মঠম্।
পথ—দারী।
ঘাট—চেরুউ।
পাথর—ট্রাই।
উচ্চ জমি—এতভূমি।
শস্যক্ষেত্র—পলামু।
প্রকৃতি—গুণম্।
ঈশ্বর—দেমরু।
ব্রহ্ম—ব্রহ্মা।
মাঠ—ভূমি।
দেশ—উরু।

পুকুর—চেরোউ।
গ্রাম—পালি টুউরু।
বাগান—পোগলতওটা।
নদী—নদী।
নিম্ন জমি—কেন্দা ভূমি।
সমুদ্র—সমুদ্রম্।
হ্রদ—সরস্বো।
মেঘ—মেঘমু।
বৃষ্টি—ওয়ানা।
রৌদ্র—সূর্য্যতেজস্।
পর্ব্বত—কনগুা।
জাতি—কোলাম্।
চন্দ্র—চন্দ্রড়ু।
সূর্য্য—সূর্য্যড়ু।
আকাশ—আকাশম্।
নক্ষত্র—নক্ষত্রম্।
বায়ু—গালি।
ঝড়—তুফান।
জ্যোৎস্না—চন্দ্র কিরণম্‌লু।
লাল বর্ণ—ইয়ারা রাঙ্গু।
সবুজবর্ণ—পাচারাঙ্গু।
হরিদ্রাবর্ণ—পসপুরাঙ্গু।
বেগুনিবর্ণ—উদা।
কালবর্ণ—নালারঙ্গু।
সময়—ভেলা।

[ক্রমশঃ।

সংবাদ।

কাশিম বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর জনৈক ছাত্রকে মাসিক এবং পাথেয় সাহায্য দিয়া শিল্পশিক্ষার জন্য জাপানে পাঠাইয়াছেন।

সংকল্প হইয়াছে, কলিকাতার যে সকল পথে ইলেট্রিক-ট্রাম চলিতেছে, সেই সকল পথে মিউনিসিপালের রাস্তায় জল দান কার্য্য উক্ত ট্রাম দ্বারা সাধিত হইবে।

আমেরিকা হইতে একটা কথার তরঙ্গ আসিয়াছে যে, মানুষকে আর জলমগ্ন হইতে হইবে না, এমন যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। যন্ত্রটী অতি ক্ষুদ্র, পকেটের ভিতর যাইবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে জলমগ্ন ব্যক্তি দিবসত্রয় পর্য্যন্ত জলের উপর ভাসিতে সক্ষম হইবেন। যন্ত্র ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু জল স্পর্শে উহা প্রসারিত হয়।

কালীঘাটের বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক বাবু জগদীশ ঘটক মহাশয় জলের উপর চলিবে, এমন বাইসিকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, বাইসিকলের চাকাদ্বয় জল কাটে, এমন ভাবে করিয়া, তাহা বৃহৎ-মুখের জালা চাপা দিয়া, সেই জালাদ্বয় গঙ্গাজলে ভাসাইয়া উভয় জালার মধ্যবর্ত্তীস্থানে বাঁশের মাচা বাঁধিয়া তাহাতে বসিয়া, এই অদ্ভুত বাইসিকল কালীঘাটের গঙ্গা হইতে চালাইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বহুদিনের কথা। তৎপরে এ সম্বন্ধে আর কিছু শুনি নাই।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
৩য় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা ; কার্ত্তিক, ১৩১

দেশী ও বিলাতী সব্জীর চাষ।

(কাশীপুর প্র্যাক্‌টিকেল ইনষ্টিটিউসন হইতে লিখিত।)

চতুর্থ প্রবন্ধ।

তরমুজ, তরবুজ।—ইহা খিয়াড়, বালি, দোঁয়াস মৃত্তিকাতে উৎপন্ন হয়। পলিযুক্ত চরভূমিতে অধিক পরিমাণ জন্মে। দোঁয়াস মৃত্তিকায় ফল বড় বড় হয়। খিয়াড় মৃত্তিকায় অল্প ফল জন্মে, কিন্তু স্বাদ উত্তম হয়।

কার্ত্তিক মাস হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ রোপণের সময়। মাঘ মাস প্রশস্ত বলিয়া অনেকে এই সময় ইহাদিগের বীজ রোপণ করে। নূতন পলিযুক্ত চরভূমিতে বিনা চাষেই বীজ রোপণ করিয়া থাকে। অন্য জমিতে অন্যূন ৩ বার চাষ করিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া পরিষ্কার ও সমতল করতঃ পরে বীজ রোপণ করে। অর্দ্ধ ইঞ্চির অধিক নীচে বীজ প্রোথিত করে না। ইহার ক্ষেত্রে রস না থাকিলে অল্প অল্প জল দিতে হয়। অঙ্কুরোদ্গম হইয়া গাছ লতাইতে আরম্ভ হইলে যদি ক্ষেত্রে রস না থাকে, তবে অল্প অল্প জল দেওয়া কর্ত্তব্য। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ও ভূমি নড়াইয়া দিতে হয়।

কর্কটী, ফুটী, কাকড়, বাঙ্কি, খেড়ো।—ইহা পলিযুক্ত চরভূমিতে অধিক পরিমাণে জন্মে। যে মৃত্তিকায় বালির ভাগ অধিক, তাহাই ইহার পক্ষে প্রশস্ত। সমভাগ দোঁয়াস মৃত্তিকাতেও মন্দ হয় না। খিয়াড় মৃত্তিকায় ভাল হয় না।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ রোপণের প্রশস্ত সময়। পলিযুক্ত চর-মৃত্তিকাতে বিনা চাষে বীজ রোপণ করা যাইতে পারে। অন্যত্র চাষ করিতে হইলে ভূমি ২।৩ বার চাষ করিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া পরিষ্কার করিয়া সমতল করিবে। বীজ ১০।১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রোপণ করিলে শীঘ্র অঙ্কুর বাহির হয়। ৮ ফুট অন্তর এক এক স্থানে ৪টী ৪টী করিয়া বীজ রোপণ করিবে। মৃত্তিকা নীরস হইলে সময় সময় জল দিতে হইবে। ইহার গাছ লতাইয়া বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে।

। রোপণ না করিয়া বাটীর নিকটে কি বাগানে ২।৪ স্থানে গোলাকার
য়া, ইহার বীজ রোপণ করিলেও গাছ হইয়া যথেষ্ট ফল প্রদান করে।
ক্ষেত্রে ঘাস হইলে নিড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার পক্ক ফল জলযোগে
কাঁচা ফল তরকারীতে ব্যবহার হয়।

গোল আলু অথবা বিলাতি আলু।—নূতন পলিপড়া হালকা
ত্তিকা ইহার জন্য প্রশস্ত। ভাদ্র মাস হইতে জমিতে চাষ দিতে হয়। দোঁয়াস
মৃত্তিকাতে ইহার আবাদ করিতে হইলে, বিঘা প্রতি ৬।৭ মণ খইল সার দিতে
হয়। সাধারণতঃ খইল ও গোময়ের সার ব্যবহৃত হয়। পচা পাতা ইত্যাদির
সার, চুণ, বালি, অস্থিচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

ক্ষেত্রে অন্যূন ৭।৮ বার চাষ দিতে হয়। লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণে ভূমি যত অধিক
গভীর করিয়া খনন করিবে, ততই উপকার হইবে। ৩ বার চাষের পর
খইল সার দিবে। ঘাস, মুথা বাছিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকা চূর্ণবৎ করিয়া
মই টানিয়া, ক্ষেত্র উত্তমরূপ সমতল (পাটী) করতঃ বীজ রোপণ করিবে।

হস্তদ্বারা লাঙ্গল টানিয়া দুই ফুট অন্তর অর্দ্ধ ফুট পরিমাণ গভীর জোল
করিয়া, তাহাতে এক এক ফুট অন্তর এক একটী বীজ রোপণ করিবে ও
তাহা চূর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা চাপা দিবে। ইহাতে বড় বীজ প্রতি বিঘায় ১/ মণ,
ছোট বীজ ৩/ মণ লাগিবে। সাবধানতার সহিত কার্য্য করিবে, যেন বীজের
অঙ্কুর * ভগ্ন না হয়। অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইয়া ৪ ইঞ্চি উচ্চ হইলে, ২ ইঞ্চি চূর্ণ
মৃত্তিকা দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিবে। এইরূপ গাছ যত বাড়িতে থাকিবে,
তাহার গোড়ায় ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকা দিবে। এইরূপে মৃত্তিকা দ্বারা জোল পূর্ণ
করিয়া, ক্ষেত্রের উপর উচ্চ কান্দি বান্ধিতে হইবে। সময় সময় ক্ষেত্র নিড়ান
কর্ত্তব্য। বীজ রোপণের সময় ইহাতে অঙ্কুট চারা হওয়া পর্য্যন্ত যদি ক্ষেত্রে
অধিক রস থাকে, তবে তাহা সময় সময় খনন করিয়া রস কমিবার উপায়
করিয়া দিবে। নীরস মৃত্তিকায় জল সেচন আবশ্যক। উহাতে সমস্ত ক্ষেত্র
যাহাতে আর্দ্র হয়, তাহা করিবে। ১০ দিন অন্তর পুনর্ব্বার ঐরূপে জল
দিবে। ক্ষেত্রে জলীয় ভাগের অল্পতা করিলে সার নষ্টকারী কীট জন্মিতে
পারে না। গাছের গোড়ায় কাষ্ঠের ছাই দিলে, তাহাতে কীট নষ্ট হইবে।

---

* অন্ধকার ঘরে আলু রাখিয়া, তাহাতে চট বা কম্বল চাপা দিলে শীঘ্র অঙ্কুর
বাহির হয়।

পৌষ মাসের প্রথমে একবার আলু তোলা যাইতে পারে; বাঁশের বা লৌহ-শলাকা দ্বারা ধীরে ধীরে মাটী খুঁড়িয়া বড় বড় আলু বাহির করিতে হয়। আলু তুলিয়া গাছ কিঞ্চিৎ হেলাইয়া, অবশিষ্ট আলুগুলিতে মৃত্তিকা চাপা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই কার্য্যের ৩।৪ দিন পরে ঐ সকল গাছের গোড়ায় অল্প পরিমাণে জল সেচন করিতে হইবে। এরূপ করিলে যথেষ্ট আলু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

মাঘ ফাল্গুন মাসে আলুর সমস্ত গাছ প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়; সেই সময় আলু তুলিতে হয়। সমস্ত আলু তুলিয়া মধ্যম প্রকারের আলু বাছিয়া বীজের জন্য রাখিতে হয়। আলুতে কিছু রৌদ্র লাগাইয়া রাখিলে প্রায় ১ বৎসর তাহা ভাল থাকে। উহা ধৌত করিলে শীঘ্র নষ্ট হয়। ১ বিঘা জমিতে প্রায় ১০০/ মণ পর্য্যন্ত আলু উৎপন্ন হইতে পারে।

সকরকন্দ—শাঁক আলু, লাল আলু।—দোঁয়াস পলি মৃত্তিকাতে ইহা জন্মে। বালির ভাগ কিছু বেশী থাকিলে ভাল হয়। পলিযুক্ত নূতন চর-ভূমিতে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

বৈশাখ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ইহা রোপণের সময়। ঐ সময় যে ক্ষেত্রে জল না জমে, সেই ক্ষেত্রই ইহার পক্ষে প্রশস্ত। শাঁক আলু মাঘ ও রাঙ্গাআলু কার্ত্তিক মাসে রোপণ করিবে। পুরাতন গাছের গাঁইট হইতে যে শিকড় বহির্গত হয়, সেই গাঁইটের দুই দিকে এক এক ইঞ্চি গাছ রাখিয়া শিকড় সহ গাঁইট কাটিয়া রোপণ করে।

তিন চারি বার ক্ষেত্রে চাষ দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া সমতল করিবে। খননের গভীরতা যত অধিক পরিমাণে হইবে, আলুর আকারও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। জমি প্রস্তুত হইলে এক এক শ্রেণীতে তিন তিন ফুট অন্তর পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তিত গ্রন্থি রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্রে রস না থাকিলে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থি হইতে গাছ বাহির হইয়া ভূমির উপর লতাইতে থাকে। লতার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে আলু উৎপন্ন হইয়া মৃত্তিকার নীচে প্রবিষ্ট হয়। ঐ সময় অঙ্গুলী বা শলাকা দ্বারা উহার চতুষ্পার্শ্বের মৃত্তিকা খনন করিয়া দিতে হয়—ইহাতে আলু বড় হয়।

রোপণের অগ্র পশ্চাৎ অনুসারে পৌষ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত আলু তুলিবার যোগ্য হয়। ১ বিঘা জমিতে প্রায় ৮/ মণ পর্য্যন্ত আলু হয়। কাঁচা-আলু মিষ্ট-স্বাদ-যুক্ত।

চুপরি আলু, খাম আলু।—কার্ত্তিক মাসে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে রোপণ করিবে। [ক্রমশঃ।

পাট।

পাট আজকাল একটী প্রধান পণ্য। পাটের প্রয়োজন ও আবাদ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। উহার চাষ আবাদে বেশী লাভ দেখিয়া, প্রায়ই প্রতি জেলাতেই কৃষকেরা ছয় আনা রকম ধানী জমিকে পাটের জমিতে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। দড়ি দড়া, গুণ, চট, থোলে, নৌকায় পাইল প্রভৃতি দ্রব্য পাট হইতেই হয়। যত প্রকার বিলাতী কাপড় এদেশে আমদানী হয়, তৎসমুদায়েই কিছু না কিছু পাট মিশ্রিত থাকে। এইরূপ নানা কারণে পাটের প্রয়োজন বাড়িতেছে। পাট যতই উৎপাদন কর, দরের কমবেশ হউক, বিক্রীত হইয়া যাইবে, উহা পড়িয়া থাকিবার জিনিস নয়।

পাট নানা প্রকার; তন্মধ্যে পাহাড়ি, বিদ্যামুহুর ও ধবলমুহুর এই তিন প্রকারের নাম শুনা যায়, কিন্তু দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, মালদহ, রংপুর জেলায় পাট সচরাচর দুই প্রকারের দৃষ্ট হয়। ধবলমুহুর পাট ঐ সকল জেলায় ধামনিয়া ও বিদ্যামুহুর পাটকে আউশ বা আউশিরা বলে। ধামনিয়া পাট বড় জোর ৬।৭ হাত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, ইহার কোষ্টা দমে বেশী ভারী। ইহাদের মধ্যে আবার দুইটি প্রকার-ভেদ আছে। বর্ণ সবুজযুক্ত সাদা ও রক্তাভ ঈষৎ কাল। ফলন একই রূপ। বিদ্যামুহুর পাট ধবলমুহুরাপেক্ষা বেশী বর্দ্ধিত হয়, কোন কোন জমিতে ১০।১২ হাত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে দেখা গিয়াছে। কৃষকগণ সাধারণতঃ বলিয়া থাকে যে, বিলান, বিল কাঁদুড়ে অথবা আঁটাল জমিতে পাট যত হাত বর্দ্ধিত হয়, ইহার ফলন বর্দ্ধিতাংশের এক হাত বাদ দিয়া বিঘা প্রতি তত মণ হইয়া থাকে; ইহা অনেক স্থলে পরীক্ষিত হইয়াছে। শণ, মেস্তাও ও আমরুল বা আমলা প্রায় ঐ জাতীয় উদ্ভিদ। পাট অপেক্ষা শণ ফলে কম বটে, কিন্তু উহার মূল্য পাট অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী, পরিশ্রম ও ব্যয় কম। শণ সতর্কতার সহিত

পচাইতে হয়, তিন দিনের বেশী জলে থাকে না, থাকিলেই পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এরূপ হিসাবে ইহাকে কাটিতে হইবে, যেন দুই রাত্রি বাদে তিন দিনের দিনে ঠিক সময়ে সমস্ত শণ এককালে কাচা হয়। এই শণ কার্ত্তিক মাসে বপন করিলে চৈত্র মাসে উঠে। ঐ গাছ গোড়াসমেত তুলিতে হয়। আর ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে বপন করিলে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে উঠে। চৈত্র অপেক্ষা কার্ত্তিক মাসের উপ্ত পাট অনেক শক্ত। ইহা দ্বারাও সূতা, দড়ি, জাল, চট, থোলে, গুণ প্রভৃতি অনেক কার্য্যোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহাদের ছাল অপেক্ষা ফলের বীজ অনেকাংশে লাভজনক। কোন কোন বৎসর দেখা গিয়াছে, শণের বীজ ১০৲ হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত মণ বিক্রীত হইয়াছে ও প্রায়ই হইতেছে। যে বৎসর পাটের কি শণের দরের মাত্রা চড়িয়া যায়, তাহার পরবৎসরেই বীজের অল্পতা হেতু ঐরূপ বেশী মূল্যে বীজ বিক্রীত হইতে দেখা যায়; কারণ, জমির সমস্ত পাট কি শণ কাটিয়া লইয়া কোষ্টা বিক্রয় করে। আমনাও পাট অপেক্ষা অনেক শক্ত, চিক্কণ, মোলায়েম ও উজ্জ্বল; ইহার চাষ পাটেরই মত করিতে হয়। আমনা উচু জমিতে ভাল হয়, ফলন পাট অপেক্ষা কিছু কম; এই জন্য কৃষকেরা প্রায়ই ইহার আবাদ কম করে। আরও একরকম পাট জাতীয় উদ্ভিদ পরিলক্ষিত হয়, ইহাকে অন্যান্য জেলায় পাটশাক বলে। কিন্তু মালদহ, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি জেলায় কোন কোন স্থানে মিঠা শাক বা মুনিয়াশি শাক বলে। ইহা যে কেবল কৃষকেরাই বপন করে, এমত নহে। অনেক ভদ্রলোকও ইহার শাক শুক্ত খাইবার জন্য আধ কাঠা জমিতেও লাগাইয়া থাকেন। এই পাটশাক লাগান সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট কালাকাল নাই। চৈত্র বৈশাখ মাসে হউক, কি আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যে কোন সময়েই হউক, সরস জমিতে বপন করিলেই গাছ হইয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে যে সকল পাটশাক বপন করা যায়, সে সকলকে যদি গোড়াসমেত না তুলিয়া কেবল উপরের ভাল পাতাগুলি শাক তরকারী কি ভাজা করিয়া খাওয়া যায়, আর বাকী সমস্ত গাছটী থাকে, তবে ইহা হইতেই কোষ্টা পাওয়া যায়। এ সকল পাট অপেক্ষা অতিশয় ফাঁক ফাঁক রাখিতে হয়, ৫।৬ হস্ত পরিমিত এ শাকও বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু যখন কচি ফল বা ফুল হয়, তখনই কর্ত্তিত করিয়া পচাইলে ভাল কোষ্টা হয়। ইহার বিঘা প্রতি ফলন ২।৩ মণের বেশী হয় না।

পাটের জমিতে উত্তমরূপে সার ও চাষ দিতে হয়। ঐ জমির মাটী আটাযুক্ত হওয়া আবশ্যক। খনাও বলিয়াছেন যে—

"আউশের ভুঁই বেলে।
পাটের ভুঁই আটালে॥"

চৈত্র বৈশাখ মাসে পাটের জমিকে চাষ দ্বারা উত্তমরূপে তৈয়ারী করিয়া, বীজ বপন করিতে হয়। অধিক জল লাগিলে পাটের বীজ পচিয়া যায়। পাটের চারাগুলি প্রায় ৮।৯ অঙ্গুলি কি অর্দ্ধহস্ত পরিমাণের হইলে নিড়াইয়া দিতে হয়, এবং প্রায় এক হাত বর্দ্ধিত হইলেই রুগ্ন ও পোকাধরা গাছ-গুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। এরূপ করিলে পাটের ক্ষেত্রে বায়ু ও আলোক প্রবিষ্ট হইবার অনেক সুবিধা হয়। তাহাতে উত্তমরূপে পাট হৃষ্টপুষ্ট ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাটের ডগা যাহাতে গোরু, মহিষ বা ছাগলে না খাইতে পারে, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কারণ, তাহাতে পাট ভাল হয় না। পাটের গাছ যতই দীর্ঘ, সরল ও শাখাহীন হয়, ততই উত্তমরূপ কোষ্টা প্রস্তুত হয়। যদি রীতিমত সার দেওয়া যায়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের সকল প্রকার ভূমিতেই উত্তমরূপ পাট জন্মিতে পারে, সন্দেহ নাই। খালী জমিতে সার না দিলেও ২।১ বৎসর উত্তম পাট হয়।

পাটের জমিতে ৩।৪ বার নিড়ানী দিতে হয়। ১ম বার ছোট ছোট চারা গাছে, ২য় বার ১ কি ১॥০ হস্ত পরিমাণ বর্দ্ধিত হইলে, ৩য় ও ৪র্থ বারে গাছ ৪।৫ হাত কি ততোধিক বর্দ্ধিত হইলে অন্যরূপ নিড়ানী যন্ত্র দ্বারা ঘন গাছ সকলকে বাছিয়া রাখিয়া সরু গাছগুলি কাটিয়া দিতে হয়। ইহাকে পাট পাঁচা বলে। এইরূপ না করিলে গাছ সকল বেশী পরিপুষ্ট হয় না, আর পাট কাচিতে অতিশয় কষ্টকর হয় ও ফসল কম হয়। বিল, কাঁদাড় জমিতে দুই বার নিড়ানী দিলেই যথেষ্ট।

আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাসে গাছ পাকিতে আরম্ভ করিলেই উহা কাটিতে হয়। নীচু জমির পাট কাটিয়া বোঝা বাঁধিয়া জলে ফেলিতে হয়, আর উঁচু জমির পাট কাটিয়া জলে পচাইলে শীঘ্র পচে না। এজন্য উচ্চ জমির পাটকে প্রথমতঃ কাটিয়া আটী বাঁধার মত লম্বাভাবে গাছ সকলকে রৌদ্রে ২।৩ দিন শুকাইয়া লইতে হয়; ইহাতে যেন ডগার কতক অংশ গাছে গাছে চাপা থাকে, রৌদ্র না পায়। ইহাকে ঐ জেলায় পাটের জাঁক বা জাগ দেওয়া বলে। জাগ দিলে পাটের পাতা সকল এককালে ঝরিয়া পড়ে।

এই পাতাকে শুকাইয়া লইলে শুক্তা প্রস্তুত হয়। শুক্তা পাতার চচ্চড়ি ও ঘণ্ট যে ভাল হয়, ইহা অনেকেরই জানা আছে। উহা জলে ভিজাইয়া সেই জল খাইলে পিত্ত নাশ হয়। শুক্তা পাতা, ধনিয়া ও বড় হরীতকী প্রত্যেকে ১ তোলা, এক ছটাক জলে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে ঐ পাতা-ভিজান জল ছাঁকিয়া ২।৪ ফোঁটা তৈল ও একটু লবণ ছিটা দিয়া ৫।৭ দিবস খাইলে ঘুসঘুসে বা পুরাতন জ্বর ও রাত্রিজ্বর সারে। এমন কি কুইনাইন আটকান জ্বর পর্য্যন্ত সারে বলিয়া জানা আছে, কিন্তু ইহাতে আরও ২।১টী দ্রব্য যোগ করিয়া ১০।১৫ দিন ধরিয়া খাইতে হয়। তাহাতে জ্বর সারে ও দেহের অবসন্নতা বিদুরিত হয়। কাঁচা পাট শাক, ভাজা কি অন্য তরকারীতে খাইলে বায়ু উগ্র করে।

জাঁকাল পাটগুলি আটি বা বোঝা বাঁধিয়া জলে ফেলিতে হয়।

"হ'লে ফুল কাট শণ,
পাট পাকিলে লাভ দ্বিগুণ।"

অর্থাৎ ফুল হইলে শণ কাটিবে, আর ফল হইলে পাট কাটিলে সে বোঝা ওজনে বেশী হয়। পাট গাছ সকলকে যত পরিষ্কার জলে পচান হয়, ততই কোষ্টা উজ্জল ও চিক্কণ হয়। অপরিষ্কার জলে পচাইলে কোষ্টা ভাল রূপে পরিষ্কার হয় না। এই সকল কারণবশতঃ ও অন্যান্য কারণবশতঃ কোষ্টা বিভিন্ন প্রকারের হয়। জল যত গরম ও কষযুক্ত হইবে, ততই শীঘ্র পাট পচিয়া উঠিবে। ৫ কি ৭ দিনের মধ্যেই ইহা পচিয়া উঠে। এই জন্য যে জলে একবার পাট পচান হয়, সেই জলে পুনরায় পাট পচান হইয়া থাকে। এরূপ এক জলে বারংবার পাট পচিলে জলে অতিশয় দুর্গন্ধ হয়। উহার দুর্গন্ধ এবং সেই গর্ত্তের জল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অনিষ্টকর। পাট এত বড় একটা লাভজনক জিনিষ, কিন্তু উহার প্রস্তুত করণের এমন শোচনীয় অবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়। পাটের আবাদ অল্প ব্যয়ে হইয়া থাকে, ভূমির খাজনা ২৲ টাকা, তাহাতে যে কেবল পাটই হয় এমত নহে, রবিশস্যেরও আবাদ করা চলে; আবাদ খরচ ২৲ টাকা, পাট ২৲ কি ৩৲ টাকা, কাটাই ২৲ টাকা এবং পাট কাচা ও অন্যান্য বাবত খরচ মোট ৯৲ টাকা ব্যয় পড়ে। এক বিঘায় ন্যূনকল্পে ৭।৮ মণ পাট তৈয়ারি হইতে পারে, এবং উহার দর অন্যূন ৪৲ টাকা হিসাবে ২৮।৩০৲ টাকা, খরচ বাদে এক বিঘায় ২০।২২৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে। এক লাঙ্গলে অন্ততঃ পক্ষে

ধান্যের আবাদ বাদে ৩।৪ বিঘা পাট বপন হইতে পারে ; ঐ হিসাবে ছয় মাসে কত লাভ থাকিতে পারে, একবার ভাবিয়া দেখুন। পাট দ্বারা কেবল চট, পাইল, দড়ি দড়া ইত্যাদি দ্রব্য সকল প্রস্তুত হয়, এমত নহে ; তাহাতে কার্পাসসূত্র মিলিত করিয়া বস্ত্র বয়ন হয় ও সামান্য আঁশযুক্ত উদ্ভিদের সহিত মিলিত হইয়া কাগজ প্রস্তুত হয়। পাটকাটী দ্বারা জ্বালানী কাষ্ঠেরও অনেক সাহায্য হয়।

পাটকাটিতে যদি কোষ্টা লাগিয়া থাকে, তবে সাবধানে জ্বালাইতে হয়, নহিলে অগ্নি উনান হইতে বহির্গত হইয়া পড়ে। অসাবধানতা প্রযুক্ত অনেকেরই ইহা দ্বারা গৃহদাহ হইতে দেখা গিয়াছে। ঐরূপ কোষ্টা লাগান পাটকাটী না জ্বালানই শ্রেয়স্কর। শুকান পাট গাছ ছালসমেত জ্বালাইলে জমির সার প্রস্তুত হয়। আর ইহার কর্ত্তিত শিকড় গোরুর কাঁদের আঁইসা ঘায়ের একটী মহৌষধ। ১০।১২ খানি ঐ শিকড় ভস্ম করিবে ও এক টুকরা ছেঁড়া কম্বল ঐ সঙ্গে পোড়াইবে, তৎপরে এক আউন্স কাঁচা চুণ ও তদুপযুক্ত সরিষার তৈল মিশাইয়া জুতাবুরুষের কালীর সদৃশ করিয়া লইবে। ৫।৭ দিন ঘা স্থানে দিলে, ঘা সারিয়া গিয়া তথা হইতে লোম সকল বিনির্গত হইয়া পূর্ব্ববৎ হইবে।

শ্রীকমলাকান্ত মজুমদার।
আলাল—মালদহ।

ঢাকাই মস্‌লিন।

(২)

পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্ত্রীলোকগণ সূতা কাটিয়া তাঁতিদিগকে দিলে পর তাঁতিরা তাহা হইতে নলী পাকায় ও ফেটি বাঁধে। নল হইতেই নলী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। নলী পাকান কি জান? কতকগুলি ফাঁপা কঞ্চি কাটি ৪ ইঞ্চি আন্দাজ টুকরার আকারে কাটিয়া, তাহাতে এক এক ফেটির সূতা জড়ান হয়। এইরূপ সূতা জড়ান এক একটী নলকেই নলী বলা হয়। নলীর গর্ত্তে একটী সরু কাটি পুরিয়া

ঐ কাটির দুই প্রান্ত একখানা চেরা বাখারির অগ্রভাগে লাগাইয়া দিলে, গাড়ির চাকার মত নলীটী ঘুরিতে থাকে। যে বাখারিতে নলীটী লাগাইয়া দেওয়া হয়, উহা তাঁতি বাম পদের অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরে। তাঁতির ডান হাতে এক খানা ফেটি জড়াইবার নাটাই থাকে; নাটাইয়ের বাঁটের নিম্ন ভাগটী একখণ্ড নারিকেল খোলের উপর ঘুরিতে থাকে, ঐ খোলটী তাঁতির ডান পায়ের আঙ্গুলের ঠেসে স্থির থাকে। একটী নলীর সমস্ত সূতা নাটাইয়ে জড়াইয়া লইলে, উহা নাটাই হইতে উঠাইয়া ছোট ছোট ফেটি বাঁধা হয়।

সমস্ত সূতাকে প্রধানতঃ টানা ও পোড়েন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। টানা অপেক্ষা পোড়েনের সূতা সূক্ষ্ম হওয়া দরকার। এই পোড়েনের সূতা আবার তিনরূপে বাছাই করা হয়। ভাল সূতাগুলি ডান হাতের দিকে, মাঝারিগুলি বাম হাতের দিকে এবং খেলো বা মোটাগুলি মাঝখানে দেওয়া হয়। আমাদের দেশী কাপড় মাত্রেই যে মুখপাতের দিকে ভাল ও পিছনের দিকে খারাপ কেন হয়, তাহা এখন বেশ বুঝ্‌লে ত ?

টানা ও পোড়েনের সূতা ঠিক এক সময়ে বা একই নিয়মে তৈয়ার করা হয় না। পোড়েনের সূতা যেমন কাপড় বুনিবার দুই দিন পূর্ব্বে তৈয়ার করিলেই চলে, টানার সূতা সেরূপ নয়। ইহা তৈয়ার করিতে অনেক সময় দরকার, এই সূতা তৈয়ারির কথা বিস্তৃতরূপে বলিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়। আমরা মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, টানার সূতা তিন দিন জলে ভিজাইতে হয়। চতুর্থ দিনে সূতাকে বেশ করিয়া ধুইয়া ফেটি বাঁধিয়া জলে ভিজাইতে হয় এবং দুইটা কাটির দ্বারা ঐ ফেটির সূতাটুকু খুব পাক দিয়া জড়াইয়া রৌদ্রে শুকান হয়। তারপর সূতাগুলিকে আবার দুই দিনের জন্য কয়লার গুঁড়া বা ভূষা মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া রাখা হয় ও দুই দিনের পর পরিষ্কার জলে ধুইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হয়। এই সময় সূতাকে আবার একবার নাটাইয়ে পাকাইয়া, আবার এক রাত্রির মত জলে ভিজাইতে হয় ও পরদিন খইয়ের মাড়ের সহিত খানিকটা পরিষ্কার চূণ ও জল মিশাইয়া, এক রকম মণ্ড তৈয়ার করিয়া সূতা গুলিতে উত্তমরূপে মাখান হয়। তার-পর ঐ মণ্ডমাখা সূতাকে নাটাইয়ে জড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। এক-গাছি সূতার উপর আর একগাছি সূতা পড়িলে পাছে পরস্পরে জড়াইয়া যায়, এই জন্য মাড় দেওয়া সূতা নাটাইয়ে জড়াইবার সময় খুব সাবধান হওয়া দরকার—যেন এক এক ফের সূতা আলাদা আলাদা থাকে। মাড়মাখা সূতা

বেশ শুকাইয়া গেলে, আর একবার মাত্র নাটাইয়ে পাকাইয়া লইলেই টানার সূতা তৈয়ার হয়। কিন্তু আমরা যে সূতার কথা বলিলাম, ইহা কেবল সাদা থান বুনিবার জন্যই দরকার হয়। "ডুরে" কিম্বা "চারখানা" কাপড় তৈয়ার করিতে হইলে একটু স্বতন্ত্র নিয়মের দরকার। সাদা কাপড়ের জন্য যেমন একগাছি মাত্র সূতা পাইট করা হয়; তাহা না করিয়া ডুরের জন্য দুই গাছি সূতা ও চারখানার জন্য চারি গাছি সূতা একত্রে জড়ান ও উপরোক্ত নিয়মে পাইট করা আবশ্যক।

আজকাল আমাদের দেশীয় চলনসই বস্ত্র মাত্রেই প্রায় বিলাতী কাপড় অপেক্ষা কেন যে অধিক টেঁকে, তাহার প্রধান কারণ—আমাদের দেশের তাঁতিরা সূতাকে রীতিমত পাইট করে বলিয়া। ঢাকাই মস্‌লিনের সূতার যেমন পাইট দরকার, তেমন পাইট অবশ্য আর কোন কাপড়ের জন্য দরকার করে না। তথাচ একথা ঠিক যে, আমাদের দেশে যেরূপ যত্ন করিয়া বার বার সূতা পাকান হয় ও তাহাতে মাড় মাখাইয়া শক্ত করা হয়, সেরূপ না করিলে দেশী কাপড় কখনই টেঁকসই হইত না। আবার দেখ, সূতা বেশ করিয়া পাইট করিলে শুদ্ধ যে তাহা শক্ত হয়, তাহা নয়; কিন্তু সরুও হইয়া থাকে। ঢাকাই তাঁতিরা এতদূর ওস্তাদ যে, ৩০০ নম্বর বিলাতি সূতাকে পাইট করিয়া ঠিক ৪০০ নম্বরের সূতার মত করিয়া দিতে পারে। যে কাপড়ের সূতা ধোপে কম ফুলে বা ফাঁপিয়া উঠে, তাহাই অধিক দিন স্থায়ী হয়। আমাদের দেশী তাঁতিরা যে সূতা তৈয়ার করে, তাহা বেশ পাক খায় বলিয়া ধোপে এলাইয়া যায় না। ইহাই আমাদের দেশী কাপড়ের বেশী টেঁকসই হইবার সর্ব্ব প্রধান কারণ।

পোড়েনের সূতা কাপড় বুনিবার দুই দিন পূর্ব্বে তৈয়ার করিলেই কেন চলে জান? কারণ, টানার সূতার মত পোড়েনের সূতা একবারে তৈয়ার করা দরকার করে না। ইহার পাইটও অনেক কম, এমন কি ইহাতে যে মাড় লাগান হয়, তাহাও অল্প। একদিন বুনিবার মত খানিকটা সূতা লইয়া ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া, পরে নাটাইয়ে পাকাইয়া ও অল্প করিয়া মাড় মাখাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিলেই হইল। এইরূপে পোড়েনের সূতা একেবারে তৈয়ার না করিয়া, প্রত্যহ একদিনের বুনিবার মত খানিকটা করিয়া সূতা প্রস্তুত করিলেই চলে।

টানার সূতা তৈয়ারি হইলে পর এক প্রশস্ত জায়গায় গিয়া উহা বিস্তার

করিয়া তাঁতিরা কাপড়ের থান যত বড় হইবে, সেই মাপ অনুসারে দুই সারি গোঁজ পুঁতিয়া তাহাদের গায়ে লম্বাভাবে সূতা বিছাইতে থাকে। দুইটী লাইন সমান্তরাল হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ এক লাইন হইতে অপর লাইনের ফাঁক কোথাও কম বেশী হয় না, যেন সব জায়গায় সমান হয়। কাটি পোঁতা হইলে তাঁতিরা দুইহাতে দুইখানি নাটাই লইয়া, উহার উপর সূতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। মনে কর, যদি খোঁটার লাইন দুটী উত্তর দক্ষিণে লম্বা হয়, তাহা হইলে প্রথমে যদি পশ্চিম ধারের লাইনের উত্তর সীমা হইতে তাঁতি চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে যখন সে ঐ লাইনের দক্ষিণ সীমায় যায়, তখন তাহাকে একটু পূর্ব্ব মুখ হইয়া পূর্ব্ব লাইনের দক্ষিণ সীমার খোঁটার কাছে যাইয়া, আবার উত্তর মুখ হইয়া বরাবর পূর্ব্ব লাইনের উত্তর সীমায় আসিতে হয়। দুইটী লাইনে এইরূপে যখন একবার সূতা বিছান হয়, তখন আবার তাহাকে পূর্ব্বদিকের উত্তর সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম লাইনের উত্তর প্রান্তে আসিতে হয়। এইরূপ বারবার যাওয়া আসা করিতে হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে "টানা হাঁটা" বলিয়া থাকেন। একখানি কাপড়ের বহরে যতগুলি সূতা বসান দরকার, ঠিক ততবার "টানা হাঁটা" আবশ্যক।

টানার সূতা বিছান হইলেই প্রায় উহা সানায় চড়ান হয়। কোন কোন স্থলে কেবল ঐ সূতা তাঁতের গোল দণ্ডে প্রথমতঃ জড়াইয়া তারপর সানায় চড়ান হয়।

[ক্রমশঃ।

রেশমী কাপড়।

আজি কালি দেশী কাপড়ের প্রতি লোকের ক্রমশঃ যে প্রকার আস্থা জন্মাইতেছে, তাহাতে কোথায় কিরূপ কাপড় পাওয়া যায়, তাহার বিবরণ প্রকাশ করা অনাবশ্যক হইবে না—এই বিবেচনায় শীর্ষোক্ত প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। অদ্য বর্দ্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলার তিনটী প্রধান

আড়ংএর কথা বিবৃত করিব। পাঁচকুলা-জগদাবাদ এবং রাধাকান্তপুর আড়ং বৰ্দ্ধমান এবং বিষ্ণুপুর আড়ং বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। ইঃ আইঃ রেলওয়ে লুপ লাইনস্থিত বনপাস ষ্টেসন হইতে এক ক্রোশ দূরে পাঁচকুলা এবং জগদাবাদ নামক ২টী গ্রাম আছে। এই গ্রামদ্বয়ের নামে প্রথম আড়ংটীর নাম হইয়াছে। পাঁচকুলা এবং জগদাবাদ ব্যতীত থানো, জয়কৃষ্ণপুর, বেলেড়া এবং কলিগ্রাম এই আড়ং'এর অন্তঃপাতী। রাধাকান্তপুর, মেমারি, গাঙ্গুর, গস্তার, পোঁটবা এবং বোহার গ্রাম লইয়া রাধাকান্তপুরে আড়ং হইয়াছে। বিষ্ণুপুর, সোণামুখী, বীরসিং, কোটা এবং মানকর বিষ্ণুপুরে আড়ং'এর অধীন। এই সকল স্থানে অনেক তন্তুরে তাঁতীর বাস এবং তাহারা নানা জাতীয় রেশমী কাপড় বয়ন করে। লাল, নীল, বেগুনে, সবুজ, জরদ, সাদা এবং গর্ণেট (সবুজ তানা এবং লালের ভরণা) রঙ্গের ভুজনার জোড়, বিবাহের জোড়, শাটি, ঘুনী এবং শাল আঁচলা (মুসলমানদের জন্য), সেটী পটী (মান্দ্রাজিদের জন্য), পাছাপেড়ে, পদমপেড়ে (প্রধানতঃ পাগড়ীর জন্য), ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর মূল্যবান রেশমী কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাঁচ সিকা হইতে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের কাপড় পাওয়া যায়। পাঁচকুলার বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্ত এবং জগদাবাদের বাবু শশিভূষণ হালদার নামক দুই ব্যক্তি প্রথমোক্ত শ্রেষ্ঠ আড়ং'এর রেশমী কাপড় ব্যবসায়ীগণের মধ্যে প্রধান। মেমারি নিবাসী বাবু রসিকলাল এবং প্রিয়গোপাল বিষয়ী রাধাকান্তপুরে আড়ং'এর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। কলিকাতা খ্যাংরাপটীতে বিষয়ী মহাশয়গণের রেশমী কাপড়ের বৃহৎ কারবার আছে। বিংশতি বৎসর হইতে এই কাপড়ের ব্যবসায় ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে ইহার কাটতি হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের মৌলমীন প্রভৃতি নগরেও উক্ত রেশমী কাপড় চালান যায়। ভারতে কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, ত্রিচিনপলী, মাদুরা, কটক, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে ইহার বিশেষ আদর হইয়াছে। প্রথমোক্ত আড়ং'এর ব্যবসাদারগণ ঘাটাল, রসিকগঞ্জ, রাজসাহী, সরদহ, গুণুটীয়া, বেলে, সাইথিয়া, রামপুরহাট, নেতুড়, কুস্তোড়, বিষ্ণুপুর, আমানিগঞ্জ, ঘাটীপলসা, মুচে প্রভৃতি স্থান হইতে রেশমী সূতা আনাইয়া তাঁতিগণকে অগ্রিম মূল্য দিয়া কাপড় মনোমত প্রস্তুত করান বা তাঁতিগণের নিকট হইতে পছন্দানুযায়ী কাপড় ক্রয় করেন। বিষ্ণুপুরে আড়ং'এরও কাপড় কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। সুতরাং ইহার কাটতি ক্রমশঃ

বাড়িতেছে। বিষ্ণুপুরে একপ্রকার রেশমী এবং তম্বুরে শীতবস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা অনেকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইয়া থাকে।

রত্নাকর।

রঙ্গপুরে-তামাক।

তামাকের জন্য রঙ্গপুর ও কোচবিহার খুব প্রসিদ্ধ; কিন্তু রঙ্গপুর ও কোচবিহারের সকল স্থানে তামাক উৎপন্ন হয় না। রঙ্গপুরের উত্তরাংশে জলপাইগুড়ির সীমা পর্য্যন্ত এবং কোচবিহারের পশ্চিম দক্ষিণ অংশেই ভাল তামাক জন্মিয়া থাকে। রঙ্গপুর অপেক্ষা কোচবিহারের তামাক আরও উৎকৃষ্ট, এ অঞ্চলে ঐ সকল তামাককে রাজওয়ারী তাম্রক বলে, উহা রঙ্গপুরের তামাক অপেক্ষা ২। ৩। ৪। ৫ বা ৬ টাকা পর্য্যন্ত বেশী মূল্যে বিক্রয় হয়। এই সকল তামাক অনেক স্থলে "কোঁচাড়ে" তামাক বলিয়া উল্লেখিত হইয়া থাকে। এ অঞ্চলে প্রধানতঃ তামাকের কারবার জন্য বাউরা, রমণীগঞ্জ, ঘোড়ামারা, ভোটমারী, কাকিনা, কিশোরীগঞ্জ ও ডোমার প্রভৃতি কয়েকটী বন্দর আছে। ঐ সকল বন্দরের ক্রীত তামাক সকল কলিকাতা, কালনা, কাটোয়া, নলছিটকি ও নারায়ণগঞ্জে প্রেরিত হয়। অল্প মূল্যের তামাক ও বিষপাত কলিকাতা ইত্যাদি স্থানে যায়। উচ্চ মূল্যের তামাক সকল সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও নলছিটকি, ঝালোকাটী ইত্যাদি স্থানে প্রেরিত হয়। তামাকের মূল্য পূর্ব্বে পাকি মণ ২৲ টাকা হইতে ৫। ৬ টাকার বেশী প্রায় দেখা যায় নাই। বিষপাতের মণ তিন চারি আনা হইতে আট দশ আনার অধিক ছিল না। সেই তামাক এখন ৪ টাকা হইতে ১৫। ২০ টাকা ও বিষপাতের মণ ১৲ টাকা হইতে ৩। ৪ টাকাও বিক্রয় হইতে দেখা যায়; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট তামাক আজকাল প্রায় হয় না, উৎপন্নও পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইতেছে। যে গৃহস্থ ৩০ মণ তামাক পাইত, সে এখন ১৫। ১৬ মণও পায় কিনা সন্দেহ। পাটের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতেই বোধ হয়, কৃষকেরা পাট-চাষের প্রতি বেশী মনোযোগী হইয়াছে; তজ্জন্য তামাকের প্রতি আর তত যত্ন নাই।

পূর্ব্বে যে তামাকের বিষয় উল্লেখিত হইল, তাহার চাষ বড় সহজ নহে। যত্ন ব্যতীত রত্ন মিলে না; যে যত পরিশ্রম করিতে পারে, তাহার তামাক ততই ভাল হয়। তামাকের জমিতে সার দেওয়া একটী প্রধান কার্য্য, গোময় সারই এ অঞ্চলে ব্যবহার হইয়া থাকে। কৃষকেরা বাটীর গরুর গোবর প্রায় বার মাসই তামাকের জমিতে ফেলে, তদ্ব্যতীত অনেকে মাঠের গোবর কুড়াইয়া আনিয়া তামাকে সার দেয়। পরিবারের মধ্যে লোক বেশী ও গরু অধিক থাকিলেই তাহার তামাক ভাল হয়। একক লোকের দ্বারা তামাকের যত্ন হইতে পারে না; সুতরাং তাহার তামাকও আশানুরূপ হয় না। দো-আঁশ মাটীই তামাকের উপযুক্ত, বালুর-ভাগ বেশী থাকিলেও সে জমিতে তামাক জন্মে; কিন্তু পৌষ মাস হইতেই সেখানে জল সেচন করিতে হয়, নচেৎ তামাক ভাল হয় না। মাঘের শেষ বা ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলে, সকল তামাকেরই যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। শিল তামাকের অত্যন্ত অপকারী; বেশী শিলাপাত হইলে তামাক একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তাহার মূল্য থাকে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তামাকের সময় শিলা নিবারণ জন্য এ অঞ্চলের অনেক স্থানে শিরাল আছে। উহারা খাটীগাড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর কৃষকদিগের নিকটে কিছু কিছু মামুলী (পয়সা) পায়। প্রবাদ যে, মেঘ ও বৃষ্টির সময় শিরালগণ উলঙ্গ অবস্থায় আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে, আর মেঘ সরিয়া যায়। শিল না পড়িলেই শিরালের বুজরকী বাড়ে; পড়িলে, অপ্রতিভ হইতে হয়।

কতকটা জমি খুব ভালরূপে পা'ট করিয়া ভাদ্র মাসেই তামাকের বীজ বপন করিতে হয়। কপি চারা যেমন ঘন বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া যায়, তামাকেরও তদ্রূপ হয়। তামাকের চারাকে এ অঞ্চলে "পুলি" বলে। বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেকে বৃষ্টির সময় পুলি বাড়ীতে চালা তুলিয়া দেয়। কোন বিঘ্ন না হইলে, আশ্বিনের শেষে বা কার্ত্তিকের প্রথমেই চারাগুলি রোপণোপযোগী হইয়া উঠে। ঐ সময় মধ্যে কৃষক তামাকের জমি প্রস্তুত করিয়া তোলে। তামাকের জমিতে ষোল চাষ, আঠার চাষ, না দিলে ভাল হয় না। কার্ত্তিক মাসেই তামাক রোপণের সুসময়, অগ্রহায়ণের রোপিত তামাক আশানুরূপ হয় না। রোপণের দুই চারি দিন পরেই তামাক ক্ষেত্রে লাঙ্গল টানিয়া দিতে হয়, পরে নিড়ানীর সময় ঢেলা ভাঙ্গিয়া

দিতে হয়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে যখন তামাকের গাছ কতকটা বড় হইয়া উঠে, তখন কৃষকেরা উহার গোড়পাতা ভাঙ্গিয়া দেয়; এই পাতগুলিই শুকাইলে বিষপাত হইয়া থাকে। তামাক-ক্ষেত্র দুই বার নিড়ানী হইলেই ভাল হয়, গোড়পাত ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পরে, প্রত্যেক গাছের ৮।৯টী করিয়া পাত রাখিয়া মস্তক ভাঙ্গিয়া দিতে হয় ও তৎপরে পাতের গোড়া দিয়া যে সকল ডগা বাহির হয়, ক্রমে ২।৩।৪।৫ বার সেই ডগা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, শেষে তামাক পাতগুলি যখন পুরু হইয়া উঠে, তখনই কাটা আরম্ভ হয়। প্রাতঃকালেই তামাক কাটার সময়, রৌদ্র না হইলে কর্ত্তিত তামাক কালো হইয়া যায়; তজ্জন্য আকাশে মেঘ আছে কি না, তাহা দেখিয়া তামাক কাটা কর্ত্তব্য। কর্ত্তিত তামাকগুলি প্রায় সমস্ত দিন ক্ষেত্রে শুকায়; অল্প বেলা থাকিতে কৃষকগণ উহার ৪।৫টী করিয়া পাত একত্র বাঁধিয়া ঘরে তোলে, পরদিন কাবারিতে ঝুলাইয়া ঘরের চালে শুকাইতে দেয়। পশ্চিমে বায়ুতেই তামাক শীঘ্র শুকায়। সচরাচর এক মাসেই তামাক প্রায় চাল হইতে নামাইতে দেখা যায়। তখন অনেকগুলি করিয়া তামাক একত্র বাঁধিয়া গাদি দিয়া রাখে, পরে বিক্রয় হয়। তামাক কাটা চৈত্র মাসের মধ্যেই প্রায় শেষ হইয়া যায়। বৃষ্টি পাইয়া যে তামাক কাঁচা হয়, তাহা বৈশাখ মাসেও কাটিতে দেখা যায়। এ জেলার কোন কোন স্থানে আবার কাঁচা কাটের তামাক আছে, তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র; কাঁচা কাটের তামাকই মগেরা বেশী ক্রয় করে।

পুরুলিয়া।

ইহা মানভূম জেলার সদর ষ্টেশন। মানভূম গবর্ণমেণ্টের বে-বন্দোবস্তি প্রদেশের অন্তর্গত। এখানকার বড়কর্ত্তা ডেপুটী কমিশনর, ইনি ছাড়া জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সবজজ, মুনসেফ আছেন—গণ্যমান্য উকীল, মোক্তারও অনেক আছেন। তবে স্থায়ী জজ এখানে নাই, রাঁচির ডিষ্ট্রীক্ট জজ বৎসরে দুই বার এখানে আসিয়া দায়রার বিচার করেন। অধিবাসীর সংখ্যা আন্দাজ ১০।১২ হাজার।

পুরুলিয়া সহরটী খুব বড় না হইলেও সুন্দর এবং পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন বটে। এ প্রদেশটী প্রস্তরময়—পাথর এবং কাঁকরের ভাগ বেশী, মাটী ধুলা নাই বলিলেই হয়। নিকটে ও দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাহাড় আছে, তাই পাহাড়ী দেশ বলিয়া ভূমি সমতল নহে।

এখানে ধান জন্মায়, কিন্তু উহা সূক্ষ্ম নহে, চাউল কাঁকরে পূর্ণ—লুকাইয়া ভাত খাইবার যো নাই, দূরের লোক জানিতে পারে। জল উত্তম। ইন্দারার ভাগই বেশী। লোকে ইন্দারার জলে রন্ধন এবং উহা পান করিয়া থাকে—স্নানও ঐ জলে হয়। সহরের মধ্যে "সাহেব বাঁধ" নামে খুব লম্বা-চওড়া একটী জলাশয় আছে, উহা ঠিক হ্রদের ন্যায় সুগভীর, তলদেশ প্রস্তরময় বলিয়া সকল সময়েই উহার জল বরফ-দেওয়া জলের মত শীতল। উহার তীরে দুই একটী আফিস এবং সাহেবদের বাসস্থান আছে। উহার এক ধারে কলিকাতার গঙ্গার ঘাটের মত দুই তিনটী চাঁদনীযুক্ত ঘাট বর্ত্তমান—সাহেবদেরটী স্বতন্ত্র। বাকী দুইটীতে দেশীয়দিগের স্নান ইত্যাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট। এখানে স্নান করা বিপজ্জনক। ঘাটের নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়া চারি অঙ্গুলী দূরে যাইলে অতল জলে নিমগ্ন হইতে হয়। উহার জল সুস্বাদু ও অতি নির্ম্মল, জলের নিম্নদেশ দশ বার হাত পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। ঐ জলাশয়ের মধ্যে পাশাপাশী দ্বীপের ন্যায় বৃক্ষাদি-পূর্ণ দুই খণ্ড জমি আছে। দেখিতে অতি সুন্দর—উহাই জলাশয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

এখানকার আদিম অধিবাসিরা বড় অসভ্য। আমাদের হুগলী, হাবড়া জেলায় সে সকল লোক "কুলী" আখ্যা পাইয়া তথায় চাষ আবাদ করিয়া বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে, তাহারাই এ দেশের "মহাত্মা"। আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, এদেশে তাহারাই হাটে বাজারে দুদ, দই, মাছ, আলু, পটল, তরি তরকারীর ব্যবসায় করিতেছে।

এখানে দুইটী স্কুল আছে; একটী সরকারী, অপরটী বে-সরকারী। কালেজ নাই। এ দেশের লোকেরা প্রায়ই মূর্খ—তাহাদের ছেলেরা স্কুলে পড়ে না। যাহারা পড়ে, তাহারা ভদ্রলোকের ছেলে—বিদেশী। এখানে অনেকগুলি আফিস, আদালত, জজ আদালত, মুনসেফ্ আদালত, ম্যাজিষ্টেট-আদালত, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিস, ট্রেজরি অফিস, কোর্ট অব-ওয়ার্ডস অফিস, পুলিশঅফিস, রেজেষ্টরী অফিস, হেড পোষ্টঅফিস, ইহা ছাড়া বার-লাইব্রেরী,সাধারণ পুস্তকাগার এবং অন্নপূর্ণা নামে একটী স্থায়ী প্রেস আছে। "মানভূম" এই প্রেস হইতে প্রতি সপ্তাহে বাহির হয়।

এদেশ এত পাতুরে—এত টান যে, এখানে কলাগাছ জন্মায় না; যাহা জন্মায়, তাহাকে তেলে-জলে ছেলের মত মানুষ করিতে হয়। বৃষ্টি হইলে পথে কাদা হয় না। জলে সবই ধুইয়া পথের প্রস্তর ও কঙ্কর তক্ তক্ করে। শীতকালে শীত এবং গ্রীষ্মে গরম বেশী। এখানে মাছ, দুধ, ঘি খুব পাওয়া যায়। হরিতকী, লাক্ষা, তসরগুটি, মহিষের শৃঙ্গে তয়েরী ছড়ি ইত্যাদি পণ্য দ্রব্য এদেশ হইতে কলিকাতায় যায়। এখানে আসিতে হইলে আসানসোলে নামিয়া বি, এন, রেলযোগে দক্ষিণ মুখে আসিতে হয়। পুরুলিয়া বি, এন, আর কোম্পানীর একটী বড় ষ্টেশন। ইহার নিকটে ও দূরে অনেক কয়লার খঁনি আছে। রাঁচির কমিশনর এ প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা—বাঙ্গলার ছোট লাট "সোণার কাটি, রূপার কাটি"।

হিন্দু বিস্কুটের কারখানা।

১২৯৯ সালে আমরা এই ম্যানুফেক্টারী স্থাপিত করি। আমাদের সমসাময়িক কে, সি, বসু মহাশয়ও ইহার কারখানা খুলেন। তৎপরে হাজার দেড় হাজার টাকার মূলধন লইয়া অন্যান্য ২।৪ জন ব্যক্তি এই কার্য্য খুলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিযোগিতার নিকট তাঁহারা ক্ষতি সহ্য করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে আমরা উভয়ে অদ্যাপিও দাঁড়াইয়া আছি। পরস্পরে প্রতিযোগিতাও খুব চলিতেছে। এইজন্য ছয় মাস পূর্ব্বে যে বিস্কুটের পাউণ্ড আমরা ।।/০ আনা বিক্রয় করিয়াছি, এখন তাহার দর চারি আনা হইয়াছে। যেমন দর কম হইয়াছে, তেমনি বিস্কুটেরও অবস্থা শস্তার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা খুব ভাল ময়দা দিতাম, উৎকৃষ্ট ৬০৲ মণের মাখম দিতাম এবং কাশীপুরের ১ নং চিনি দিয়া বিস্কুট করিতাম, এক্ষণে তাহার স্থলে ৩ নং ময়দা, ৩৪৲ টাকা মনের ঘৃত ও ৭।।০ টাকা মণের গ্রে মার্কা চিনি দিয়া করিতেছি। তবে যে পূর্ব্বের ভাল বিস্কুট এখন আদৌ আমাদের কারখানায় হয় না, তাহা নহে। এখনও উহা আছে, তাহা আমরা মাসে একবার প্রস্তুতি করি। প্রত্যহ আমাদের কারখানায় ১২/০ মণ বিস্কুট তৈয়ারী হয়। বার মণের কম হইলে কারখানার খরচ পোষায় না। যে দিন ১২/০ মণের

কম হইবে বুঝি, সে দিন কারখানা বন্ধ থাকে। পূর্ব্বে আমরা দেশী নিয়মে দেশী যন্ত্রাদি দ্বারা একাজ করিতাম। এক্ষণে ৭ হাজার টাকা মূল্যের যন্ত্র ইত্যাদি ইহার সরঞ্জম সকল বিলাত হইতে সম্প্রতি আনাইয়াছি। শুনিতেছি, কে, সি, বসু মহাশয়ও এই সকল বিলাতী কল আনাইয়াছেন। আমাদের কারখানায় তিনপ্রকার বিস্কুট হয়, নচেৎ বিস্কুট বহু প্রকারের আছে। আমরা জেমল্ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতাসার মত বিস্কুট, এরারুট বিস্কুট এবং মিক্সড্-বিস্কুট প্রস্তুতি করি। পাউরুটী আমাদের কারখানায় হয় না। উদাহরণ স্বরূপ জেমস্ বিস্কুটের ভাগ এখানে বলিতেছি। ময়দা ১/০ মণ, ঘৃত /২৷৷০ সের, চিনি /৫ সের এবং লবণ অল্প। এই সকল দ্রব্য মেশিনে ফেলিয়া একত্র করা হয়। চিনি জলে গুলিয়া লইতে হয়। এই জলেরও পরিমাণ আছে। প্রথমতঃ মেশিনের ভিতর ময়দা দিয়া, তাহাতে অল্প অল্প ঘৃত দিতে থাকি, বেশ ময়ান দেওয়া হইলে, অল্প লবণ মিশাইয়া তৎপরে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ চিনির জল উহাতে দিলে ময়দা মাখার মত হয়। এই বার বেলন মেশিনে এই মাখা ময়দা দিয়া ময়দার পাত করা হয়। সেই পাতকে লইয়া পঞ্চ মেশিনে দিতে হয়। পঞ্চ মেশিন অর্থাৎ এই যন্ত্রে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত ময়দার পাত বিস্কুট আকৃতি ধারণ করে, পরন্তু পঞ্চ মেশিনের নিম্নেই তারের জাল থাকে। এই জাল তিসির খাদ কষিবার জালের ন্যায়। মেশিন বিবেচনায় ইহার আকৃতি হয়। আমাদের কারখানায় ৩ হস্ত লম্বা, ১৷৷০ হস্ত চওড়া জাল অনেক আছে। যখন শত শত বিস্কুট এই জালে আসিয়া পড়ে, তখন এই জাল দুই গাছি শিকলের উপর থাকে, শিকল দুই গাছি হুইলের উপর থাকে এবং হুইলটী বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে গতি প্রাপ্ত হয়, এইজন্য শিকল দুই গাছি আস্তে আস্তে সরিয়া জালের উপর কাঁচা বিস্কুট সহিত তন্দুরের মধ্যে অন্ততঃ এক মিনিটে যেমন উহার ভিতর দিয়া যায়, তন্দুর মধ্যস্থ প্রবল উষ্ণতা বশতঃ উক্ত সময়ের মধ্যে কাঁচা বিস্কুট "সাঁকা" অর্থাৎ রুটী যেমন সেঁকে, তাহাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ভাবে সেঁকা হইয়া যায়।

তন্দুর অর্থাৎ পাউরুটি এবং বিস্কুট করিবার উনান বিশেষ। ইহার বিলাতী যন্ত্র আনাই নাই, এদেশে উহা প্রস্তুত করিয়াছি। তন্দুর দেখিতে ঘরের মত; এই ঘরের সম্মুখে প্রবল অগ্নি করা হয়, এই অগ্নি তাপে ঘরটি উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্তের মাত্রা আছে। প্রত্যহ কারখানা চলিলে, প্রত্যহ অগ্নি করিলে তন্দুর ঘর উত্তপ্ত থাকে; নচেৎ ২।১ দিন কারখানা বন্ধ থাকিলে অন্ততঃ এক

দিন কেবল প্রবল অগ্নি করিয়া অগ্রে তন্দুর তাতাইতে হয়, তৎপরে একার্য্য চলে। আমরা কাঁচা কোক কয়লা দিয়া ঘর উত্তপ্ত করি। ইহাতে কয়লাও বিস্তর খরচ হয়। এরারুট, ঘৃত ও চিনি দ্বারা যে বিস্কুট হয়, তাহাকে এরারুট বিস্কুট বলে। বিস্কুট বহু প্রকারের হইলেও তাহা এই এক কলেই হয়, কেবল "পঞ্চ" করিবার যন্ত্র স্বতন্ত্র মাত্র। পঞ্চ করিবার সময় ছিট্ পড়ে। মনে করুন, ৩ হস্ত লম্বা ১॥০ হস্ত চওরা, ময়দা ঘৃত ও চিনির জল মাখা পাতে এক একটা আধ্‌লা পয়সা ফেলিয়া দিয়া, উহা ছাপ দিলাম, এই ছাপ তুলিবার ধার গুলি ফাঁক আছে, ঐ ফাঁকা স্থানের মাখা ময়দাকে ছিট্ বলে। পঞ্চও তাই। খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানের ডিবের মত উহারও দুই মুখে তীক্ষ্ণ ধার আছে। ইহা খুলা এবং দেওয়া যায়; পরন্তু পঞ্চ যন্ত্রের মধ্যে এইরূপ অনেক ডিবা আছে। এই জন্য ময়দা মাখা লেইকে এক চাপে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া একেবারে কাটিয়া উহার নিম্নস্থ জালে নিক্ষেপ করে। এজন্য যে ছিট পড়ে, তাহা লইয়া পুনরায় পাত করা এবং পুনরায় পঞ্চ করা হয়। ১২ মণ ময়দা ভিজাইয়া সমস্ত দিনে এইরূপ করিয়া ছিট্ মারা হয়। একাজে ছিট্ মারিতেই কষ্ট বেশী। শেষে কিছুই ছিট্ থাকিবে না।

ময়দা ১/ মণ	...	৪।০
ঘৃত /২॥ সের	...	২।০
চিনি /৫ সের	...	২৲

এই ১ মণ /৭॥০ সের মালে ১ মণ বিস্কুট হয় না, কিছু কমতা যায়। বিস্কুটকে হাল্‌কা করিবার জন্য কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্‌নেসিয়া দেওয়া হইত, এখন তাহা ব্যবহার প্রায় উঠিয়াছে। যাহা হউক, কম্‌তা ও অন্যান্য খরচা যথা ;—কুলি, কারীগর, টীন মিস্ত্রি, লেবেল ছাপা, প্যাক করা ইত্যাদি মন করা আমরা ১॥০ টাকা ধরি, তাহা হইলে প্রত্যহ ১২ মণ মাল হইলে প্রত্যহ ২৪৲ টাকা খরচা আমরা ধরি। অতএব পূর্ব্বোক্ত মালের দাম ৮॥০ টাকা এবং খরচা ১॥০ টাকা; মোট বিস্কুটের পড়ন হইল ৯৲ টাকা। উহা বিক্রী হয় ১৬৲ টাকা মণ। ইহা ভিন্ন আমরা টাকার ব্যাজ এবং নিজেদের খরচা ধরি প্রত্যহ ২১৲ টাকা; এই সকল খরচা ইত্যাদি ধরিয়া মণ করা ৫৲ টাকা আমাদের লাভ থাকে। পূর্ব্বে ইহাপেক্ষা অধিক লাভ ছিল। এখন আর তত নাই।

তন্দুরের ভিতর শিকলময়ের উপর জালে যখন বিস্কুট সেঁকা হইয়া বাহির হয়, তখন তন্দুরের পরপার্শ্বে একজন লোক থাকে, সে উহা ধরিয়া লয়

এবং সঙ্গে সঙ্গে গরম থাকিতে থাকিতে উহাকে টীনের কৌটার ভিতর পুরিয়া উহার মুখ রাংঝাল দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। ১টীন গরম বিস্কুট পুরিলে টীনের মধ্যের বাতাস বাহির হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে আঁটা হয় বলিয়া ইহাকে "এয়ার টাইট্" করা বলা হয়, এ অবস্থা অবশ্য ড্যাম্প অর্থাৎ শীতল স্থানে বিস্কুটের বাক্স না রাখিলে ১ বৎসর পর্য্যন্ত বেশ ভাল থাকে। ৩ মাস পরে উহা খুলিলেও ভিতর হইতে একটা গরম ঝাঁজ বাহির হয়।

২০।২২ সহস্র টাকা ভিন্ন ইহার কারখানা চলে না, পূর্ব্বে অল্প টাকায় চলিত। এখন পুর্ব্বাপেক্ষা ইহার কাটৃতীও বেশী হইয়াছে। দরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের সুবিধার মধ্যে বিলাতী বিস্কুট অপেক্ষা ক্রমে দেশী বিস্কুটের কাটৃতী বৃদ্ধি হইতেছে। এ কাজে বেশী টাকার প্রয়োজন হইবার কারণ এই যে, এখন ১দফা মাল প্রস্তুতি করিয়া ঘরে মজুত রাখিতে হয়, এবং ১দফা টাকা ধার রাখিতে হয়, এবং ১দফা মাল গ্রাহকের ঘরে মজুত থাকে। পূর্ব্বে এত ধার ছিল না, এখন ধার দেওয়া বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। ২০।২৫ লক্ষ টাকার মূলধনে ইহার একটী রীতিমত কোম্পানীর সৃষ্টি হইলে, তখন আমরাই আবার জর্ম্মণ, ইংলণ্ডে গিয়া ভারতের বিস্কুট তাঁহাদের বিক্রয় করিয়া আসিতে পারিব।

বিস্কুটের কারখানা।*

ভি, এস, ব্রাদার্স।

দমদম জংসন।

* ইহারাই প্রকৃত দেশ হিতৈষী। যদি বিলাতী বিস্কুট আমদানী বন্ধ হয়, তাহা হইলে ইহাদের দ্বারাই হইবে। ইহাদের প্রত্যেক মেসিনের ফটো ইত্যাদি দিতে পারিলাম না। মহাজন বন্ধুর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলে, অবশ্য ইহার ফটো ইত্যাদি দিব। মহাজনবন্ধুর অবস্থা পরিবর্ত্তন করা না করা, তাহা গ্রাহক মহোদয়দিগের উপর নির্ভর করে।

মঃ বঃ সঃ।

কার্পাসবস্ত্র।

গত বৎসর বিদেশ হইতে বিলাতে সাড়ে তিন কোটী পাউণ্ড বা সাড়ে বাঁয়ান্ন কোটী টাকার তূলা আমদানি হয়; ঐ তূলা হইতে বিলাতী কারিকরেরা সূতার কাপড় প্রস্তুত করে, কাপড়ে মাড় মাখায়, কাপড় ধোলাই করে এবং কতকগুলি কাপড়ে রং মাখায়; ইহাতে অনেক টাকা খরচ হয়। ঐ সাড়ে বাঁয়ান্ন কোটী টাকার তূলা হইতে সর্ব্বসমেত নয় কোটী পাউণ্ড বা একশত পঁয়ত্রিশ কোটী টাকার কাপড় প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে মাত্র দুই কোটী পাউণ্ড বা ত্রিশ কোটী টাকার কাপড় বিলাতেই কাটে, আর বাকী সাত কোটী পাউণ্ড বা একশত পাঁচ কোটী টাকার কার্পাসবস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হয়। সুতরাং গত বৎসর এই ব্যাপারে বিলাতের সাড়ে পাঁচ কোটী পাউণ্ড বা বিরাশী কোটী সত্তর লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। নিজের দেশে যে কাপড় কাটিয়াছে, তাহা বাদ দিয়া ধরিলেও এক তূলার কাপড়ের কাজে ইংরেজ জাতির স্বদেশের তূলাজাত দ্রব্যের অভাব ঘুচিয়াছে; অপরন্তু খাঁটী বায়ান্ন কোটী সত্তর লক্ষ টাকা পরের ঘর হইতে নিজের ঘরে আসিয়াছে। এই হিসাবেই ইংরেজ-জাতির শক্তিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন আমাদের ঘরের হিসাবটা একবার দেখা যাউক। ইদানীং প্রতি বৎসর আমাদের দেশে প্রায় ত্রিশ কোটী টাকার সূতা এবং কাপড় বিদেশ হইতে আসিতেছে। আর এ দেশ হইতে সবে এক কোটী বত্রিশ লক্ষ টাকার কাপড় অন্য দেশে যাইতেছে। ঐ সকল কাপড় প্রায় এদেশী কলজাত। অনেক ইউরোপীয়ও এদেশী কলের মালিক। সূতা এবং কাপড় উভয়ের হিসাব ধরিলে সবে দশ কোটী টাকার তূলাজাত দ্রব্য এদেশ হইতে বিদেশে যায়। এই টাকার কিয়দংশ ইউরোপীয়দিগের প্রাপ্য। বিদেশ হইতে তূলা আমদানি করিতেও কয়েক লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। বস্ত্র প্রস্তুত এবং সূতা কাটিবার কল খরিদ করিতেও অনেক টাকা বিদেশীকে দিতে হয়। এই সমস্ত বাদ দিলে আমাদের ঘরে অতি সামান্যই থাকে। এ সম্বন্ধে ঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যাইতে পারে যে, কাপড়ের জন্য প্রতি বৎসর আমাদিগকে প্রায় আটাশ কোটী টাকা বিদেশীর ঘরে তুলিয়া দিতে হয়; অর্থাৎ প্রতি বৎসর বিদেশী কার্পাস

সূত্র এবং বস্ত্র বণিকেরা এদেশীয় জনপ্রতি প্রায় এক টাকা হিসাবে লাভ পাইয়া থাকে। আর বিলাতে চারি কোটী উনিশ লক্ষ লোকের বাস। সেখানকার লোক কার্পাসজ দ্রব্য বেচিয়া জনপ্রতি প্রায় কুড়ি টাকা লাভ করিয়াছে।

এই কার্পাস বস্ত্র আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষের প্রোথিত কীর্ত্তি। অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। প্রায় আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে ফ্লেভিয়াস এরিয়ান তাঁহার প্রণীত Periplus of the Erythrean sea নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"আরবগণ ভারতের ভৃগুক্ষেত্র (Broach), পাতিয়ালা প্রভৃতি স্থান হইতে লোহিতসাগর প্রান্তস্থ আদুলী বন্দরে কার্পাসবস্ত্রের আমদানি করিত। মসলিপট্টনের সূক্ষ্ম বস্ত্র তখনও প্রস্তুত হইত। ঢাকাই মস্‌লিনের সৌন্দর্য্যে ধরাবাসী তখন বিস্ময় মানিত।" ইহার কিছুদিন পরেই পারস্য এবং আরব দেশীয় লোক ভারতবাসীর নিকট হইতে কার্পাসবস্ত্র-বয়ন-পদ্ধতি শিক্ষা করে। আরব দেশ হইতে ক্রমশঃ কার্পাসবস্ত্র মিশর এবং মধ্য আফরিকায় এবং পারস্যদেশ হইতে কার্পাসবস্ত্র ক্রমশঃ সিরিয়া এবং ভূমধ্যসাগর উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহ মধ্যে প্রচলিত হয়। প্রকাশ, ষষ্ঠ শতাব্দিতে চীন রাজ "আউতি" কোনও বৈদেশিক রাজদূতের নিকট হইতে এক প্রস্ত সুন্দর কার্পাসবস্ত্রের পরিচ্ছদ উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। চীনরাজ মহামূল্যবোধে অতি যত্নে উহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। মুসলমানগণের অভ্যুদয় কালে ইউরোপে কার্পাসবস্ত্রের প্রচলন হয়। দ্বাদশ শতাব্দির শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতাব্দির প্রারম্ভে স্পেন এবং ইতালির লোক কার্পাসবস্ত্র বয়ন করিতে শিখে। ষোড়শ শতাব্দির শেষ ভাগে ওলন্দাজগণের মধ্যে কার্পাসবস্ত্রের আদর জন্মে। সপ্তদশ শতাব্দিতে ইংরাজজাতি প্রথমে কার্পাসবস্ত্রের পরিচয় পান। এক সময় ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র প্রতিযোগিতায় বিলাতী পশমী বস্ত্রকে পরাস্ত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। ১৭২০ অব্দ হইতে ১৭২৮ অব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে কার্পাস নির্ম্মিত রঙ্গিণ কেলিকো এবং ভারতজাত কার্পাসবস্ত্রাদির ব্যবহার আইন অনুসারে নিষিদ্ধ হয়। ১৭৩৬ অব্দে সেই আইন কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল মাত্র। ইহার পর ওয়াট, কে, হারগ্রীভস এবং আর্করাইট প্রভৃতি নূতন যন্ত্রাদির উদ্ভাবন করিয়া বস্ত্র-বয়নের ব্যয় অনেক কমাইয়া ফেলেন। ইংরেজ তখন কার্পাসবস্ত্র-বয়ন-কৌশলে অন্যান্য জাতিকে পরাস্ত করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইবেন, মনে করেন। ১৭৬৪ সালে ইংলণ্ডে কার্পাসবস্ত্র-বয়নের

অনুমতি-সূচক আইন বিধিবদ্ধ হয়; কিন্তু তখনও বিদেশ হইতে তথায় কার্পাসবস্ত্র আমদানি করিবার নিষেধাজ্ঞা রহিত হয় নাই। ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগে ইংলণ্ডে কার্পাস শিল্পের অবাধ উন্নতির আরম্ভ। একশত বর্ষ মধ্যে ইংরাজজাতি আজ কার্পাসশিল্পে অন্তের অনধিগম্য স্থানে উপস্থিত। আর আমরা কোথায় পড়িয়া আছি, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি!

বিলাতে কার্পাস-বস্ত্রের উন্নতির পূর্ব্ব হইতেই বিলাতের সহিত আমাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত। ক্রমশঃ আমাদের দেশে বিলাতের কার্পাসজাত দ্রব্যের বন্যা কিরূপে নামিল, নিম্নের তালিকা দেখিলেই তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। ১৮৬৬-৭ অব্দে প্রথমে ইহার হিসাব গৃহীত হয়। ঐ বৎসর সর্ব্বসমেত প্রায় ১৩ কোটী ২৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৪ শত ১০ দশ টাকার কার্পাসজ দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতে আসে। ১৮৭৫-৬ সালের হিসাবে দেখা যায়, সেবার বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি কার্পাসজ পণ্যের মূল্য ১৬ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকারও অধিক। ১৮৮৮-৯ অব্দে আসে ২৭ কোটী ৭৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার উপর। ইহার মধ্যে ইংলণ্ডই সেবার যোগান ২৭ কোটী ৩৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকার অধিক মূল্যের কার্পাসবস্ত্র। আজ কাল শুদ্ধ কার্পাস সূতা এবং কাপড়ই আসিতেছে ত্রিশ কোটী টাকার উপর। অন্যান্য কার্পাস দ্রব্যের হিসাব ধরিলে মূল্য আরও অনেক বাড়িয়া যাইবে। টাকার বৃদ্ধির হার দেখিয়া বিলাতী বস্ত্রের আমদানি ঠিক অনুমান করা যাইবে না। এই সাঁইত্রিশ বৎসরে বিদেশী কাপড়ের মূল্য অনেক হ্রাস হইয়াছে। বাটা বিভ্রাটে ও অনেক আমদানি দ্রব্যের মূল্যের অনেক ইতর বিশেষ হইয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর হিসাব করিলে বেশ বুঝা যায়, মূল্যের অঙ্ক অপেক্ষা আমদানি বস্ত্রের পরিমাণের অঙ্ক অনেক অধিক।

বঙ্গবাসী ২২ভাগ, ৫০ সংখ্যা।

সংবাদ।

সিগারেট। গত পূর্ব্ববৎসর ভারতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সিগারেট আসিয়াছিল। গত বৎসর ২৩ লক্ষ টাকার সিগারেট আসিয়াছে। শুনা যায়, তামাকের সূক্ষ্ম শিরা বাহির করিয়া উহাতে অহিফেনের আরক দিয়া সিগারেট

প্রস্তুতি হয়। বর্ম্মা প্রভৃতি তামাকের চুরুট অপেক্ষা ইহা খাইতে ভাল, বেশ নরম ভাব! এই জন্যই ইহার প্রসার সর্ব্ব দেশে সমান হইয়াছে। সিগার অর্থাৎ চুরুট—পুরুষ চুরুট; সিগারেট অর্থাৎ স্ত্রী চুরুট বা ক্ষুদ্র চুরুট! এক বাক্সে সিগারেট ১০টী থাকে। কতকগুলি বাক্সে খাইবার কাগজের পাইপ, অর্থাৎ একটু মোটা কাগজ নলাকৃতি—উহার মুখে জিলাটীনের শুষ্ক আঁটা; কোন কোন বাক্সে ইহা নাই। যাহাতে পাইপ নাই, তাহার দর কম। ট্যাব নামক সিগারেট ৬টী বাক্স ক্রয় করিয়া উহা ব্যবহার হইয়া গেলে, উক্ত ৬টী খালি বাক্স উহাদের ফেরত দিলে একখানি সুন্দর ফটোর পুস্তক পাওয়া যায়। কলিকাতাস্থ অনেক স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা' এই লোভে অনেকেই সিগারেট খাইতেছে। সামান্য ১০টী সিগারেটের মূল্য দুই পয়সা হইতে খুব ভাল দ্রব্য পাঁচ পয়সা বাক্স বিক্রয় হয়। এই কারখানার সঙ্গে বাক্স প্রস্তুত করিবার জন্য লোক আছে, নল করা লোক আছে, প্রেস্ আছে, ছবি আছে, রাংতা ইত্যাদি আছে। ভাবিয়া দেখিবেন, এই এককাজে দেশের কত শ্রেণীর লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। এদেশে এক পয়সা ঘৃত, বা চিনি কিংবা ময়দা সামান্য ঠোঙ্গায় দেওয়া হয়, দেশ প্রতিপালন করিতে হইলে উহা টীনের কৌটায় দেওয়া উচিত এবং কৌটায় লেবেল দেওয়া উচিত, তাহা হইলেও প্রেস এবং টিনওয়ালা প্রভৃতি প্রতিপালন হয়।

কাগজে নল পাকাইয়া বাক্স বন্ধ থাকিলেই তাহাকে সিগারেট বলে, নচেৎ উহার নাম বার্ডসাই। ইহা টীনের কৌটায় বিক্রয় হয়, মূল্য প্রতি কৌটা ।৵০ বা ।৶০ আনা; এবং ঘুড়ির কাগজের খাতা থাকে, সেই খাতার পাতা ছিঁড়িয়া বার্ডসাই দিয়া চুরুট প্রস্তুত করিয়া খাইতে হয়। এই চুরুট পাকাইবার কলও আছে, তাহা পকেটে রাখা চলে। তদ্দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে চুরুট পাকাইয়া ব্যবহার করা যায়। এক বাক্স বার্ডসাইতে অনেক চুরুট অর্থাৎ সিগারেট হইতে পারে। রোগের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ভারত ইহা খাইবে, শীঘ্র ছাড়িবে না, বরং বাড়িবে; অতএব এই সময় হইতে ইহার কারখানা এদেশে হওয়া উচিত।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
৩য় খণ্ড, ১০ম সংখ্যা; অগ্রহায়ণ, ১৩১০ সাল।

দেশী ও বিলাতী সব্‌জীর চাষ।

(কাশীপুর প্র্যাকটিক্যাল ইনষ্টিটিউসন হইতে লিখিত।)

পঞ্চম প্রবন্ধ।

মূলক, মূলা। ইহার পক্ষে দোঁয়াস মৃত্তিকা প্রশস্ত। খিয়াড় মৃত্তিকাতে বড় হয় না, কিন্তু সুস্বাদু হয়। ইহার ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে খইল সার দেওয়া উচিত।

শ্রাবণ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত বীজ বপনের সময়। এক কাঠা জমিতে অর্দ্ধ পোয়া বীজের প্রয়োজন। ক্ষেত্র উত্তমরূপে চাষ করিয়া, ঢেলা ভাঙ্গিয়া মই দিয়া মৃত্তিকা চূর্ণবৎ করিয়া, পরে ২।৩ বৎসরের পুরাতন বীজ তাহাতে বপন করিয়া মই টানিবে। চারা বাহির হইয়া ৬ ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চ হইলে তাহা হইতে চারা উঠাইয়া পাতলা করিয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্র নিড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। মৃত্তিকায় রস না থাকিলে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। বপনের অগ্র পশ্চাৎ অনুসারে কার্ত্তিক মাস হইতেই খাবার যোগ্য মূলা উত্তোলন করা যাইতে পারে।

বার্ত্তাকু, বার্ত্তকী, বেগুণ। পলি সসার দোঁয়াস মৃত্তিকাই ইহার পক্ষে প্রশস্ত। কঠিন খিয়াড় মৃত্তিকায় ফল ক্ষুদ্র হয়।

আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপনের সময়। বারমেসে বেগুণের বীজ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বপন করিয়া চারা জন্মাইতে হয়।

প্রথমে একস্থানে চারা জন্মাইয়া পরে অন্য ক্ষেত্রে সেই চারা রোপণ করিতে হয়। কোন একস্থানের উত্তম মৃত্তিকা অতি অল্প পরিমাণে খনন করিয়া, ধূলিবৎ চূর্ণ করতঃ তাহাতে পুরাতন সরিষার খইল সার দিয়া, বেগুণের বীজ বপন করিবে। বীজ অন্ততঃ ২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া বপন করিলে শীঘ্র অঙ্কুর বাহির হয়। অঙ্কুরোদ্গম হইবার পূর্ব্বে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অল্প পরিমাণে জল সেচন আবশ্যক। রৌদ্র ও বৃষ্টির সময় কলার

পাতা বা দরমা আচ্ছাদন দিয়া রাখা উচিত। চারা ৪।৫ ইঞ্চি উচ্চ হইলে স্থানান্তরে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

যে জমিতে চারা রোপণ করিতে হইবে, সেই ক্ষেত্র উত্তমরূপে চাষ করিয়া, মৃত্তিকা ধূলিবৎ চূর্ণ করতঃ মই দিয়া সমতল করতঃ তাহাতে সরিষার খইল সার দিয়া, দেড় ফুট অন্তর এক একটী চারা রোপণ করিবে। যতদিন চারার শিকড় উত্তমরূপে মৃত্তিকা সংযুক্ত না হয়, ততদিন সন্ধ্যার সময় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল দিবে। মধ্যে মধ্যে গোময়ের শুষ্ক চূর্ণ ও ছাই গাছের গোড়ায় দেওয়া উচিত। মৃত্তিকা নীরস হইলে জল সেচন করা কর্ত্তব্য। শীতকালেই বার্ত্তাকু অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহা সুস্বাদু তরকারী।

লঙ্কা। ইহার পক্ষে পলি, চিক্কণ ও সমতল বালি-বিশিষ্ট মৃত্তিকাই উত্তম। কঠিন থিয়াড় ও অধিক বালির ভাগবিশিষ্ট মৃত্তিকাতে ইহা ভাল উৎপন্ন হয় না। ইহার জন্য উচ্চ ও সরস মৃত্তিকার প্রয়োজন।

আষাঢ় শ্রাবণ এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস ইহার চারা জন্মাইবার পক্ষে প্রশস্ত। বৈশাখ মাসে পাটনাই লঙ্কার বীজ বপন করা উচিত। উচ্চ সরস সসার অল্প স্থান খনন করিয়া, মৃত্তিকা পরিষ্কার করতঃ ধূলিবৎ চূর্ণ করতঃ তাহাতে বীজ বপন করিয়া চূর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা উহা চাপা দিবে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল দিতে হইবে। চারা বাহির হইয়া ৬ ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চ হইলে, তাহা তুলিয়া অন্য ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। লঙ্কার ক্ষেত্রে যথেষ্ট খইল সার দেওয়া উচিত। ইহার ক্ষেত্র-প্রস্তুতি-প্রণালী বার্ত্তাকুর ন্যায়। সর্ব্বদা লঙ্কার ক্ষেত্র পরিষ্কার রাখিবে ও মৃত্তিকা নীরস হইলে সময়ে সময়ে জল সেচন করিবে। ব্যঞ্জনাদি পাকে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ভুট্টা। দোঁয়াস সরস মৃত্তিকা ইহার পক্ষে প্রশস্ত। বৈশাখ মাসেই ইহার চাষের প্রধান সময়। প্রস্তুত করিতে পারিলে, প্রায় সকল সময়ই ইহার চাষ হইতে পারে। ক্ষেত্র উত্তমরূপে চাষ করিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া, তাহাতে খইল সার দিয়া, ইহার বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। চারা বাহির হইলে মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্র নিড়ান উচিত ও মৃত্তিকা সতেজ রাখিবার নিমিত্ত জল সেচন করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে ঘনরূপ চারা বাহির হইবে, তাহা হইতে কিছু কিছু উপড়াইয়া অন্যত্র বসাইয়া দিবে; ইহাতে গাছ সতেজ

হইবে। সোরা ও সরিষার খইলের সার ইহার জমি প্রস্তুতির সময়ও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহাতে উত্তম ফল লাভ করা যায়।

পালং শাক। সমার দোঁয়াস মৃত্তিকাই ইহার নিমিত্ত প্রশস্ত। ক্ষেত্রে খইল সার দিলে ইহা উত্তম জন্মে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহার বীজ বপনের সময়। এক দিবারাত্রি ইহার বীজ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে তুলিয়া ঘুঁটের ছাই মিশ্রিত করিয়া অন্য পাত্রে রাখিয়া, তাহা আচ্ছাদন দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে, এক দিবস পরে অঙ্কুরোদ্গম হইবার উপক্রম হইলে, পাতলা করিয়া বপন করিতে হয়।

ইহার ক্ষেত্র উত্তমরূপে চাষ করিয়া, ঢেলা ভাঙ্গিয়া সমতল করতঃ তাহাতে উক্ত বীজ বপন করিবে। মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্র নিড়াইয়া পরিষ্কার করিবে। নীরস হইলে জল দিবে। শীতের সময় ইহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চুকা পালং। পালং শাকের ও ইহার প্রস্তুত প্রণালী একই প্রকার। কেবল ইহার বীজ না ভিজাইয়াও বপন করা যায়।

[ক্রমশঃ।

পাট চাষ।

আমাদের দেশে যত প্রকার ফসল জন্মিয়া থাকে, তাহার মধ্যে পাট একটী। বৎসর বৎসর আমাদের দেশ হইতে বহুসংখ্যক মণ পাট রপ্তানি হইয়া অপর দেশে যায় এবং সেই সকল স্থান হইতে আমাদের অতি আবশ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস প্রস্তুত হইয়া কতক অংশ আমাদের দেশে আমদানি হইয়া থাকে। পাট হইতে থলে, কাগজ, সূতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয় এবং সেই সূতা হইতে কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে দিন দিন পাটের আবাদ যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, সেইরূপ যাহাতে অধিক উৎপন্ন হইয়া তাহার আঁশ সরু ও শক্ত হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক। পাটের আবাদ সম্বন্ধে আমাদিগের দেশের কৃষকদিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই এই সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য। তবে দুই একটী বিষয় আবশ্যক বোধে নিম্নে লিখিত হইল।

রোটেসন্ (ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন শস্যের আবাদ)—পর্য্যায়-ক্রমানুসারে অন্যান্য ফসলের ন্যায় পাটও কোন নির্দ্দিষ্ট ফসলের পর বপন করা উচিত। একই জমীতে বৎসর বৎসর পাট বপন করিলে, উৎপন্ন সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। সাধারণতঃ মটর, ছোলা ইত্যাদি ডাল জাতীয় ফসলের পর পাট ভালরূপ উৎপন্ন হয়।

আবাদী জমী (১)—পাট প্রায় সকল প্রকার জমীতেই জন্মে। সাধারণতঃ পলি মাটীতে পাট অতি সুন্দররূপ জন্মিয়া থাকে। নিম্ন জমীতে অর্থাৎ বর্ষায় যেখানে ৪।৫ চার পাঁচ ফিট্ পরিমাণ জল দাঁড়ায়, সেখানেও পাট ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। কেবল যে সকল জমীতে লৌহ (২) কিম্বা বালুকার (৩) ভাগ অধিক থাকে, সেই সকল জমীতে পাট ভালরূপ উৎপন্ন হয় না।

জলবায়ু (৪) :—পাট ভালরূপ উৎপন্ন করিতে হইলে, জমীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রস এবং অধিক রৌদ্রের আবশ্যক, কিন্তু অত্যধিক বৃষ্টি ভাল নয়।

জমী প্রস্তুত প্রকরণ ‡ :—নিম্ন জমীতে পাটের চাষ করিতে হইলে, শীতের শেষাংশেই জমীতে লাঙ্গল ও মই দিয়া এরূপভাবে পাট করিয়া রাখিতে হয়, যাহাতে চৈত্র মাসেই জমীতে বীজ বপন করা যাইতে পারে। বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত উচ্চ জমীতে বীজ বপন করা যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এক পসলা বৃষ্টি হইবার পর জমীতে লাঙ্গল দিলেও চলিতে পারে। আশু বীজ বপন করিলে জমীতে জল সেচন আবশ্যক। সর্ব্ব সমেত জমীতে পাঁচ বার লাঙ্গল দিলেই হইতে পারে। লাঙ্গল দিবার সময় যাহাতে মাটী উল্টাইয়া পড়ে এবং গভীররূপে কর্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ফসল আবাদ করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে জমী কর্ষণ করিলে, যে শুধু জমীতে উত্তাপ পায় ও পক্ষী এবং পিপীলিকার দ্বারা শস্যের অনিষ্টকারী কীট ও পোকা নষ্ট করিবার সুবিধা হয়, এরূপ নহে; বায়ু সংযোগে জমীর উর্ব্বরতাও বৃদ্ধি পায়। এঁটেল মাটীতে লাঙ্গল দিবার সময় জমীতে ঢেলা উঠিয়া থাকে এবং ঐ ঢেলাগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া, কৃষকেরা লাঙ্গল দেওয়ার পর জমীতে মই দিয়া থাকে। প্রথমতঃ দেশীয়

(১) আবাদী জমী Soil. (২) লৌহযুক্ত জমী Laterite soil.
(৩) বালুকাযুক্ত জমী Sandy soil. (৪) জলবায়ু Climate.
‡ জমী প্রস্তুত প্রকরণ Preparation of soil.

লাঙ্গল দ্বারা জমী কর্ষণ করিয়া, পরে শিবপুর লাঙ্গল ব্যবহার করা উচিত; ইহাতে মাটী গভীররূপে কর্ষিত হয় ও উল্টাইয়া পড়ে। প্রত্যেকবার কর্ষণ করিবার পর জমীতে মই দিলে, জমীর ঢেলাগুলি ভাঙ্গিয়া যায় ও জমী সমতল হইয়া থাকে। জমীতে অধিক আবর্জ্জনা থাকিলে, লাঙ্গল ও মই দিবার পর একবার বিঁদে † চালাইলে সকল আবর্জ্জনা বাহির হইয়া যায়; এইরূপ জমীকর্ষণ এবং মই ও বিঁদে ইত্যাদি ব্যবহার করিলে জমী সমতল হইয়া থাকে এবং আবর্জ্জনা সকল বাহির হইয়া বীজ বপনের উপযোগী হয়।

সার :—সাধারণতঃ যে সকল জমীতে বর্ষায় পলি পড়িয়া থাকে, সেই সকল জমীতে কোনরূপ সার দেওয়া আবশ্যক হয় না। তবে অন্য সকল জমীতে বিঘা প্রতি ৫০/ মণ করিয়া গোবর সার দিলেই রেড়ীর খৈল এবং সোরা সার দেওয়া অপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়।

বপন প্রণালী :—পূর্ব্বেই ইহা বলা হইয়াছে যে, চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করিবার উপযুক্ত সময়। যখন দেখা যাইবে যে, জমী উত্তমরূপ কর্ষিত হইয়া সমতল ও আবর্জ্জনা-শূন্য হইয়াছে, এবং আরও দেখিতে হইবে যে, যে দিন ঝড় কিংবা অধিক বাতাস বহিতেছে না,—সেইদিন বীজ বপন করিবার উপযুক্ত সময়। বিঘা প্রতি /১ সের হইতে /১॥০ সের পরিমাণ বীজ বপন করিতে হইবে এবং বীজ ক্ষুদ্র বলিয়া বপন করিবার সময় ইহার সহিত মাটী মিশ্রিত করিয়া দিলে, সকল জমীতে বীজ সমভাবে ছড়াইয়া পড়িবে। জমীতে বীজ বপন করিবার সময় একবার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও আর একবার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ছড়াইতে হইবে। ইহাতেও সকল জমীতে বীজ সমভাবে পড়িয়া থাকে।

বপন করিবার পর :—বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানেই দেখা যায় যে, পাটের জমীতে বীজ বপন করিবার পর যে পর্য্যন্ত ঘাস ইত্যাদি জঙ্গল পরিষ্কার করিবার আবশ্যক না হয়, সে পর্য্যন্ত উক্ত জমীতে অন্য কোন কাজই হয় না। কিন্তু তাহা না করিয়া বীজ বপন করিবার প্রায় ১৫ দিন পর, অর্থাৎ যখন জমী হইতে গাছগুলি রীতিমত বাহির হয়, সেই সময় রেক্ দ্বারা একবার মাটী আল্গা করিয়া দেওয়া উচিত। এঁটেল মাটীতে এই নিয়ম পালন করা বিশেষ আবশ্যক। জমীর ঘাস ও জঙ্গল ইত্যাদি কতবার পরিষ্কার করা উচিত, জমীর অবস্থানুসারে সে বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। তবে

† বিঁদে Harrow.

সাধারণতঃ দুইবার হইতে চারিবার পরিষ্কার করিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কোন স্থানে গাছগুলি অতিরিক্ত ঘন হইয়া উঠিলে, জমীর ঘাস পরিষ্কার করিবার সময় বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি গাছ ফেলিয়া দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু তাই বলিয়া অধিক পাতলা করা ভাল নয়। তাহাতে গাছ হইতে অধিক পরিমাণ শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া পড়ে এবং গাছগুলি অধিক লম্বা হয় না, কাজেই উৎপন্ন কম হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গাছগুলি ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি ব্যবধান হইলে ভাল হয়।

পাট কাটা:—ভাদ্র মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত পাট কাটা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যখন ইহার ফুল ও ফল হইতে আরম্ভ হয়, তখনই কাটা উচিত। জমী হইতে ১ ইঞ্চি কি ২ ইঞ্চি উপরে গাছগুলি কাটার পর বাণ্ডিল বাঁধিয়া ২ দিন জমীতে রাখিলে, যখন দেখা যাইবে যে, ইহার পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িবার উপযুক্ত হইয়াছে, তখন ঐ পাতাগুলি জমীতে ঝাড়িয়া রাখিয়া, অগ্রভাগের কতকাংশ (যেখান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডালপালা বাহির হইয়া থাকে) কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে গাছগুলি পচাইবার জন্য তথা হইতে বহিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী কোন স্থির জলে গাদা করিয়া রাখিতে হইবে। বাতাস কিংবা অন্য কোন প্রকারে গাদা স্থানচ্যুত না হয়, সেই জন্য উক্ত গাদার দুই দিকে ২টী বাঁশ পুঁতিয়া রাখা উচিত। গাদাটী সম্পূর্ণরূপে জলে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য গাদাটী পাতা দিয়া ঢাকিয়া, তাহার উপর মাটী চাপা দিতে হয়। গাছগুলি পচিয়া সহজে আঁশ বাহির হইবার উপযুক্ত হইতে সাধারণতঃ ১ হইতে ৩ সপ্তাহ সময় লাগিয়া থাকে। স্রোতের জলে পাট পচিতে বিলম্ব হয় এবং গাদা জলে ভালরূপ ডুবাইয়া না রাখিলেও বিলম্ব হয়। এক সপ্তাহ পর হইতেই বাণ্ডিল গুলি সদা সর্ব্বদা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, এবং যখন দেখা যাইবে যে, কাঠি হইতে আঁশ সহজে বাহির হইয়া আসিতেছে, তখন ইহা বাহির করিয়া লইতে হইবে এবং জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ৩।৪ দিন রৌদ্রে শুকাইবার পর বাণ্ডিল বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

চাষের খরচ ও উৎপন্ন (১):—জমীর উপযুক্ততা অনুসারে বিঘা প্রতি ৫/০ মণ পাট হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ১০৲ টাকা করিয়া খরচ করিলেও মূল্যের তারতম্য অনুসারে অন্ততঃ ১০৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

(১) চাসের খরচ ও উৎপন্ন—Cost of the cultivation and out turn.

গত বৎসর শিবপুর ফারমে কয়েক জাতীয় পাট নিয়মিত প্রণালীতে আবাদ করিয়া যেরূপ ফসল পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে,—

১। সিরাজগঞ্জ পাট :—(ক) গোময় সার দেওয়াতে যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় সার না দেওয়ায়, জমীর উৎপন্নের পরিমাণ অপেক্ষা সামান্য অধিক। অতএব সিরাজগঞ্জ পাটের আবাদে গোময় সার দেওয়ার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা ইহা সহজে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাঁহারাই উক্ত সার ব্যবহার করিতে পারেন। (খ) সিরাজগঞ্জ পাটে ফুল ধরিতে আরম্ভ করিলে কাটা উচিত। (গ) ফল ধরা অবস্থায় কাটিলে, আঁশ অপরিষ্কার ও মোটা হয়। (ঘ) সিরাজগঞ্জ পাট সম্বন্ধে এপ্রেল মাসের শেষ হইতে মে মাসের প্রথমেই বীজ বপন করা উচিত। (ঙ) সিরাজগঞ্জ পাটে ঘন করিয়া বীজ না বুনিয়া কিছু পাতলা করিলেও উৎপন্ন কম হয় না; বরঞ্চ বীজের সাশ্রয় হয়।

২। মেস্তাপাট :—(ক) মেস্তাপাট সিরাজগঞ্জ পাট অপেক্ষা কিছু বিলম্বে অর্থাৎ ২।১ পসলা বৃষ্টি হইলে বপন করা ভাল। (খ) নিম্ন জমী অপেক্ষা উচ্চ জমীতে মেস্তাপাট ভাল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে মেস্তাপাট অধিক চলিত নাই বলিয়া, বোধ হয় অনেকে ইহার নামও জানেন না। উত্তম প্রণালীতে ও যত্নের সহিত মেস্তাপাট আবাদ করিলে যে, আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সিরাজগঞ্জ পাট অপেক্ষা মেস্তাপাট মণকরা ১৲ অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। যদি মেস্তাপাট সুবন্দোবস্ত করিয়া অধিক পরিমাণে আবাদ করা যায়, তাহা হইলে সিরাজগঞ্জ পাট অপেক্ষা অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা।

শিবপুর কলেজ পত্রিকা।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বাক্‌চি।

কাজের কথা।

এমেশী লোক যাহারা যত বড় মহাজন হউন, আমাদের বিশ্বাস—তাঁহারা স্ব স্ব কাজের অবস্থা ঠিক বলিতে পারেন না। প্রকৃত মনের ভাব বলিতে পারা, জগতের ভিতর একটী মস্ত কাজ। আত্মীয়তা স্থলে ইহা দেখা যায় যে, যিনি যে কার্য্য করেন, তিনি অন্য আত্মীয়কেও সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চেষ্টিত হয়েন। এই নিয়মেই সঙ্গী বা দল বৃদ্ধি হয় মাত্র। মানুষের সুখ দুঃখ যেমন অনিবার্য্য, প্রত্যেক কাজের ভিতরেও সেইরূপ সুখ দুঃখ আছে, তাহাও অনিবার্য্য। মহাজনবন্ধু অনেক কাজের পথ দেখাইয়া দেয় বটে, যিনি যেরূপ মূলধন লইয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি মহাজনবন্ধু হইতে সেইরূপ কার্য্যের অনুসন্ধান পাইবেন বটে; কারণ মানুষ বসিয়া থাকিতে পারে না, ইচ্ছা হয়, বসিয়া থাকি, কিন্তু ঈশ্বর তাহা করিতে দেন না, এই জন্য লোকের কর্ম্ম না থাকিলে অথবা এক কর্ম্ম আছে, তাহার উপর বাসনা বাড়িলে, যে সময় মহাজনবন্ধু পড়িলে অনেক আশা ভরসা লোকে পাইবেন বটে; কিন্তু এই আশা ভরসা সাধারণের ভিতর কতদূর স্থায়ী হইবে, সে বিষয় মহাজনবন্ধুর কর্ত্তৃপক্ষেরা বিধিমতে লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। অমুকেরা যে কাজ করেন, তাহা দেখিয়া প্রায় সকলেই বলেন, উহা জুয়াচুরির কাজ। মহাজনবন্ধু তাহা শুনিয়া বলিতে চাহেন না যে, উহা জুয়াচুরির কাজ। এ সকল স্থলে মহাজনবন্ধু উক্ত কাজের পরীক্ষার জন্য সেই কাজ নিজে করিবে, তৎপরে তাহা যদি যথার্থ জুয়াচুরির কাজ হয়, তখন বলিবে। নচেৎ পরের কথায় মহাজনবন্ধু ঝাল খাইবে না। এখানে আর একটী কথা আমরা এই বলি যে, যখন যাঁহারা মহাজনবন্ধুতে যে কোন কাজের লাভ বা লোকসানের কথা পড়িবেন, তখন তাঁহারা সেই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন; কেন না, মহাজনবন্ধুর কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহাও লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন যে, সেই সেই প্রবন্ধ যথার্থ সেই সেই কার্য্যের লোকের দ্বারা লিখিত বা তাঁহাদেরই নিকট হইতে সংগৃহীত কি না। তত্রাচ আমরা বলি, যখন যিনি মহাজনবন্ধু দেখিয়া যে কোন নূতন কর্ম্ম করিতে বাসনা করিবেন, তাঁহার উচিত, সেই কার্য্যে অন্ততঃ দুই এক মাস কাল তিনি তাঁহাদের সঙ্গে

মিশিয়া, বিনা-বেতনে সেই কার্য্য শিক্ষা করিবেন অর্থাৎ সেই কার্য্যের অবস্থাটা মোটামুটি মস্তকে পুরিয়া লইবেন। নচেৎ বিনা-শিক্ষায় যে কোন্ কাজ করিতে গেলেই তাঁহাকে নিশ্চিত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। অনেকে বলিতে পারেন, সেই কাজের পরিচিত লোক পাইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহাতেও আমরা মত দিতে পারি না। অবশ্য সকলের কথা বলিতেছি না। অধিকাংশের অবস্থা এইরূপ যে, যেমন যুবতী দেখিলে সন্ন্যাসীরও কাম জাগে, যেমন চাউল দেখিলে ভেড়ার মুখ চুল্‌কায়, সেইরূপ কর্ম্মকর্ত্তার পয়সা দেখিলে সেই কাজে যাঁহাকেই নিযুক্ত করুন, অন্ততঃ কিছুদিন পরে তিনিই তাহাতে "কিছু" বসাইবার চেষ্টা করেন। নিজে যাহা বুঝি না, সেকাজ করা উচিত নহে।

মহাজনবন্ধু অনেকের নিকট শুনিল, চীফ্‌কমিস্যারিয়েটের কার্য্য ভাল নহে। কেন ভাল নহে? এই বলিয়া মহাজনবন্ধু তাহা করিতে গেল, গুড়ের অর্ডার পাইল, বায়নার ১২৫৲ টাকা জমা দিল। শেষে দেখিল, তাঁহারা বায়নার টাকা ফেরত দিলেন; তখন মহাজনবন্ধু উক্ত কার্য্যের অবস্থা (বিগত আশ্বিন মাসের সংখ্যা দেখুন) সাধারণকে জানাইল। ভগবানের কৃপায় মহাজনবন্ধু পাঠ করিয়া, ইহার অনেক গ্রাহক নূতন নূতন কাজে ব্রতী হইয়াছেন এবং হইতেছেন। কেহ কেহ ইহার দ্বারা ভাল চাকরীও পাইয়াছেন এবং পাইতেছেন। আলাপ হওয়া, পরিচয় পাওয়া, ইহাও জগতের মধ্যে কম লাভের বিষয় নহে। মহাজনবন্ধু এ কাজের মধ্যস্থ ব্যক্তি; ইহাও মহাজন-বন্ধুর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। সিয়ালদহ রেলের মাল-গুদামের অত্যাচার মহাজনদিগের পক্ষে গা' সওয়া হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার যে প্রতী-কারের পথ আছে, রেলের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষেরা যে চোর নহেন, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই যে ইহা হয়, তাহা এদেশী মহাজনেরা বিশ্বাস করিতেন না; ইহাদের ধারণাই ছিল, উঁহাদের সকলেই চোর!! মহাজনবন্ধু এজন্য অনেক পরিশ্রম করিয়া রেলের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে পত্রাদি লিখেন। শেষে মহাজনপক্ষ হইতে জনৈক লোক নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে ষ্টেশনে মাল পাঠাইবার এজেণ্ট করেন। ইনি এক্ষণে এই কার্য্যে রীতিমত আফিস করিয়াছেন। এখন আর রসিদ খরচ আট আনা, দশ আনা বা সময় বিশেষে ২৲ টাকা ৫৲ টাকা দিতে হয় না। এজেণ্টের নিকট মাল পাঠান হয়। তিনি বা তাঁহার লোক সন্ধ্যার সময় রসিদ প্রত্যেক মহাজনের ঘরে ঘরে দিয়া যায়। প্রত্যেক রসিদে

ইহাকে আট পয়সা পারিশ্রমিক দিতে হয়। হাবড়ার মাল-গুদামে এরূপ এজেণ্ট করিতে হয় নাই, এখানকার গুডস্ ট্রাফিক্ সুপারিণ্টেডেণ্ট সাহেব অতি ভদ্র লোক। ইহাকে মহাজনবন্ধু এই সকল অত্যাচার কাহিনী জানাইলে, ইনি মহাজনবন্ধু সম্পাদককে অনুমতি করেন যে, "আপনার কথিত অত্যাচারের বিষয় সত্য কি না, আপনি ঐ সকল মহাজন এবং তাঁহাদের লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তৎপরে তাহাই করা হইল। উক্ত সাহেব মহোদয় মাল-গুদামের সকলকে ডাকাইলেন। কে কে কত পয়সা লয়, তাহাদের দেখাইয়া দিতে বলিলেন। মহাজন-পক্ষের লোকেরা যাহারা রসিদ করিতে যায়, তাহারা উহাদিগকে দেখাইয়া দিল। শেষে সাহেব মহোদয় বলিলেন "এক পয়সা লাগিবে না ;' এজন্য যদি কেহ পয়সা না পাইলে তোমাদের পাকে প্রকারে কষ্ট দিবার সংকল্প করে, অদ্যকার রসিদ যদি কল্য দেয়, অথবা কোন রূপে অনর্থক তোমাদের যদি কষ্ট দেয়, তবে তৎক্ষণাৎ তোমরা আমার এই ঘরে আসিয়া সংবাদ দিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিব।" সেই অবধি এই সকল জানিত মহাজনের প্রতি আর কোনরূপ অত্যাচার হয় নাই। ইহা ভিন্ন মহাজনবন্ধু আরও একটী কার্য্য করিয়াছে।

বিগত ভাদ্র মাসের মহাজনবন্ধুতে "গঞ্জাম বহরমপুর" প্রবন্ধ লিখিত হয়। উহা পাঠ করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত পাটের বেলার শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ পাল মহাশয় তথায় কয়েকজন বাঙ্গালীকে পাঠাইয়া, ব্যবসার জন্য তথাকার "সন বাজারে" এক বৃহৎ আড়ত খুলিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর ভূতনাথ বাবুর কার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি করুন। ওহে ভাই অনুকরণ-প্রিয় বাঙ্গালি! তোমরা "নগেন সেন, দেবেন সেনের তৈলের অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের কাজের ক্ষতি করিব" এই সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যদি অনুকরণ করিতে চাও, যাও—ঐ ভূতনাথ বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াও, যাও ঐ মহাপুরুষের কাজের অনুকরণ করিতে যাও। বাঙ্গালি! তোমরা যদি রাজার জাতি হ'তে চাও, যাও ভাই দেশের বাহিরে যাও। আমাদের রাজ্যজয়ের ফল হউক। এইরূপ নিজেদের গৌরবের কথা আমাদের পক্ষে বলা খুবই গর্হিত, তাহা আমরা বেশ বুঝিতেছি ; কিন্তু গৌরবের জন্য গৌরব করি নাই, ইহাতে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি হয় নাই। মন ইহাতে সুখী নহে, মন এ সকল লুকাইতে চায় এবং লুকানও ছিল। কিন্তু এ দেশের সে সময় নহে ; মাত্রা দিয়া বিষ খাইলে যেমন

তাহা ঔষধের কার্য্য করে, আমাদের উদ্দেশ্য—আমাদের এই গৌরব শুনিয়া, তোমরা হিংসা কর, আমাদের নষ্ট করিবার চেষ্টা কর। ছড়াকাটান কাগজে এদেশের কিছু হইবে না; হিংসা করিয়া আমাদের এই কাজ আপনারা লউন, এই শ্রেণীর কাগজ আপনারা বাহির করুন, তাহা হইলে আমরাও বাঁচি, ইহা আপনাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া আমরা অন্য ব্যবসায় কাজে নিযুক্ত হই।

মহাজনবন্ধু আরও অনেক কাজ নিজে পরীক্ষা করিয়া করিবে, তাহাতে ২।৫ শত টাকা ক্ষতি হইলেও তবু তাহা মহাজনবন্ধু করিবে, করিয়া শেষে কার্য্যফল সাধারণকে জানাইবে। এরূপ না করিলে এ শ্রেণীর কাগজ চলিবে না। অদ্য মহাজনবন্ধুর পরীক্ষিত আর একটী কাজের কথা নিম্নে বলিতেছি। উহা "পাটের কাজ।"

পাটের কাজ।

এই কার্য্যে এদেশের বহু লোক প্রতিপালিত হইতেছেন। ইহার মধ্যে দুই শ্রেণীর মহাজন আছেন,—বেলার এবং আড়তদার। বেলার মহোদয়েরা পাটের গাঁইট বাঁধিয়া বিদেশীয় মহাজনদিগকে পাট বিক্রয় করেন। আড়তদারেরা ব্যাপারি এবং কৃষকদিগের নিকট হইতে পাট সংগ্রহ করিয়া, কলিকাতায় পাট আমদানী করেন। যে সকল দেশে পাট জন্মে, সেই সকল দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানীদিগকে অনেক আড়তদার পাট লইবেন বলিয়া ফাল্গুন, চৈত্র বা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত অনেক টাকা দাদন দিয়া থাকেন। গ্রামস্থ ঐ সকল দোকানদার দাদন পাইয়া, তাঁহারা আবার কৃষকদিগকে পাট-চাষের সুবিধার জন্য দাদন দিয়া থাকেন। সমুদয় দোকানদার বা সমুদয় কৃষক যে দাদন লয়, তাহা নহে। যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহারা দাদন লয় না। পরন্তু ইহাও দেখা যায় যে, অনেক স্থানে কলওয়ালা বেলার বা আড়তদারদিগের প্রেরিত লোকও পাটের মরসুমের সময় যথায় প্রচুর পাট পাওয়া যায়, তথায় গিয়া পাট ক্রয় করেন। ইহাকেই বেলার এবং আড়তদারেরা পাটের মোকাম বলে। বেলগেছে, উল্টাডিঙ্গী এবং শ্যামবাজারে পাটের অনেক আড়তদার আছেন।

এই সকল আড়তদার কিংবা ইহাদের প্রেরিত মোকামে গোমস্তারা পাটের বর্ণ, সাইজ, আঁস বা দানা, দাগী এবং পাটের জল দেখিয়া পাট ক্রয় করেন। যে পাট লম্বায় খুব দীর্ঘ, তাহাই ১ নং পাট; ইহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি পাটকে ২ নং পাট বলে; ৩ নং পাট ইহাপেক্ষাও ছোট। পাটের বর্ণ বিচার সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। তবে সাদা এবং লালবর্ণের পাট দেখিতে সুশ্রী। আঁস বা দানার পরীক্ষা এই যে, হস্তে এক গুছী পাট তুলিয়া ঝাড়িলে, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁস ঝরিয়া গিয়া হস্তে যাহা থাকে, উহার তার অর্থাৎ আঁস দেখা হয়। যে পাটের যে বর্ণই হউক, উহার আকৃতি এক বর্ণের থাকিলেই তাহা বেদাগ পাট। নচেৎ সাদা বা কাল পাটের উপর যে কোন স্থানে যদি খানিকটা লালবর্ণের হয়, তাহাকেই দাগী পাট বলে। বাস্তবিক ঐ স্থানের পাট টানিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, তাহা বিনা-জোরে ছিঁড়িয়া যাইতেছে, ইহাই দাগী বা পচা পাট। পাটে বৃষ্টি লাগিলে অথবা পাট গাছ যখন পচান হয়, এক গোছা পাট গাছকে জলে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য মাটীর চাপ ইহার উপর দেওয়া হয়; যে সকল দেশে এই নিয়মে পাট গাছকে পচান হয়, সেই সকল দেশে প্রায় ঐ সকল স্থান অন্য বর্ণ পাইয়া পচিয়া যায়। পচা পাট কলে ৪ নম্বরে বিক্রয় হয়। এই ৪ নম্বরকে কলওয়ালারা রিজেক্‌সন নম্বর বলেন। ইহার দরও খুব কম। কলে ১ নং, ২ নং এবং ৩ নং পাটের গাঁটের দর যদি ৩০৲ টাকা হয়, সে সময় হয়ত রিজেক্‌সন নম্বরের দর ১৮৲ টাকা। তৎপরে পাটের জলের কথা। এদেশী পাটের কাজ জুয়াচোরের কাজে পরিণত হইয়াছে, তাহার মূল কারণ পাটের জল। জলে পচাইয়া বৃক্ষের আঁস শুকাইলেই পাট নাম প্রাপ্ত হয়। অবশ্য এ সময় বিশেষ ভাবে যে শুকায়, তাহা নহে। কিন্তু আঁস এবং জলের গুরুত্ব স্বতন্ত্র; এইজন্য ভিজা পাট লইলে তাহার ওজন একরূপ অর্থাৎ যাহা হয়, উহার জল শুকাইয়া গেলে তাহার ওজন অন্যরূপ অর্থাৎ কমিয়া যায়। মণের হিসাবে পাটের দর, কাজেই মহাজন পাট লইবার সময় শুকাইয়া লয়। কিন্তু সকল দেশের কৃষকেরা রৌদ্রে ফেলিয়া শুকাইয়া দেয় না। এইজন্য মহাজন ওজন লইবার সময় গোলযোগ করে, কেননা ওজন কমিবে। পরন্তু শুষ্ক পাট পাইলে মহাজন উহাতে জল দিয়াও ভারি করিয়া দেয়। পৌষ ও মাঘ মাসের টানের সময়ই মোকামী গোমস্তারা ইহা করে। অন্য সময় অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক

মাসে যখন ইহা জন্মে, সে সময় ইহাতে জল ঢালা চলে না। তবে চাষারা শিশির খাওয়ায়; কেননা তাহা হইলেই ইঁহা দমে ভারি হইবে, সুতরাং ওজন বৃদ্ধি হইবে। কোন কোন পাট স্বভাবতঃ প্রথমাবস্থায় দমে ভারি হয়, পরে যত দিন গত হয়, ইহার ওজন বা দম কমিতে থাকে। যাহা হউক, এইজন্য কৃষকদিগের নিকট মোকামী মহাজন বা গোমস্তারা ওজন টানিয়া টুনিয়া (অর্থাৎ জুয়াচুরি করিয়া) লয়। আবার ইঁহারা কলিকাতার আড়তদারের নিকট সেই পাট আনিয়া দিলে, ইঁহারাও ওজন সম্বন্ধে খুবই জুয়াচুরি করেন। তৎপরে এই আড়তদারেরা যখন সেই পাট কলে অর্থাৎ বেলারদিগকে বিক্রয় করেন, তখন কলওয়ালারাও রীতিমতভাবে ইঁহাদের গলা কাটিয়া লয়েন অর্থাৎ চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়া থাকেন। তাই বলিতে ইচ্ছা করে, এদেশী যত পাকা চোরেরাই একাজ করেন এবং ইঁহারাই পাটের কাজে লাভ করিতে পারেন। নচেৎ ধর্ম্মের সহিত যাঁহাদের জীবনের কিছু সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা কখনই পাটের কাজে লাভ করিতে পারিবেন না এবং তাঁহারা কখনও এ কাজ করিতে যাইবেন না; গেলেই ঠকিবেন, ইহাতে আর কথাটী নাই। পাটের গায়ে অপেক্ষা পাটের গোড়ায় জল বেশী থাকে, ঐ স্থানে হাত দিলেই ভিজা বা শীতলতা বোধ হয়; ইহাতেই পাটে জল আছে কি না, বুঝা যায়। দেশী পাটের শিষের উপর কৃষকেরা একটা গাঁট বা গির দেয়; এই গিরর ভিতরেও জল থাকে।

বঙ্গে যে কোন দেশেই হউক, যে পাট জন্মে, কলওয়ালারা তাহাকে তিনটা সাট করিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জের সাটকেই ১ নং বলা হয়, সিরাজগঞ্জের সাটকে ২ নং সাট কহে। এই দুই সাটের পাটকে চলিত কথায় "বিলাতী" পাট বলে। তৎপরে B. C. Ry. ষ্টেশনগুলির পাট এবং তারকেশ্বর, চণ্ডীতলা প্রভৃতি স্থানের পাটগুলিকে দেশী সাট বা ৩ নং বলা হয়। দেশী পাটের গোড়া বাদ যায় না; সিরাজগঞ্জের পাট লম্বা এবং ইহার গোড়া অপরিষ্কার, এইজন্য ইহার গোড়া কিছু কাটিয়া গাঁট বাঁধা হয়। নারায়ণগঞ্জের পাট সিরাজগঞ্জের পাট অপেক্ষা যেমন দীর্ঘে বড়, তেমনই ইহারও গোড়া কাটিয়া অনেকটা বাদ দিতে হয়। এই গোড়া কাটা পাটেরও গাঁইট তৈয়ারী হয়; ইহারও গাঁট ১৪।১৫৲ টাকায় সময়ে সময়ে বিক্রয় হয়। এই কোয়ালিটীকে "মিক্সসিন" বলা হয়। আপনি ভারতের যে পাট লইয়া আসুন, কলওয়ালারা

সাইজ দেখিয়া উক্ত ত্রিবিধ সাটের অন্তর্গত করিয়া লয়। যাহারা সাট মিলাইয়া দেয়, তাহাদের "জাচনদার" বলে। ১ নং সাটের অপর নাম "লালমার্কা", ২ নং সাটকে M. কোয়ালিটি বলে। ১ নং, ২ নং এবং ৩ নং পাটের দরেরও ইতরবিশেষ এইরূপ। মনে করুন, ১ নং গাঁটের মূল্য যদি ৪০৲ টাকা হয়, ২ নং প্রত্যেক গাঁট হয়ত সে সময় ৩৪৲ এবং ৩ নং গাঁট হয়ত সে সময় ২৪৲ টাকা হইবে। একটা গাঁটের মোটামুটি ওজন ৫⁄০ মণ। ইহার সঙ্গে স্ক্রু খরচা, দড়ি, জাচনদার প্রভৃতির খরচা ধরিয়া, বাজার দর দেখিয়া, গাঁইট বিক্রয় করা হয়। কিন্তু পাটের এসোসিয়েসন হইতে নিম্নলিখিত বন্দোবস্তে আজকাল পাট বিক্রয় হয়। মনে করুন, ৩৪৲ টাকা হিসাবে আমরা ১০০ গাঁট পাট বিক্রয় করিলাম। এই ১০০ গাঁটের ভিতর ১০ গাঁট ১ নং, ৫০ গাঁট ২ নং এবং ৪০ গাঁট ৩ নং পাট উক্ত দরে দিব, ইহা ক্রেতা লইতে বাধ্য।

বেনাপোল।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের একটী ষ্টেশনের নাম বেনাপোল। এখানে যথেষ্ট দেশী পাট পাওয়া যায়, এই উপলক্ষেই এখানে আসা। কলিকাতা হইতে বেনাপোল পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ির ভাড়া ৮⁄৫ আনা। এই লাইনে (B. C. Ry.) অর্থাৎ খুলনা রেলের মধ্যম শ্রেণীতে না আসাই ভাল। প্রত্যেক ট্রেণে একখানি করিয়া মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী থাকে, তাহা পূর্ণ হইলে ইন্‌টার ক্লাসের ভাড়া দিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতে হয়; কারণ ইহাদের বন্দোবস্তের স্থিরতা নাই। কার্ত্তিক মাস হইতে ৩।৪ মাসের মধ্যে এই লাইনে ভ্রমণ করিতে আসিলে দেখিতে পাইবেন, প্রায় সমুদয় ষ্টেশন গুলি পাটপূর্ণ। বি, সি, রেলওয়েকে পেটো লাইন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; পাটের কাজের সময় এই লাইনে মালট্রেণ অনেক বৃদ্ধি হয়। বনগাঁ ষ্টেশনের পরেই বেনাপোল ষ্টেশন। বেনাপোলের মোকর্দ্দমাদি বনগ্রামেই হয়। বর্ত্তমান সময়ে বনগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বেনাপোলের ষ্টেশনের নিকটেই হাট। ষ্টেশনের সম্মুখের রাস্তাটি একটী বড় পথে আসিয়া মিশিয়াছে। ইহা ভিন্ন গ্রামে আর ভাল পথ নাই। হাটে কয়েক ঘর দোকানদার আছে। ৩।৪ খানি ইষ্টকের বাড়ী আছে, ইহাও দোকানদারদিগের দোকান মাত্র। থাকিবার জন্য বাড়ীভাড়া পাওয়া যায় না। বাঁশ এবং দর্মার ঘর, খড় কিংবা নারিকেল পাতার ছাউনী করা ঘর পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা ভদ্র লোকের বাসোপযোগী নহে। পাটের মরসুমের সময় কলিকাতা হইতে কয়েকঘর মহাজনদের গোমস্তারা পাট খরিদের জন্য এই সকল ছিটে বেড়ার ঘরেই বাস করেন; প্রত্যেক ঘরের মাসিক ভাড়া ১॥০, ২৲ মাত্র। এখানে হাট হয়, সোমবার এবং শুক্রবার। হাটে ৫।৭ শত (ইহার মধ্যে অধিকাংশ দরিদ্র মুসলমান) কৃষকেরা একত্র হয়। তখন দেখিতে যেন কলিকাতার নূতন বাজারের মত। হাটে তরী তরকারী, মৎস্য ইত্যাদি এবং কাপড়, মশারি পাওয়া যায়। এখানে, প্রত্যহ প্রায় মৎস্য পাওয়া যায় না, মধ্যে মধ্যে আইসে; কিন্তু হাটবারে মৎস্য ক্রয় করিয়া রাখাই প্রশস্ত। মশুর, খেঁসারি এবং বুটের দাইল পাওয়া যায়, মুগের দাইল দেখিলাম না। চাউল, ঘৃত পাওয়া যায়, দুগ্ধ দধি পাওয়া যায় না, সময়ে সময়ে পাওয়া যায়। ভদ্র লোকের আহার এবং থাকিবার কষ্ট যথেষ্ট। হাটের মাঝে এক পোষ্টাফিস আছে। পোষ্ট-মাষ্টার প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় কাজ করেন; বেতন শুনিলাম, মাসিক ৩৲ টাকা এবং একজন বাঙ্গালীর ছেলে পিয়ন আছেন, ইহার মাহিনা মাসিক ৮৲ টাকা। পোষ্ট-মাষ্টার ইংরাজী জানেন না, অন্য দোকানে চাকুরীও করেন। মণি-অর্ডারের রসিদ বাঙ্গালায় দেন। লেখা পড়ার সঙ্গে এ গ্রামের বেশী সম্পর্ক নাই। হাটের সন্নিকট একটী পাঠশালা আছে। চাষার দেশ। এই সকল চাষা অভিমানী। তুই বলিলে, ইহারা বলে, "কর্ত্তা অমন কথা বল্‌বেন না"। ইহাদের "আপনি" বলিলে মহা সন্তুষ্ট। গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটী নাই। যথা-ইচ্ছা মলমূত্র ত্যাগ করা যায়। হাটের সন্নিকটেই "হাঙ্গর" নামে একটী নদী আছে। বাঙ্গালা দেশের নদীমাত্রেই মৃতনদী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; শৈবাল ইত্যাদি বক্ষে ধরিয়া এদেশের নদী সমূহ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ইহা ম্যালেরিয়ার দেশ। শুনিলাম, এদেশ টাঁকির মুন্সি বাবুদের জমীদারী। বেনাপোল হইতে এক ক্রোশ দূরে সার্সা নামক স্থানে থানা আছে। ইহা ভয়ানক চোরের দেশ। এখানকার অধিবাসী ব্যবসায়ীরা চোরাইমাল থামাই দিয়া থাকেন, ইহাদের চোর পোষা

আছে। এখানে একজন পঞ্চায়েৎ আছেন। গভর্ণমেণ্টের টেক্স আদায় করা পঞ্চায়েতের কার্য্য। এই মহাপ্রভুর অসীম ক্ষমতা। বোধ হয়, এদেশের জমিদারের সে ক্ষমতা নাই। একটা লোক আমাদের /৫ সের পাট চুরি করিয়াছিল, চোরাই মালও ধরা পড়িয়াছিল; চোরকে পুলিশে লইয়া যাইতেছি, এমন সময় ইনি আসিয়া বলেন, আপনাদের অনেক কষ্ট হইবে, পাট চুরির বামাল প্রমাণ করা বড় শক্ত! বনগাঁয়ে কেবল যাতায়াত করিতে হইবে। এইরূপ বলাতে আমরা সাত পাঁচ ভাবিয়া ছাড়িয়া দিলাম। শেষে ইনি তাঁহার ১৫৲ টাকা জরিমানা করিয়া নিজে ১০৲ টাকা এবং আমাদের ৫৲ দিতে আসিলেন, "আমরা যাহাকে ছাড়িলাম, তাহার পুনরায় দণ্ড করা কেন?" বলিয়া, লইলাম না; শেষে তিনিই ১৫৲ টাকা লইলেন। ধর্ম্মজ্ঞানটা এদেশবাসীর কাহারও নাই। গ্রামের অবস্থা দেখিলে কোন ভাল বিচারকের শাসিত দেশ বলিয়া বোধ হয় না। পাটের জন্যই কিছুদিন হইল, ইহা ব্যবসায় স্থান হইয়াছে। তিসি ইত্যাদিও এ দেশে পাওয়া যায়। ভাল শাসিত হইলে, পরিণামে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। মস্‌জিদ, মন্দির এ দেশে একটাও নাই, ইংরাজও একটীও নাই। কাজেই এ দেশের অবস্থা শোচনীয়। বৃটিশ পদার্পণ ভিন্ন কোন দেশ সুসভ্য হয় না। এখানকার বর্ত্তমান ষ্টেশন-মাষ্টার অতিশয় ভদ্রলোক। ইঁহার বাড়ী খুলনা। এক রেল পাট চালান দিলে, এক ওয়াগানে ১৬০/ মণের ভাড়া লাগে। কিন্তু পাটের বস্তা যাহারা তুলে, সেই সকল মুটেদের দুই চারি আনা জলপানি দিলে, ১৫০ বস্তা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। নচেৎ ১৪০ হইতে ১৪৫।১৪৬ বস্তা সহজে এক ওয়াগানে ধরে। এই প্রত্যেক ওয়াগানে ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয়ের ঘুস বলুন বা বক্‌সিস্ বলুন, সময়ে সময়ে ৭।৮৲ টাকা দিতে হয়। আমাদের ওয়াগান পিছু ৩৲ টাকা ফুরান হয়; গ্রামবাসী মহাজনদিগের সঙ্গে শুনিলাম, ওয়াগান পিছু ১।০ দেড় টাকা ফুরান। ইহা দিতেই হইবে, নচেৎ রসিদ পাওয়া দুষ্কর। একদিনে যে রসিদ পাইবে, ঘুস না দিলে ৭ দিনেও তাহা পাইবেন না। হাবড়া ষ্টেশনের মত এখানে অগ্রে "ফরওয়ার্ডিং" লেখা হয় না, মাল লইয়া গিয়া ষ্টেশনের যথা-ইচ্ছা রাখ। কেবল ষ্টেশনের রোয়াকটুকুতে সেড আছে, নচেৎ সমুদয় স্থানে আকাশ ছাওনী। বৃষ্টি আসিলে মাল ভিজে। মহাজনের মহাক্ষতি হয়। প্রত্যহ এই ষ্টেশন হইতে আজ কাল ১৫।২০ ওয়াগান মাল চালান হইতেছে, ইহার পর আরও বেশী হইবে। ভাড়া মণ প্রতি বেলগেছে /১৫ পয়সা, এক

ওয়াগান ২৫॥/০ আনা এবং চিৎপুর ঘাট এক ওয়াগান ২৬॥৵০ আনা। এখানে একটী রেলওয়ে গুদাম হওয়া উচিত। ষ্টেশন হইতে মালও চুরি যায়। সে দোষ ষ্টেশনের লোকের নহে, ইহাই আমার বিশ্বাস। পাটের বস্তার খাঁজ নাই, অতএব ঠিক গোনা যায় না; তৎপরে এখানকার দোকানদারেরা ষ্টেশনে গিয়া বোচ্‌কা উল্টা পাল্‌টা করে। মাষ্টার মহাশয়ের কেবল নগদ টাকার উপর ঝোঁক। এখানে ইতিপূর্ব্বে ৩ সন পাটের কাজ ভাল হইয়াছিল, অর্থাৎ লাভ হইয়াছিল। দাদন দেওয়া না থাকিলেও এখানে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ এই দুই মাস নগদ মূল্যে যথেষ্ট পাট ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। পাটের প্রথমাবস্থায় এখানে পাট শুকাইয়া, তৎপরে ক্রয় করা হয় এবং ইহাতে মহাজনেরা জল দেয় না। পৌষ মাঘ মাসের পাটে ইহারা ইচ্ছা করিয়া পাট বিছাইয়া ঝারি দিয়া জল ঢালে। ইহাতে মণকরা /৬ সের জল দেয় বলিল; তাহার মধ্যে পথে যাইতে যাইতে ⁄২ সের শুকায়, /৪ সের জল দেওয়া পাট বিক্রয় করিয়া আইসে। এ মোকামে পাটের দর খুব নিম্ন ২৸০ হইতে খুব উচ্চ ৫॥০ পর্য্যন্ত হইয়াছে, শুনা গেল। গ্রামে ধোপা নাপিত আছে। ভাষা অসভ্য বাঙ্গালা। ইংরাজী জানা লোক ২।৫ জন আছে। সেলাবৎপুর, বাউনে, ভুলট, মেরাণে, দুবপাড়া, সেতাই, বাঁশঘাটা প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে চাষারা আসিয়া এই স্থানে পাট বিক্রয় করিয়া যায়। ঐ সকল স্থান হইতে পাট ক্রয় করিয়া আনিব বলিয়া কতকগুলি দালাল আছে। ইহারা নূতন মহাজন দেখিলে, মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া "টাকা দিন্, পাট আনিয়া দিব" বলিয়া টাকা লইয়া যায়, তৎপরে কিছু পাট আনিয়া দিয়া, বাকী টাকা সহজে দেয় না। তখন বলে, খাটাইয়া আদায় করুন। ইহাদের দালালী মণকরা এক আনা। নূতন মহাজন এখানে যিনিই আসুন, দালালের হস্তে যেন কেহই যাইবেন না। এখানকার ওজন ৮২॥৵ আনা, অর্থাৎ ৮০ সিক্কা মণে পাট ওজন হইলে যত মণ হইবে, তত সের বাদ যাইবে। পাট পাঠাইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত খরচা মণকরা ।/০, ।৵০ আনা ধরা হয়। পাট বিছাইয়া শুকাইয়া গাঁট বাঁধিয়া দিবে, এইরূপ প্রত্যেক গাঁটে মুটে লাগে দেড় পয়সা। ষ্টেশনে পাট পাঠাইবার গরুর গাড়ীর ভাড়া মণকরা ৫ পয়সা। বেনাপোল পাটের ব্যবসায় স্থান বটে; কিন্তু চোরের জায়গা, খুব সাবধান!

শ্রীঃ—

বিলাতী রজনচুসের কারখানা।

কলিকাতায় এতদিন দেশী রজনচুস বা লোজেনজুস্ প্রস্তুত হইত। ইহা মোণ্ডা, মিঠাইয়ের দেশের খাদ্য নহে। মিষ্ট, অম্ল, তিক্ত, লবণ, ক্ষার এবং জল আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য দ্রব্য। শীত-প্রধান দেশে মোণ্ডা, মিঠাই নাই, এজন্য তথাকার শিশুদিগকে রজনচুস দিয়া মিষ্ট খাওয়াইতে হয়। অতএব ইহাকে বিলাতী মিঠাই বলাও চলে। আমাদের ধারণা ছিল, এদেশে ইহা চলিবে না, কিন্তু সাহেবী দেশের দ্রব্য, এদেশবাসীরা "আ-দেখ্‌লের" মত গ্রহণ করে; কাজেই লোজেনজুস-আমদানী এদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ইহা দেখিয়া সর্ব্ব প্রথম আমরা, তৎপরে আরও কয়েক ঘর মুর্গী-হাটার দোকানদার, ইহাকে দেশী নিয়মে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি। এদেশে যেমন ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের মাছ কিংবা সন্দেশের যেমন কাষ্ঠের ছাপা আছে, আমরাও ঐ কাষ্ঠের ছাপা একটা বৃহৎ কাষ্ঠের রুলের উপর খোদাই করিয়া গাঢ়ভাবে চিনির রস করিয়া উহাতে ঢালিয়া দিয়া রজনচুস করিতাম, রং দিতাম—নানাবিধ ম্যাজেন্টারে। ক্রমে এ কাজের উন্নতি হইতে লাগিল। বিলাতী অপেক্ষা দর কম দেওয়াতে ইহার কাটতিও বৃদ্ধি হইল। এখনও এ শ্রেণীর দোকান মুর্গীহাটায় কয়েকখানি আছে। সবই ঠিক হইল বটে, কিন্তু বিলাতীর মত ইহা শুষ্ক হইল না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমরা ইহার নানাবিধ যন্ত্রাদি সম্প্রতি বিলাত হইতে আনাইয়াছি। শীঘ্রই দমদমাতে ইহার কার্য্যারম্ভ করিব।

আমাদের কলে উপস্থিত চাকৃতি এবং বিবিধ প্রকারের গুলি প্রস্তুত হইবে; মৎস্য ইত্যাদি হইবে না, কেন না, উহার মেশিন ইত্যাদি আসে নাই। বিলাতী রজনচুসের কল ষ্টিম মেশিনে। জল এবং অগ্নিতে ইহা চলিবে। ইহাতে কেবল রজনচুসের বিবিধ প্রকারের গুলি হইবে। বিলাতী রজনচুসের চাক্তি হস্তে করিতে হয়। চাক্তি করিবার নিয়ম এই যে, খুব ভাল পরিষ্কৃত শুভ্র ১ নং দানাদার চিনিকে রোলার মেশিনে ফেলিয়া গুঁড়া করিতে হয়। বাজারে এরূপ গুঁড়া শুভ্র চিনিকে পিটি চিনি বলে। তাহাও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে রজনচুসের রং ভাল হয় না। মিছিরি দ্বারা ইহা হইতে পারে বটে, কিন্তু মিছিরির দর বেশী। অতএব ১ নং

দানাদার চিনিই একাজে প্রশস্ত। চিনি গুঁড়া করিয়া, উহাতে গম একাশিয়া অর্থাৎ গঁদের আটা এবং আর একটি দ্রব্য মিশাইলেই বিলাতী রজনচুস অতিশয় শুষ্ক হয়। ইহার নাম এখন বলিব না। কারণ, এইটুকুই এ ব্যবসায়ে বুদ্ধি-বল। যদি কেহ একাজ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নিশ্চিত তাঁহাকে একথা বলিব! যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য-ত্রয় একত্র করিয়া পরিমিত জলে মাখিয়া, ময়দা মাখার মত কিংবা সন্দেশের নেচীর মত করিয়া, তাহা দ্বারা হস্তে চাক্তি করিতে হয়।

বিলাতী রজনচুসের গুলি করিবার নিয়ম এই যে, এ কাজে পূর্ব্বোক্ত গুঁড়া চিনিতে দ্বিবিধ রস করিতে হয়। এক প্রকার রস খুব গাঢ় পাকের, অন্য প্রকার রস কেবল অগ্নিতে অল্প গরম করা মাত্র। ইহার যন্ত্র এই, একটী হাঁড়ি ষ্টিমের বলে অনবরত ঘুরিতেছে। আপনারা বোধ হয় জানেন যে, বিলাতী রজনচুসের গুলির ভিতর কোন গুলিতে একটী সরিষা, কোন গুলিতে একটী মৌরী ইত্যাদি থাকে। যে সকল দ্রব্যগুলি ভিতরে থাকে, সেই দ্রব্যের আকার অনুসারেই গুলির আকার হয়। গুলির বাদাম করিতে হইলে, উহার ভিতর বাদাম দিতে হয়। এক্ষণে কি করিয়া বাদাম, সরিষা, মৌরী ইত্যাদি গুলির ভিতর পুরিতে হয়, তাহা বলিতেছি।

/১ সের সরিষা কিংবা /১ সের মৌরী কতগুলি হয়, তাহা আমরা বলিতে পারি। ধরুন, /১ সের সরিষা লইয়া কোন পাত্রে পূর্ব্বোক্ত গাঢ়রস মুড়কি মাখার মত উহাতে মাখাইলাম। প্রত্যেকে ঐ চিনির রস মাখিয়া পোস্ত দানার মত হইল। ইহা শুকাইলে আবার ঐ চিনির রস মুড়কি মাখার মত করিয়া উহাতে মাখাইলাম, এইবার ঐ গুলি আরও কিছু বড় হইল। এইরূপ তিন চারি বার গাঢ়রস মাখাইয়া, ইহাকে সেই হাঁড়িতে তুলিয়া দিলাম। হাঁড়ি ক্রমাগত ঘুরিতেছে এবং উহা ষ্টিমের তাপে খুবই উত্তপ্ত। এই হাঁড়িতে চিনি মাখান সরিষার গুলি তুলিয়া দিয়া, দ্বিতীয় প্রকারের চিনির রস ক্রমশঃ ঢালিতে হয়, ইহাতে গুলি সকল ঘুরিয়া ঘুরিয়া রস মাখিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া শুকাইয়া ক্রমে উহা বড় হইয়া উঠে। যখন মুড়ির মত হয়, ইহার ভিতর মৌরী থাকে, কেন না মৌরীর লম্বা আকৃতির জন্য ইহাও মুড়ির মত লম্বা দানা হয়। তখন ইহার কতক নামাইয়া রাখিতে হয়, এবং এই আকারের কতক হাঁড়িতে রাখিয়া দ্বিতীয় প্রকার চিনির রসের সঙ্গে যে কোন রং গুলিয়া দিয়া উক্ত রস-জল গুলিতে

[illegible] রং করা হয়, মুড়কির আকৃতি হইলে তাহা নামাইয়া লইতে হয়। ইহাই বাজারে রজনুচুসের মুড়ি মুড়কি বলিয়া এদেশে বিক্রয় হয়। ক্রমে হাঁড়ির মধ্যে গুলি সকলে এই রস দিলাম, উহা শুকাইয়াছে বলিয়া বোধ হইলেই, (হাঁড়ির শব্দেই শুকাইয়াছে কি না জানা যায়; শুষ্ক দ্রব্যের শব্দ খট্‌খটে হয়।) পুনরায় রস দিতে হয়। এই প্রত্যেক বার রস দিবার সময় শেষ বার রসে রং এবং এসেন্স, যথা—গোলাবী চাক্তি করিতে হইলে গোলাপ জল কিংবা পিপারমেণ্ট অয়েল রসে মিশাইয়া দিতে হয়। রজনচুসে যে রং দেওয়া হয়, তাহা ফল হইতে প্রস্তুত হয়। এই ফলের রং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, ইহাকে "ফ্রুটকলার" বলে। লাল, নীল, হরিদ্রা প্রভৃতি সমুদয় বর্ণের ফলের রং ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। যে গুলিকে সাদা রাখিতে হইবে, তাহা হাঁড়ি হইতে নামাইয়া রাখিতে হইবে, এবং যাহাদের যে রং দিবে, হাড়ীতে তখন সেই সকল থাকিবে। এই এক হাঁড়ির গুণেই বিবিধ বর্ণের বিবিধ গুলি প্রস্তুত হইবে। এই রসের সঙ্গেও গম একাশিয়া এবং সেই শুকাইবার মসলাটী দিতে হয়। একাজের সঙ্গেও শিশি, ক্যাপশুল, লেবেল প্রভৃতি দ্রব্যগুলির সংশ্রব আছে, ইহাতেও খরচা হইবে। যতই খরচা থাকুক, মণ করা ৮৷১০্ টাকা লাভ হইবে, এই অনুমানে আমরা কার্য্যক্ষেত্রে নামিতেছি। কল চলিলে, তাহার পর ইহার খরচা ইত্যাদি এবং লাভালাভের কথা সকলকে বলিবার ইচ্ছা রহিল। অর্থাভাবে মেশিন গুলির ছবি দিতে পারিলাম না।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসাক।

তেলেগু ভাষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

[illegible] প্রত্যেক জেলার বাঙ্গালাভাষায় কিছু না কিছু প্রভেদ আছে। ঢাকার [illegible]ভাষায় অশ্বকে "গুরা" বলে এবং এদেশের লোক অশ্বকে "ঘোড়া" [illegible] বিগত ১৯শে কার্ত্তিকের সুবিখ্যাত সঞ্জীবনী-পত্র "মহাজনবন্ধু"র

তেলেগু ভাষা পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, "উহাতে প্রায় ৩০টী ভুল আছে; তাহার অনেকগুলি মুদ্রাকরের হওয়া সম্ভব।" বাস্তবিক উহা ভুল নহে; আমরা যে তেলেগু ভাষা লিখিতেছি, ইহা গঞ্জাম বহরমপুরের তেলেগু ভাষা। তেলেগু দেশ ক্ষুদ্র নহে। ইহার ভিতরেরও প্রত্যেক জেলার কথা কিছু স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব। যেমন "অশ্ব—গোড়ম" হয় এবং উহা গুররমও হয়। "চড়াই পাখী—পারোয়া" হয় এবং পারুয়াও হয়। এরূপ শব্দের ইতর-বিশেষ জেলার বিভেদে জগতের সর্ব্বত্রই হয়।

ঝড়—তুফান।
বাটী—ইলু, মেড়া।
ঘর—গদী।
জানালা—তালপুলু।
দরজা—তালপুলু।
তক্তা—কারা, বালা।
প্রস্রাবের স্থান—নিউরুড়ি, উচা।
পাইখানা—চাম্মাটেকি।
ঠাকুর ঘর—দেমুড়ি-গুড়ি।
মন্দির—ঐ।
মঠ—মঠম্।
পথ—দারী।
ঘাট—চেরুউ।
পাথর—ট্রাই।
আংটি—উঙ্গারম।
ঘড়ি—ঘড়িয়ারম।
বোতাম—গুণ্ডিলু।
সাটি কাপড়—চেরেলু।
পুরুষের বালা—খড়িয়ালু।
স্ত্রীলোকের বালা—গজলু, চেৎ গজলু।
শ্রীকৃড়ি—তাম্মিট্লু।
চুরী—মুরুগুলু।
নাক চাবি—মুক্কপড়কা।

নলক—আড্ডাবাসা।
মল—কাল কড়িয়াল।
ঘাগ্রা—লাঙ্গা, পারকিনি।
হার—কাসলপেরু।
আসুন—ইক্রেড়িকিরেণ্ডি।
কেমন আছেন?—মিরুইয়াবারু।
আপনার নাম কি?—মিপেরুএমি।
আপনি কি জাতি?—মিরে জাতি।
তোমার বাড়ী কোন্ দেশ?—মি দেশম্ একাড়া।
তোমাদের বাড়ী কোথায়?—মি এল্যে কাড়া।
আমি ভাল আছি—নেনু বাগাই য়ুন্নানু।
আমার অসুখ হইতেছে—নাকু থায়লাগা ইয়ুন নাদী।
আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম—নেনু দুঃখম্গা উন্নানু।
আমরা সুখী হইলাম—মেনু সুখম্গ উন্নানু।
এই দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়?—ই বস্তুয়া একেড়া সম্পাদীকিনাউ।
ইহা দিউন—নাকুই।

এই দ্রব্য আপনার আছে?—নি দ্যাগিরা ই বস্তুয়া ক্যালিগি উন্নদা।

দাম কত?—এ্যান্ত ভ্যালা।

ইহা পছন্দ হইল না—ই বস্তুয়া নাকু ইষ্টম্ লেদু।

তুমি হাসিতেছ কেন?—ইন্দুকু নবু তা'উ।

তুমি কাঁদিতেছ কেন?— ইন্দুকু দুখা পড়াতাও।

আমরা কল্য এখানে আসিয়াছি—নিউ ইকাড় কি নিন্নাটে রোজনা আচ্ছি নাউ।

সে ভাল লোক—তাতান্নু মাঞ্চি ওয়াড়ু।

ঘাটের পথ কোন্ দিকে?—সেন্নেউ একাড়া উন্নাদি।

আমি যাইতে পারি?—নেন্নু ভ্যাল্লা অচ্ছুনা।

কে তুমি?—নিবু এ্যাভারু।

তুমি—নিউ।

আমি—নেয়নু।

যে—য়্যাবারু।

সে—ওয়াড়ু।

যাহা—আদি।

তাহা—আদি।

ইহা—ইদি।

উহা—আদি।

করা—চেইটা।

বলা—মাটালা বড়ুটা।

চলা—ভেল্লুট।

পাওয়া—সম্পাদিন্ চুটা।

দেওয়া—ইচুটা।

খাওয়া—তেরুটা।

বলিতেছি—চপ্পুচুন্না।

বলিয়াছিল—চপ্পুট্টা।

করিতেছি—চেইউ চুনা।

করিয়াছিল—চেসিনান্নু।

খাইতেছি—তিটুন্নান্নু, ভোজনম্, চেস্‌নান্নু।

খাইয়াছিল—তিন্নান্নু।

আমি চলিতেছি—নেন ভেড়ু চুন্না।

চলিয়াছিল—নাড়িচিনান্নু।

পাইয়াছি—সম্পাদিন ছি নান্নু।

পাইয়াছিল—সম্পাদিন ছি নাড়ু।

না—নেদু, কাদু।

হাঁ—আউনু।

বাজার কোন্ দিকে?— বাজার একাড়া উন্নাদি।

এই বস্ত্রের দাম কত?—ইবট্টা খরিদু এন্তা।

ইহা কত দামে লইলে?—ই দি এন্তা সম্মুকু তিচ্চি নাউ।

সত্য—নিজং, সত্যম্, এদার্থম্।

মিথ্যা—আবাধ্যমু, অসত্যমু।

গল্প—কাধা, চরিত্রমু।

বুদ্ধি—জ্ঞায়মু।

বিবেচনা—ইওলোচা, আলোচনা।

তাহার বুদ্ধি ভাল—আতানি বুদ্ধি মনচিদি।

তিনি—ওয়াড়ু (পুরুষ) আমে (স্ত্রী) আদি (ক্লীব)।

আমি—নন্নু, নাকু।

তাঁহারা—ওয়ারু, আভী।

আমরা—মেমু, মানামু।

তাঁহাদের—ওয়ারি।

আমাদের—মান্নাওয়াক্কা।

তিনি বড় রাগী—নেন্‌ণ্ডা কোপম্‌ গ্যালা ওয়াড়ু।

তাঁহারা ভাল লোক নহেন,—আমনিষ্যু ডু মাঞ্চিওয়াড়ু কারু।

মিষ্ট—মধুরম্‌, তিপু।

টক—পুল্লা।

তিক্ত—চেদু।

ঝাল—ক্ষারম্‌।

খাইয়া দেখ্‌ ইহা বেশ মিষ্ট—তিনি চুচী তিগা উন্নদি চেপ্পু।

উহা খাইও না, বড় টক—আদি থেনা-উন্দু পুল্লাগায় নাদী।

রাঁধা—অন্‌ডুটা।

ভাত রাঁধ—আন মণ্ডু।

ব্যঞ্জন কি করিবে?—এয়েমে কোরা ওণ্ডে দি চেপু।

আন—তিস্‌কানী বা।

আনিও না—আদি তিস কনীরা উন্দু।

আনিয়াছ—তিস কনী ওচ্চি নাভা।

ইহা ভাল হয় নাই—ইডি বাগাচেস্‌-নাউ কাউ।

ইহা বেশ হইয়াছে—ইদি বাগায় উন্নদি।

চিটী পড়িয়াছ?—উত্তরম্‌ তেচ্চায়া।

সংবাদ কি?—এমি সঙ্গতি।

বাজার ইহার পর তেজ হইবে কি?—ইচ্ছুগা ওনাদা।

বাজার চড়া—বজার ভেল্লা ইচ্ছুগাও নাদী।

এখন ইহা বিক্রয় করিব না—ই বাস্তয়া ইপোড়া মন্দু।

কিছুদিন পরে বিক্রয় করিব—ইনকা কোণি রোজলু কোন্নী আম্মু।

আপনি বিক্রয় করিবেন?—আমু-চুণাওয়া।

কি দর?—এন্তা খরিদ।

বোধ হয়, বাজার ভাল হইবে—বাজার ধরা মন্দা মুগান্নাদি।

এ বৎসর মাল ভাল জন্মে নাই—ই সমাচারম্‌ পাম্‌টা বাউ নেদু।

এ বৎসর মাল ভাল জন্মিয়াছে—ই সমাচারম্‌ পানটা বাউনেদি।

তিনি এ বৎসর ক্ষতি দিয়াছেন—ই সমাচার নষ্টম্‌ হয়েচ্ছনারি।

[ক্রমশঃ।

———

সংবাদ।

টেলিগ্রাফের নূতন হার।—সকৌন্সিল কার্জ্জন বাহাদুর ভারতীয় টেলিগ্রামের যে নূতন হার প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা আগামী জানুয়ারি মাস হইতে প্রচলিত হইবে। নূতন নিয়মে "আর্জেণ্ট" ও "অর্ডিনারী" শ্রেণীতে ১৬টি কথা দেওয়া যাইবে, কিন্তু ঠিকানার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য লাগিবে। পূর্ব্ব নিয়মে ঠিকানার দাম লাগিত না। ভারতের দুই চারিটী বৃহৎ নগরী ব্যতীত কোথাও বাটীর নম্বর নাই, তজ্জন্য ভারতীয় ঠিকানা প্রায়ই বহু কথায় লিখিত হয়। হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, অতি নিম্নপক্ষে ১২টি কথার কমে সচরাচর প্রায় ঠিকানা লেখা হয় না। কাজেই অধিকাংশ স্থলে নিয়মিত ১৬ কথার মধ্যে ১২ কথা ঠিকানার জন্য রাখিয়া, বাকী ৪ কথায় খবর লিখিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে [illegible] বিনা মূল্যে, ও তাহা ব্যতীত ৮ কথা লেখা চলিত। পরে "ডেফার্ড" শ্রেণীর টেলিগ্রাম পূর্ব্ব নিয়মে ঠিকানা বিনা মূল্যে ও আট আনায় ৮ কথা চলিত। এখন ঠিকানার ৬টি কথা বিনা মূল্যে ও সর্ব্ব নিম্নহার চারি আনায় চারি কথা। আমাদের হিসাব মত ঠিকানার ৬টি কথা বিনা মূল্যে হইলে বাকী আরও ছয়টি থাকে। কাজেই প্রেরয়িতাকে বাকী ছয়টির জন্যই সর্ব্ব নিম্নহার চারি আনা ত দিতেই হইবে, অধিকন্তু দুই আনা বেশী লাগিবে।

তিব্বতের ভাষা।—মহাজনবন্ধুর পক্ষ হইতে তিব্বতের ভাষা সংগ্রহের জন্য শ্রীযুক্ত কৈলাসানন্দ গিরি নামক জনৈক সুবিখ্যাত সন্ন্যাসীকে পাঠান হয়। ইনি অনেক সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া তিব্বতে গিয়াছিলেন, এক্ষণে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কার্য্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। তাহারা বিদেশীয়-দিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করে। কার্জ্জন বাহাদুর এই দেশ জয় করিবার সংকল্পে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দিয়াছেন, শুনিয়া আমরা এজন্য বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। ভগবান তিব্বতকে শীঘ্র আমাদের রাজার হস্তে অর্পণ করুন। দেশ বৃদ্ধি হইলে আমরা ব্যবসায়ী জাতি—আমাদেরই সুবিধা। তথায় গিয়া দোকান করিব।

মহাজনবন্ধু, মাসিক-পত্র।

৩য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা; পৌষ, ১৩১০।

দেশী ও বিলাতী সব্‌জীর চাষ।

(কাশীপুর প্র্যাকটিক্যাল ইনষ্টিটিউসন হইতে লিখিত।)

ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

কপি।—ফুল, ওল ও বাঁধা প্রভৃতি সকল প্রকার কপির বীজের বপন কাল, চারা প্রস্তুত ও চারা বসাইবার প্রণালী প্রায় একই রূপ।

যে জমিতে কপির বীজ বপন বা চারা তৈয়ার করা যায়, তাহাকে বীজের ভাটী বা হপার বলে। ঐ জমীর কোনদিকে গাছের আওতা না হয় অর্থাৎ রৌদ্র সমস্ত দিন থাকে, এরূপ দেখিয়া উহা নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

শ্রাবণ মাসের প্রথমে ঐ জমি কোপাইয়া, তাহাতে ২৷৷০ হাত পরিমিত এক একটী চৌকা বাঁধিবে। উহার মাটী উত্তমরূপে পাইট করিয়া /১ এক কাঠা পরিমিত জমীতে একমণ সরিষার তৈল দিয়া ঐ ভাটীর মাটীর নীচে ফেলিবে, সেই খইল যেন বৃষ্টির জলে ধুইয়া মাটী হইতে বাহির হইয়া না যায়। কম জমি হইলে আন্দাজ মত কম খইল দিবে। ঐ ভাটীর খইল বৃষ্টির জলে পচিয়া গেলে, ভাদ্রমাসের প্রথমে তাহাতে হোগলা চাপা দিয়া অথবা যে প্রকারে হয়, উক্ত ভাটীর মাটী শুক করিয়া গুঁড়া করিবে; এবং পাতা-সার—অভাবে পচা গোবর সার দিয়া, মাটী উত্তমরূপে তৈয়ারি করিবে। ১২ ইঞ্চি, ১৪ ইঞ্চি খোলা পাত্রে (গামলায় বা টবে) মাটী দুই ভাগ এবং পাতা-সার—অভাবে পচা-গোবর সার এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া, ৵০ আনা আন্দাজ কপির বীজ তাহার উপরে ছড়াইয়া দিবে। বীজগুলি উপরে পড়িয়া থাকিবে ও এক রাত্রি শিশির খাওয়াইয়া, পরে সার-মিশ্রিত গুঁড়া মাটী দ্বারা অল্প পরিমাণে বীজগুলি ঢাকা দিবে। মাটী শুক হইলে অল্প পরিমাণে জল দিবে এবং পট (গামলা) গুলি দিনের বেলায় ঠাণ্ডায় রাখিয়া, রাত্রিকালে

শিশিরে বাহির করিয়া দিবে। কিন্তু বৃষ্টির জল না পায়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইরূপ করিলে তিন দিনের মধ্যে চারা বাহির হইবে। ক্রমে তাহার দ্বিতীয় পাতা বাহির হইলে উপরোক্ত যে ভাটী তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহাতে ঐ পটের চারা এক একটী তিন অঙ্গুলি অন্তর সারি-বন্দি করিয়া বসাইয়া জল দিবে। বেশী রৌদ্র না লাগে, এজন্য হোগলা ঢাকা দিয়া ক্রমে অল্প অল্প রৌদ্র সহ্য করাইবে ও রাত্রিতে শিশির খাওয়াইবে ; কিন্তু বৃষ্টির জল না পায়, তদ্বিষয়ে সাবধান থাকিবে। ক্রমে চারার শিকড় ধরিয়া গেলে, মাটী শুষিয়া অল্প শুষ্ক হইলে ক্রমে ক্রমে জল ও রৌদ্র সহ্য করাইবে।

যেখানে খোলা পটের অভাব, সেখানে উক্ত কপির ভাটিতেই বীজ ফেলিতে হইবে। প্রায় ।৴০ আনা ওজনের বীজ চারি বর্গহাত পরিমিত ভূমিতে ছড়াইয়া, তাহাতে হোগলা চাপা দিয়া, রাত্রিতে শিশির খাওয়াইয়া, পরদিন সার-মিশ্রিত মাটী তাহার উপর ছড়াইয়া ঢাকা দিবে। কেবল মাত্র বীজগুলি ঢাকা পড়িবে, বেশী মাটী ঢাকা না দেওয়া হয়। মাটী শুষ্ক থাকিলে অল্প পরিমাণে জল দিবে, ইহাতে তিন দিবসের মধ্যেই বীজ হইতে চারা বাহির হইবে। খোলা পট অর্থাৎ পাত্র হইতে চারা উঠাইয়া যেরূপ হাপর দিতে হয়, জমীতে বীজ ফেলিলে তাহা করিতে হয় না। চারা যদি ঘন হইয়া জন্মে, তাহা হইলে ঘন চারাগুলি মাত্র উঠাইয়া লইয়া অপর এক ভাটীর মধ্যে হাপর দিবে, ও উপরোক্ত নিয়মে কার্য্য করিবে।

ভাটীর হাপরের কপির চারা লইয়া যে জমীতে বসান যায়, তাহাকে কপি-চাষের ভূমি বলে। ঐ ভূমি ভাদ্র মাসের প্রথমে কোপাইয়া, মাটি তৈয়ার করিবে এবং এক হাত দেড় হাত অন্তর এক একটি গর্ত্ত অর্থাৎ মাদা কাটিয়া, তাহার মধ্যে ৴।০ একপোয়া আন্দাজ সরিষার খইল দিয়া মাটি ঢাকা দিবে। ক্রমে বর্ষার জলে তাহা পচিয়া গেলে, আশ্বিন মাসের শেষে উক্ত খোল পোতা মাদাগুলি কোপাইয়া মাটি শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিবে। মাটি তৈয়ার হইলেই হাপরে চারা উঠাইয়া, এক একটি করিয়া প্রত্যেক মাদায় বসাইয়া জল দিবে এবং সকালে বৈকালে ৩।৪ দিন জল দিলেই মাটীতে চারাগুলির শিকড় ধরিয়া যাইবে। তাহার পর ১। ২। ৩ দিন অন্তর জল দিবে ; তাহার পর জল বন্ধ করিয়া মাটি শুষ্ক করিয়া নিড়ানি দ্বারা খুসিয়া দিয়া, পরে সেচন বা বেশী পরিমাণে জল দিয়া ক্ষেত্রের সমস্ত মাটী ভিজাইয়া দিবে।

মারকিন ও বিলাতী বীটের চাষের নিয়ম।—যে জমীতে বিট তৈয়ার করিতে হইবে, সে ভূমি ভাদ্র মাসে কোপাইয়া মাটী তৈয়ার করিবে। ২॥০ হস্ত পরিমিত প্রশস্ত ভূমির পটী বান্ধিয়া এক একটী চৌকা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে সরিষার খইল কাঠা প্রতি কুড়ি সের হিসাবে ছড়াইয়া মাটীর সহিত মিশাইয়া দিবে। ক্রমে বৃষ্টির জলে উক্ত চৌকার খইল পচিয়া যাইবে। কার্ত্তিক মাসের প্রথমে ঐ চৌকার মাটী শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিবে। বীজ ফেলিবার পূর্ব্বে কিছু পচা-গোবর সার বা ভেড়ীর সার মাটির সহিত মিশ্রিত করিবে এবং মাটী শুষ্ক হইলে অল্প অল্প জল দিয়া যাহাতে জমিতে রস থাকে, এমত করিবে। বীটের বীজ কাঠা প্রতি ২॥০ বা ৩ ভরি হিসাবে লাগে। ঐ বীজ বপন করিবার পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার সময় নেকড়ায় বান্ধিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিবস প্রাতে জল হইতে বীজ-বান্ধা নেকড়া তুলিয়া বিচালির ভিতর রাখিবে, ইহাতে বিচালির গরমে বীজ অঙ্কুরিত হইবে। একদিন পরে তাহা চৌকায় ছড়াইয়া মাটীর ভিতর বীজগুলি যাহাতে পড়ে, এমত ভাবে খুসিয়া দিবে। জমিতে রস থাকিলে জল দিবে না; নচেৎ অল্প পরিমাণে জল দিবে। ইহাতে ৮।১০ দিনের মধ্যে চারা বাহির হইবে। বীটের এক একটী বীজ হইতে ১ নাগাদ ৩টী পর্য্যন্ত চারা বাহির হয়। ক্রমে চারা বর্দ্ধিত হইলে, একটী চারা রাখিয়া বাকী ২টী এবং ঘন চারা হইলে তাহাও অপর স্থানে ৮ ইঞ্চি অন্তর বসাইবে ও বেশী করিয়া জল দিবে। ক্রমে যখন বীট বড় হইবে, তখন তাহার গোড়ার মূল শিকড় রাখিয়া, পার্শ্বের শিকড় গুলি ছাঁটিয়া দিবে; গোড়ার পাতাও ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। সাবধানে নিড়ান করিবে। বীটের গায়ে নিড়ানির আঘাত লাগিলে, তাহা দাগী হইয়া খারাপ হইবে। মধ্যে মধ্যে মাটী শুষ্ক করিবে, পরে সেচ বা বেশী পরিমাণে জল দিবে।

নলিচার কারখানা।

এই শ্রেণীর কারখানা মেদিনীপুরে ২টা, কামারপুকুরে ৭।৮টা এবং কয়াপাট বদনগঞ্জে আন্দাজ ১০।১২টা আছে। ইহার কারিকর মেদিনীপুরে ১০০ শত,

কামারপুকুরে ৩।৪ শত, এবং বদনগঞ্জ কয়াপাটে অন্ততঃ ৫।৬ শত আছে। এই কারখানাও আমার ছিল ; ইহাতে কোন বর্ষে ক্ষতি হয় নাই। সাংসারিক মোকর্দ্দমাদি অন্যান্য দুর্ঘটনা বশতঃ অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইহা হারাইয়াছি। ৫।৭ শত টাকা মূলধন হইলেই ইহা চলে।

আস্‌না এবং আবলুস কাষ্ঠের নানাপ্রকার খোদাই কার্য্য আমাদের কারখানায় হয়। ঘাটশীলা (B. N. Ry.) ষ্টেশন হইতে আস্‌না কাষ্ঠ পণদরে খরিদ করিয়া আনিতাম। এখানে আবলুস কাষ্ঠ পাওয়া যায় না, উহা ময়ূরভঞ্জ হইতে আনিতে হইত। ময়ূরভঞ্জে আস্‌না এবং আবলুস দুইই পাওয়া যায়, কিন্তু পাথেয় ঘাটশীলা হইতে বেশী লাগে। এই শ্রেণীর কারখানায় দাঁড়ি, বেলুন, হুঁকার নলিচা, রুল, সাজনল এবং হুঁকার ছোট নল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

কারিকরদিগের ফুরান বন্দোবস্ত। চারি শ্রেণীর কারিকর দ্বারা একার্য্য হয়। ১ম, এক শ্রেণীর লোকেরা কেবল কাষ্ঠ চিরিয়া কাটিমত করিয়া, উহার দুইমুখ অল্প সরু এবং মধ্যে পেটের কাছে অল্প সরু করিয়া দেয়। কাষ্ঠ ছোলার কাজ প্রত্যহ ১ জনে ৪ তাড়া করিতে পারে। তৎপরে ২য় শ্রেণীর কারিকর—ইহারা ঐ প্রকার ছোলা কাষ্ঠ লইয়া কুঁদা যন্ত্রে পরাইয়া দিয়া কুঁদিতে থাকে। ৩য় ব্যক্তি কুঁদা যন্ত্রের দড়ী টানিয়া উহা ঘুরাইতে থাকে। আকৃতি ঠিক হইলে ৪র্থ ব্যক্তির হস্তে নলিচা এবং দাঁড়ির ছিদ্রের জন্য যায়। ইহার নিকট বিবিধ প্রকার সূক্ষ্ম লৌহ শলাকা আছে। নলিচার মাপে শলাকা লইয়া, ভ্রমর নামক যন্ত্র ঘূরাইয়া নলিচাতে ছিদ্র করা হয়। এদেশী লোক বোধ হয় ভ্রমরকে "তুরপুণ" বলে। দুই জন লোক (একজন কুঁদে, একজন ঘুরায়) প্রত্যহ ২ তাড়া কুঁদে। ভ্রমর দিয়া ১ জনে প্রত্যহ ৫।৬ তাড়া বিঁধে। এই শ্রেণীর কারিকর প্রত্যেক কারখানায় ৭০।৮০ জন কাজ করে।

কাষ্ঠ ছোলা, কুঁদা এবং ছিদ্রকরা এই ৪ জন কারিকরে এক সেট হয়। ইহাদের ৪ জনের প্রাত্যহিক ফুরান, মায় তামাক, পাট এবং তৈল (কুঁদার সময় কিছু পাট এবং তৈল দিয়া কাষ্ঠকে মসৃণ করা হয়) সাত আনা মাত্র। অতএব ২০ শেট বা ৮০ জন লোক খাটিলে ৮৷০ আনা লাগে৭

তাড়া হয়, ৪ গণ্ডা হইতে ১১ গণ্ডা পর্য্যন্ত ; যথা ১৬টা, ২০টা, ২৪টা, ২৮টা, এইরূপ চুয়াল্লিশটা পর্য্যন্ত নলিচায় ১ তাড়া হয়। ৩ গণ্ডা অর্থাৎ

৬টা নলিচায় যে তাড়া হয়, তাহা ভাল নলিচা এবং বড়; কিন্তু ইহা বড় বিক্রীত হয় না। তাড়ায় যত বেশী হইবে, ততই নলিচা ছোট সাইজ এবং মন্দ হয়। ৪৪ টায় যে তাড়া হয়, তাহা শ্রাদ্ধ-বাটীর খেলো হুঁকায় লাগে। আপনি যে সাইজের তাড়া লউন, উহার দর এক প্রকার; অর্থাৎ ৬টায় এক তাড়া লইলে যে দর দিতে হইবে, ৪৪টায় ১ তাড়া লইলেও সেই একই দর, তাড়া "এক টাকা তিন আনায়" বিক্রীত হয়। দাঁড়ি, বেলুন, ফুল এবং সাজনলের তাড়ার দর স্বতন্ত্র। কারীকরদিগকে দাদন অর্থাৎ অগ্রিম টাকা দিয়া তাহাদের বাধ্য রাখিতে হয়, নচেৎ মিস্ত্রি পাওয়া দুষ্কর হয়। এক তাড়ায় আমাদের কাষ্ঠ লাগে বড় জোর ॥০, ॥১০ আনা; বাস্তবিক এত লাগেও না, তবে আমরা আট আনা ধরি কেন? তাহার কারণ নলিচা করিতে গেলে, সমুদয় যে ঠিক হয়, তাহা নয়; হয়ত, কুঁদের মুখে ছিদ্র করিবার সময় উহা নষ্ট হইল। এরূপ অনেক নষ্ট হয়। নষ্ট হইলে সে কাষ্ঠ দ্বারা অন্য প্রকার গঠন করিবার উপায় থাকিলে, আমরা সহজে ছাড়ি না; হয়ত তাহাতে ছোট দাঁড়ি কিংবা ৫ পয়সা করিয়া যে হুঁকার নল বিক্রয় হয় (ছোট ছোট যাহা পকেটে থাকে), নিদান তাহাও করি।

আমার কারখানার প্রাত্যহিক আয় এই ছিল যে, প্রত্যেক সেটে ৪ জনে ২ তাড়া করিয়া মাল তুলিলে ২০ সেট বা ৮০ জন লোকে ৪০ তাড়া হয়; উহার মূল্য ১৶০ হিসাবে ৪৭॥০, ইহাই আয়। ব্যয় এই যে, উহাদের ফুরান ২০ সেটে ।৶০ হিসাবে ৮৸০ আনা এবং কাষ্ঠ ৪০ তাড়ায় ॥১০ হিসাবে ২১।০ আনা, মোট খরচা ৩০৲ টাকা। লাভ প্রত্যহ ১৭॥০ আনা।* অতিশয় গ্রীষ্মের সময়

---

* লাভ দেখাইবার সময় কেহই ছোট হন না, কেবল চিনির কারখানা-ওলারাই লোকসানের কান্না কাঁদিয়াছেন। লাভের কাজের হিসাব দেওয়া যেমন সহজ, অভ্যাসে করা বোধ হয়, তত সহজ নহে। তামাক খাওয়া নেশার ভিতর! সেই তামাকের জন্য হুঁকার নলিচার লাভ প্রত্যহ ১৭॥০ টাকা হইতে পারে, ইহা বাবুলাল বাবু, বাবুদের জানাইয়া অবশ্য সুখী করিলেন। এখন ইংরাজী স্কুল কালেজের কল্যাণে তামাক খাওয়াটা যেন কমিতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তজ্জন্য ব্যবসায় মারা পড়িবে না। এ শ্রেণীর কারখানা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর আবগারীর সঙ্গে ধরেন কি? জানি না। তবে মানুষের নেশার উপরেও ব্যবসায় চলে! সমুদয় ব্যবসায়ই নেশার কাজ। কলিকাতার বেশ্যারা যাত্রার দল করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে!

মঃ বঃ সঃ।

এ কার্য্য মন্দা চলে; কেননা, তখন কাষ্ঠকে কুঁদিতে গেলে প্রায়ই ফাটে। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত মন্দ চলে না। প্রত্যহ কারখানা চলিলে ইহা বড়ই সুখের কাজ। কিন্তু তাহা চলে না, বেশী মাল মজুত হইলে কারখানা বন্ধ রাখিতে হয়। কলিকাতার গ্রাহকেরা আমাদের নিকট গিয়া মাল ক্রয় করেন, আমাদের আর কোন খরচা নাই। তাঁহারা যদি পত্র দ্বারা মাল পাঠাইতে বলেন, তবে পত্রের কথামত মাল পাঠাইতে যাহা খরচ হইবে, তাহা গ্রাহকের।

শ্রীবাবুলাল দত্ত।
কয়াপাট, বদনগঞ্জ।

সহজ শিল্প।

নিম্নলিখিত কয়েকটী সহজ শিল্প পরীক্ষা করা আবশ্যক।

গামছায় রং। হীরাকসের জলে গামছা ভিজাইয়া, পরে চুণের জলে ডুবাইলে চাঁপাফুলের মত রং হয়।

দুগ্ধরক্ষা। দুইসের দুগ্ধে চারি আনা ওজন "সোডা বাইকার্ব্ব" মিশাইয়া রাখিলে দুগ্ধ অনেক দিন অবিকৃত থাকে।

বস্ত্র শুভ্রীকরণ। এক পোয়া সাবানের সহিত আধ ছটাক সোহাগা মিশাইয়া, তদ্দ্বারা বস্ত্রাদি ধৌত করিলে সুচারুরূপে পরিষ্কৃত হয়।

চিতি উঠাইবার উপায়। বস্ত্রের যে স্থানে চিতি লাগে, সেই স্থানে সাবান মাখাইয়া বা তাহার উপরে চা-খড়ি চূর্ণ করিয়া ঘসিয়া রৌদ্রে দিবে এবং মধ্যে মধ্যে জলসিক্ত করিবে; পরে ধুইয়া ফেলিবে।

বিবর্ণ কাল বস্ত্রে রং। কাল রঙ্গের পরিচ্ছদাদি বিবর্ণ হইয়া গেলে, তাহা ধোয়াইয়া বিবর্ণ স্থান গুলিতে সামান্য জলে একটু পাইরোগ্যালিক এসিড গুলিয়া, পালকের দ্বারা প্রয়োজন মত দুই তিনবার লাগাইবে।

কলঙ্ক দূর। পিত্তল ও কাঁসার দ্রব্যে কলঙ্ক ধরিলে যদি তেঁতুল আমরুলের দ্বারা কোনমতে পরিষ্কার না হয়, তবে লাইকার আমোনিয়া লাগাইলে নিশ্চয়ই তাহা দূর হইবে।

রুজ। হীরাকস এক আউন্স এবং অক্জ্যালিক এসিড এক আউন্স পৃথক পৃথক পাত্রে গুলিয়া একত্র করিয়া যে অধঃক্ষেপ হইবে, তাহা ব্লটিং দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। পরে পদার্থটী একখানি হাতায় করিয়া উত্তপ্ত করিলে পুড়িয়া লাল-বর্ণ হইবে। এতদ্বারা অলঙ্কারাদি পালিস হয়।

শিরীষ কাগজ। কয়েক টুকরা শিরীষ ঘণ্টা-কতক ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিবে। নরম হইলে এ গুলি একটী পাত্রে রাখিয়া, সেই পাত্রটী একটি জলপূর্ণ পাত্রে বসাইয়া অগ্নিতাপে দ্রব করিবে। মধুর মত ঘন হইলে এক-খানি মোটা কাগজে সমভাবে লাগাইয়া; তাহার উপর ইচ্ছামত সূক্ষ্ম কাচের গুঁড়া ছড়াইয়া দিবে। শুকাইলে উত্তম শিরীষ কাগজ প্রস্তুত হইবে।

টীনের বার্ণিশ। খানিকটা রজন কতকটা গর্জ্জন তৈলের সহিত সাবধানে গলাইয়া লও। পরে উহাতে ইচ্ছামত সিন্দুর, জাঙ্গাল বা হরিতালচূর্ণ মিশাইয়া রঙ কর। বার্ণিশ ঘন হইলে তার্পিন দিয়া পাতলা করিয়া টীনের উপর মাখাও।

আবলুস বর্ণ। বকম কাষ্ঠ ও মাজুফল চূর্ণ প্রত্যেক দুই তোলা আধসের জলে উত্তমরূপে ফুটাইবে। ঐ জল কাষ্ঠে ২।৩ বার মাখাইয়া দিয়া, পরে এক তোলা হীরাকস এক ছটাক জলে গুলিয়া, ঐ কাষ্ঠের উপর মাখাইয়া দিবে। শেষে বার্ণিস করিবে।

কাপড়ের পাকা নীলরং। নীলবড়ি ২ তোলা, হীরাকস ৪ তোলা, কলিচুণ ৬ তোলা এবং জল ২॥০ সের উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, ক্ষণপরে উহাতে কাপড়খানি ভিজাইয়া রাখিবে, কিয়ৎকাল পরে তুলিয়া নিঙড়াইয়া শুকাইয়া লইবে। কিন্তু খানিকটা পরে ফটকিরির গরম জলে পূর্ব্বে ঘণ্টাখানেক ভিজা-ইয়া রাখিয়া, পরে শুকাইয়া লইয়া শেষে যে কোন রঙ করিলে ভাল রঙ হয়।

রেশমী বস্ত্রের দাগ। সাটীন বা গরদের বস্ত্রাদিতে কালি বা তৈলাদির দাগ লাগিলে, সমপরিমাণে "স্পিরিট অব আমোনিয়া" এবং "হাউস হর্ণ" একত্র মিশাইয়া ঐ স্থানে লাগাইবে। পরে উত্তমরূপে যথারীতি ধৌত করিবে। 'স্পিরিট অব টারপেণ্টাইন" দিয়া ঘসিলেও কাপড়ের দাগ দূর হইবে।

হস্তাক্ষর তুলিবার উপায়। লেখার ভুলভ্রান্তি তুলিয়া ফেলিতে হইলে, সমপরিমাণ নিশাদল, সোডা ও সোহাগাচূর্ণ একত্র জলে গুলিয়া লেখায় মাখাইলে হস্তাক্ষর উঠিয়া যায় এবং সে স্থলে পুনরায় লেখা চলে।

অঙ্গুরীয়ক বা মাদুলি ধারণে দেহ নিরাময় হয়। পাশ্চাত্যদেশেও এই রূপ ধারণা আছে। জনৈক জর্ম্মান ডাক্তার বলেন, "য়্যালুমিনিয়ম" ধাতুর

দুইটী অঙ্গুরীয়ক সংযুক্ত করিয়া ধারণ করিলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া বাতরোগ আরোগ্য হয়।

তিসির তৈলে আল্‌কাতরা মিশাইয়া সাবধানে গরম করিয়া, তাহাতে পাতগালার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জলমিশ্রিত নাইট্রিক এসিড যোগ করিলে, রবারের ন্যায় পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহা রবারের কার্য্যে প্রয়োগ হইতেছে।

জমীর উর্ব্বরতা। শস্যক্ষেত্রে তুঁতের জল ছড়াইয়া দিলে তৃণাদি জন্মিতে পারে না; অথচ শস্যের পক্ষে কোন হানি হয় না। ফরাসী কৃষি-সমিতি পরীক্ষায় ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তুঁতের লবণের অংশ তৃণকুলকে নাশ করে।

পাটের চাষ।

চাষের দোষেই পাট তেমন উৎকৃষ্ট হয় না, এই মনের ধারণায় কলিকাতার "জুট বেলার্স এসোসিয়েসন"এর চেষ্টায় এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রামের কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে ইহার পরীক্ষা দেখা হয়। কিন্তু চট্টগ্রাম পাটের পক্ষে অনুকূল স্থান নয়, সুতরাং চট্টগ্রাম ক্ষেত্রে ভাল পাট হয় নাই। ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি ও ফরিদপুরে এ বৎসরে পরীক্ষা দ্বারা দেখা হইতেছে।

বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে পনর প্রকারের পাট জন্মিয়াছিল। গাছে চারা বাহির হইলে জানা গেল, বীজ সকল এক প্রকারের নয়, নানা জাতীয় পাটের বীজ একসঙ্গে মিশান ছিল। বীজ-সংগ্রাহক কৃষকগণের অসাবধানতা দোষে বীজ সংগ্রহের সময়েই এই দোষ ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক প্রকারের পাটের আঁইস পরীক্ষার জন্য পরীক্ষকের নিকট পাঠান হইয়াছিল। যাঁহারা ভালরূপ পাট চিনেন, এরূপ কয়েক জন লোককে "জুট বেলার্স এসোসিয়েসন" হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বর্দ্ধমানের কৃষিক্ষেত্রে বার বৎসরের পরীক্ষা ও নির্ব্বাচন দ্বারা যে পাট উৎপন্ন হইতেছে, সেই পাটকেই তাঁহারা ভাল বলিয়াছেন। এ বৎসরে পরীক্ষার জন্য ৪০ রকমের বীজ সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই বীজ সংগ্রহের জন্য কৃষিবিভাগের ট্রাভেলিং

ইনস্পেক্টর মহাশয় পাটের ক্ষেতসমূহ পরিদর্শন করিয়া যে সকল পাট গাছ তাঁহার বেশ সুপুষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছে, কেবল সেই সকল হইতেই বীজ সংগ্রহের ব্যবস্থা তিনি কৃষকদিগের সহিত করিয়া আসিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ঐ বীজ বপন করা হইয়াছে।

কি ভাবে পাটের চাষ করিলে ফসলের সুবিধা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে "জুট বেলার্স এসোসিয়েসন" হইতে সুস্পষ্ট কথা কিছু জানিতে পারা যায় নাই। ঘন বপনে পাট যে পরিমাণে জন্মে, পাতলা বপনে তদপেক্ষা যে বেশী পরিমাণে জন্মিতে পারে, ইহা জানা গিয়াছে। এতদুভয় স্থলে পাটের উৎপত্তির অনুপাত ৩৫ : ৪৪।

কোন কোন জেলায় পাট তেমন ভাল জন্মে না কেন, এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় উক্ত চাষের বিশেষ অভিজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে মতের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। জুট বেলার্স এসোসিয়েসন বলেন যে, পাটের আঁইস চাষারা ভাল করিয়া শুকায় না। তদ্ব্যতিরিক্ত ওজনে ভারি করিবার জন্য আবার ঐরূপ পাটকেই জল দিয়া ভিজাইয়া থাকে। এই কারণে পাট শক্ত কম হয় এবং উহার রংও তেমন ভাল থাকে না। সমিতির ইচ্ছা, বোম্বাইয়ে এ সম্বন্ধে যে আইন হইয়াছে, তাহার অনুকরণে এখানেও ঐরূপ আইন করিয়া উহার প্রতিকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করায়, উহার সম্বন্ধে আপত্তিকারীদের যাহা কিছু প্রস্তাব আছে, তাহা গবর্ণমেণ্ট জানিতে চাহিয়াছেন।

দেশী কয়লার খনি।

দ্বিতীয় বর্ষের মহাজনবন্ধুতে পাথুরে কয়লা এবং কয়লার খনির কথা সম্বন্ধীয় কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মিত্র নামক জনৈক লেখক "কালীপাহাড়ী অঞ্চলের কয়লার খনি" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ ১৩০৯ সালের মহাজনবন্ধুর ভাদ্র সংখ্যায় লেখেন। উক্ত প্রবন্ধের নিম্নে তিনি যেমন "ক্রমশঃ" লিখিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ মুদ্রিত করি; কেন

না, আমাদের তখন ধারণা হইয়াছিল, তিনি অবশ্য "ক্রমশঃ" লিখিবেন। তৎপরে ২।৩ মাস আর তাঁহার সাড়া শব্দ না পাওয়াতে কয়েকখানা পত্র দেওয়া হইল, তাহারও কোন উত্তর পাই নাই। "ক্রমশঃ" প্রবন্ধের জন্য মহাজনবন্ধুর অনেক মেম্বর মহাশয়ের নিকট আমাদের কথা শুনিতে হয়। অতএব লেখক মহাশয়েরা এ বিষয়ে সতর্ক হইবেন। যাহা হউক, আমরা সেই প্রবন্ধ সমাপ্তির জন্য অন্যান্য সংবাদ পত্র হইতে এই প্রবন্ধের বিষয় সংগ্রহ করিয়া দিলাম। "সঞ্জীবনী" এবং "রত্নাকর" পত্র হইতে আমরা এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইলাম। অতএব এই সম্পাদকদ্বয়ের নিকট এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বিশেষতঃ রত্নাকর কয়লার খনির বিষয় অনেক কথা বলেন।

ন্যূনাধিক ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কালীপাহাড়ী কেন্দ্র নানা জাতীয় গাছের নিবিড় বন দ্বারা আবৃত ছিল। এখানে লোকের বাস ছিল না। কালীপাহাড়ীর অন্তর্গত কুশডাঙ্গা, ভূতডোবা নামধেয় স্থান দ্বারা আমাদের বাক্য সপ্রমাণ হইতে পারে। কালীপাহাড়ী কেন্দ্রস্থ খনিগুলিতে কুশডাঙ্গা, ডোবালিয়া এবং ঘুশিক নামক তিনটী দাওয়া (Seam) বর্ত্তমান আছে। রেলের দক্ষিণ সীমাস্থিত কয়লাস্তরের ঢাল্ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে শতকরা ১০ ফিট এবং উত্তর সীমায় ৮৷৷ ফিট হইবে। কালীপাহাড়ী কেন্দ্রের কয়লার দাওয়া উত্তর-পূর্ব্বদিকে শেষ হইয়াছে। ইহাকে খনির ভাষায় আউট্‌ক্রপ্ (Outcrop) বলে। কয়লার দাওয়াগুলিতে সকল স্থানে সমভাবে কয়লা বিদ্যমান নাই। কোথাও ১ ইঞ্চ, কোথাও ২ ইঞ্চ এবং কোথাও বা ৩ ইঞ্চ মোটা প্রস্তরের স্তর কয়লার মধ্যে দেখা যায়। আবার একই দাওয়ার কয়লার গুণেরও কখন কখন তারতম্য হইয়া থাকে। ঘুশিকে বলীরাম এণ্ড কোংর ৬।৭ নং কূপখাদের কয়লা ব্যবসায়ী-মহলে যেমন আদৃত, তাঁহাদের ৪।৫ নং খাদের কয়লা তত মনোনীত হয় না। ঘুশিক দাওয়ার কয়লা কোথাও নরম এবং কোথাও শক্ত হইয়া থাকে, তাহাও দেখা যায়। দামোদর নদের পরপারস্থিত সালমা গ্রাম হইতে উত্তর-দক্ষিণে, কালীপাহাড়ী কেন্দ্রের পশ্চিম সীমায় একটী ডাইক্ প্রধাবিত হইয়াছে। ইহাকে সালমা ডাইক্ বলে। পৃথিবীর কঠিন আবরণের অভ্যন্তরে কখন কখন যে ফাট হয়, তাহা আগ্নেয় প্রস্তর দ্বারা পরিপূরিত হইয়া পড়ে। এই প্রস্তর দ্রবীভূত অবস্থায় ভূগর্ভ হইতে ঠেলিয়া উপরে উঠিলে ঠাণ্ডা এবং কঠিন হয়। এবম্বিধ

প্রস্তর পরিপূরিত ফাট খনিভাষায় ডাইক্ নামে পরিচিত। ডাইক্ দৈর্ঘ্যে কখন অল্পদূর, কখন বা বেশী দূর ব্যাপিয়া থাকে এবং প্রস্থে ১ ফুট হইতে অনেক হাত পর্য্যন্ত হয়। ডাইকের প্রভাবে খনির কয়লা কোথাও কোক্ এবং কোথাও বা ঝুল আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কয়লার দাওয়ার কোন কোন স্থলে কম বেশী পরিমাণে লম্বভাবে যে ফাট হয়, তাহা ভগ্ন প্রস্তরের নিরেট স্তূপে আবৃত করিয়া দাওয়ার গতি, হয় উর্দ্ধে না হয় নিম্নে বিশৃঙ্খলতা করিয়া দেয়। ঘুশিকের দুইটী মাত্র খাদে ফল্‌ট দেখা যায়। গত ১৯০১ সালে কালীপাহাড়ী কেন্দ্রের খনিগুলি হইতে ১,৭২,৭৯৫ টন কয়লা উৎপন্ন এবং কুঠিগুলিতে ৯,৮৬৫ টন পোড়া কয়লা প্রস্তুতি হইয়াছিল। এ সকল কার্য্যে প্রতিদিন গড়ে ২,৭২২ জন কুলি খাটিয়াছিল। ১৯০২ সালের খনি-রিপোর্টে প্রত্যেক খনির পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিবরণ না থাকায়, আমরা তাহা লিখিতে পারিলাম না। কালীপাহাড়ী কেন্দ্র রন্ধনোপযোগী পোড়া কয়লার জন্য প্রসিদ্ধ হইলেও চিৎপুর এবং শিয়ালদহ ডিপোগুলিতে সস্তা দরে নানা স্থান হইতে কোক্ চালান যাওয়ায়, এখানকার পোড়ার ব্যবসায়ী নষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে। পোড়া ব্যতীত ষ্টিম এবং রবল কয়লার দাম এখন যেরূপ কমিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন কোন কুঠি বন্ধ হইয়াছে এবং অপর অধিকাংশ কুঠি অর্দ্ধ মাত্রায় চলিতেছে।

১৯০১ সালে বঙ্গদেশে ২৯২টী খনি হইতে ৫,৭০৩,৮৭৬ টন এবং গত বৎসর ২৮০টী হইতে ৬,২৬৯,২৯৪ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১০টী খনি কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও ১৯০৩ সালে ৫৬৫,৪১৮ টন কয়লা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সমস্ত ভারতের উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৯২ টন বঙ্গদেশীয় খনি হইতে উত্থিত হইয়াছিল। ভারতের ৬,৭৯০,৫০৭ টন কয়লার মধ্যে বেঙ্গল কোল কোং ৬৫৬,৫০৭ টন, ই-আই-রেলওয়ে কোং ৬১৩,৭৮৯, হাইদ্রাবাদ কোং ৪৫৫,৪২৪ এবং বার্ড কোং ৬৬২,২১৩ টন অর্থাৎ চারি কোম্পানিতে গত বর্ষে শতকরা ৩২ টন কয়লা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ভারতে কয়লা খনির কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট এবং অপরাপর ব্যক্তি কত টাকা মূলধন ফেলাইয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। যৌথ কারবার দ্বারা যাঁহারা কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ১৪৪ লক্ষ টাকা ছিল। বঙ্গের ২৬টী কোম্পানির মধ্যে ৯টীর ৫ লক্ষেরও অধিক মূলধন এবং সমস্ত প্রদেশের কয়লার পরিমাণের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ তাহাদিগের কর্তৃক উত্তোলিত

হইয়াছিল। ২২ বৎসরের মধ্যে ভারতে কয়লার কাটতি চতুর্গুণ, উৎপন্ন ষষ্ঠগুণ, রপ্তানি অষ্টসহস্রগুণ এবং আমদানি অর্দ্ধেক হইয়াছে। রপ্তানি কয়লা প্রধানতঃ বোম্বাই, সিংহল এবং সিঙ্গাপুরে যায়। ১৯০১ সালের তুলনায় গত বৎসর বোম্বাই এবং সিংহলে ৩৭৯,৪১১ টন রপ্তানি হইয়াছিল। কেবল সিঙ্গাপুরের দিকে ৯,৭১০ টন কয়লা রপ্তানি বাড়িয়াছিল। তথাপি ৩৭৯,৪৯২ হইতে ৯,৭১০ বাদ দিলে,—৩৬৯,৭৮১ টন কয়লা রপ্তানি কম হইয়াছে, বলিতে হইবে। আমদানি কয়লা প্রধানতঃ জাপান এবং বিলাত হইতে আইসে। ১৯০১ সালে ২৩৭,৬২২ টন এবং ১৯০২ সালে ২৪৮,০২৬ টন আমদানি হওয়ায় দেখা যায়, গত বৎসর ১১,৪০৪ টন কয়লা বেশী আমদানি হইয়াছিল। আমদানি কমিয়া বা ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া রপ্তানি যত বেশী হইবে, ততই ভারতীয় কয়লা খনির পক্ষে মঙ্গল। ভারতীয় সমস্ত উৎপন্ন কয়লার এক তৃতীয়াংশ রেলওয়েতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৯০২ সালের ভারতীয় খনি সমূহের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহা পাঠে জানা যায় যে, অভ্র প্রভৃতি এবং ব্রহ্মদেশের বহুমূল্য প্রস্তরের খনি ব্যতীত কয়লা খনিতে ৫৯টী শ্রমজীবীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে দেশীয়গণ-চালিত খনির অপমৃত্যু সংখ্যা ৬টী মাত্র হইয়াছিল। প্রায়ই দেখা যায়, অল্প মূলধন বিশিষ্ট দেশীয়গণের যে সকল খাদ আছে, তাহার জায়গা কম। তাঁহাদের খাদগুলি অল্প গভীর, সিঁড়িখাদ ও পুকুরিয়া খাদের সংখ্যা অপেক্ষা-কৃত বেশী এবং খনির নীচের রাস্তায় গ্যাস প্রভৃতি দূষিত বায়ু তত না থাকায় কুলিগণের কম বিপদের সম্ভাবনা আছে। অপরন্তু তাঁহাদের অল্প পুঁজি বলিয়া তাঁহারা অতি সাবধানে কয়লা উৎপন্নের কার্য্য করিয়া থাকেন। আমরা এমনও দেখিয়াছি যে, কোন কোন দেশীয়ের খাদে অন্যূন ২০ বৎসর ব্যাপিয়া কোন সাংঘাতিক আকস্মিক ঘটনা ঘটে নাই। এরূপ অবস্থায় খনি-সমূহে সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ম্যানেজার নিয়োগের ব্যবস্থা করিলে, দেশীয় কয়লা-কুঠি ব্যয়-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে এবং তদ্দারা দেশীয়গণের একটী প্রধান শ্রমশিল্প নষ্ট হইতে পারে।

চোটার কাজ।

"যার নাই পুঁজি পাটা, সেই যাবে বেলেঘাটা" অর্থাৎ বেলেঘাটা এবং রামকৃষ্ণপুর প্রভৃতি স্থান চাউলের কাজের জন্য বিখ্যাত। চাউলের গ্রাহক বেশী, মালও বেশী; কিন্তু এদেশী অনেক ধনীর টাকা কম। তাই ঐ সকল স্থানে চোটার কাজ চলে। কেবল ঐ সকল স্থান বলিয়া নহে, আজকাল জাহাজী দ্রব্য যখন এদেশে অতিরিক্ত আমদানী হয়, তখন "সামাই" না দিতে পারিলেই গুদামের মাল বন্ধক দিয়া টাকা লইতে হয়। এইরূপ মাল বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করাকেই "চোটার কাজ" বলে। চোটার কাজের সুদ বেশী। রামকৃষ্ণপুরে এই কাজে প্রত্যহ হাজার টাকায় ১৲ ১।০ সিকা সুদে টাকা খাটে; অর্থাৎ ধরুন, আমি হাজার মণ চাউল ক্রয় করিলাম, কিন্তু আমার টাকা নাই। আমি চাউল ওজন লইবার অগ্রে বা সওদা করিবার পূর্ব্বে কোন মহাজনকে বলিলাম, "মহাশয়, আমি হাজার মণ চাউল লইব, আমার চারি হাজার টাকার দরকার। আপনি উক্ত টাকা দিউন এবং উক্ত মাল আমি যে গুদামে তুলিব, সেই গুদামের চাবি আপনি রাখুন। আমি যখন উহা বিক্রয় করিব, তখন যাহার টাকা যেমন পাইব, তাহা তৎক্ষণাৎ আপনাকে দিব। অথবা আপনি বিক্রয় করিবেন; কিন্তু যে সময় বিক্রয় করিতে হইবে, আমার অনুমতি লইবেন, বা আমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আপনার লোক দ্বারাই মাল বিক্রয় করিয়া টাকা লইবেন।" ধনী দেখিল, লাভ ও ক্ষতির দায়ী ঐ ব্যক্তি। আমার টাকা খাটে না, সিন্দুকে পড়িয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে সুদ পাইব। অতএব তিনি টাকা দেন। পরন্তু চোটার কাজে সুদের হার বেশী বলিয়া অনেক ধনী কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়াও এ কাজে টাকা ধার দেন। কেন না, দেনদারের হাতে যাইতে হয় না, অথচ সুদের হার বেশী। নির্ধনী ভাবিল, "আমার টাকা কড়ি নাই, কে আমাকে টাকা দিবে? যদি অদৃষ্টে থাকে, বাজার তেজ হইলেই কিছু পাইব।" অতএব যাঁহার টাকা আছে, তিনি চোটার কাজের মহাজন; যাঁহার টাকা নাই, তিনি চোটার কাজের খাতক। চাউলের কাজে একটা মোড় আছে, তাহা অগ্রহায়ণ মাসের শেষে যেমন নূতন চাউল বাহির হয়, অমনি পুরাতন চাউল কমিয়া যায়। শেষে এমন সময় আসে যে, আর পুরাতন

চাউল পাওয়া যায় না, অথচ নূতন চাউলও পুরাতন হইবার সময় তখনও ঠিক হয় নাই। এই সন্ধির মুখের সময়ে পুরাতন চাউল বাঁধা রাখিলে প্রায়ই কিছু না কিছু লাভ পাওয়া যায়। অতএব এই সকল সুযোগ বুঝিয়া ভাল লোকেও চোটার কাজ করে। আবার অনেকে টাকার জালায়, মান বজায় রাখিবার জন্যও চোটার কাজ করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অনেকের মনে দুরভিসন্ধি থাকে। ইহারা এমন কৌশল করেন যে, গুদাম ইহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে, এক মাল দুইবার দুই ধনীর নিকট বাঁধা দিয়া থাকেন। সহরের অনেকগুলি বাঙ্গালীর কলও এই কাজের মহিমায় পরিচালিত হয়। কল করিলাম ৫ হাজার টাকায়, উহা বাঁধা দিলাম ৪ হাজার টাকায়। এই টাকার ব্যাজ দিলাম এবং কলের ভাড়া দিলাম প্রত্যহ ৫৲ টাকা। কেন না, ধনী কল লইয়া কি করিবেন? অতএব আমার ৫ হাজার মূলধনের ৪ হাজার নগদ রহিল, ইহা দ্বারা কল চলিতে লাগিল। পাঁচ হাজার টাকায়, নয় হাজার-টাকার কাজ চলিল। গহনা বন্ধকী কাজও চোটার কাজের অন্তর্গত। উহাতে যেমন মার্জিন অর্থাৎ কি জানি ভাই, তোমার এই ১০০৲ টাকার গহনা রাখিয়া আমি ১০০৲ টাকা কিরূপে দিব? যদি স্বর্ণের দর পড়িয়া যায়, যদি তুমি ইহা খালাস না কর, বিক্রয় করিতে গেলে যদি খাদ বেশী হয়, তাহা হইলে তখন কে তাহা দিবে? অতএব ১০০৲ টাকার গহনা আনিয়া ৭৫৲ টাকা লও। ইহাকেই মার্জিন রাখা বলে। গুদামের মাল বাঁধা দিবার কাজেও ঐরূপ মার্জিন আছে। মাল বন্ধক রাখিতে হইলে, পণ্য দ্রব্যের বাজার দর কতদুর কমিতে পারে, তাহা জানা আবশ্যক। কোন কোন দ্রব্য মণকরা ১৲ টাকা ২৲ টাকা পড়িয়া যায়,—যেমন চিনি। আবার কোন কোন দ্রব্য মণকরা বড় জোর চারি আনা পড়ে, যেমন দেশী চাউল। অতএব এই উভয় দ্রব্যের মার্জিনে বিলক্ষণ ইতর-বিশেষ করিতে হয়, নচেৎ লোকে টাকা ধার লইবে কেন? বিশেষতঃ চাউলের কাজ ৮।১০ দিন মাল বন্ধক রাখিয়া বিক্রয় করা চলে; যদি কেহ একশত হাজার টাকা লয়েন, ৮।১০ দিন পরে হাজার টাকায় প্রত্যহ ১৲ হিসাবে সুদ ৮৲ ১০৲ টাকা এবং মূল হাজার টাকা দিয়া চাউল বন্ধক খালাস করেন। চাউলের কাজে হাজার টাকার মালে আড়াই শত টাকা মার্জিন লওয়াই যথেষ্ট; অর্থাৎ হাজার টাকার মালে ৭৫০৲ টাকা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে নির্ধন লোক ২৫০৲ মূলধন লইয়া একদিনেই

৭৫০৲ টাকার কারবারী হইয়া উঠিতে পারেন। ব্যবসায়ীরা এ কাজ গোপনে করেন। কেন না, ইহা ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রশংসার কাজ নহে, এবং ইহা লুকাইয়া করিলে, সাধারণ লোক ভাবে যে, ইহার চলিতেছে ভাল। অতএব এজন্য তাহার শীঘ্র পসার হয়। আমাদের দেশের দেশী ব্যবসায়ীদিগের যৌথ কারবার হয় না; কাজেই চোটার কাজের সৃষ্টি হইয়াছে। নির্ধন ব্যক্তি-দিগের পক্ষে এ কাজ করিতে সাহস চাই। যাঁহাদের কিছু বিষয় আছে, তাঁহারা এ কাজ করিতে ভয় পান। কেন না, ক্ষতি হইলে স্থাবর সম্পত্তি থাকিলে তাহা বিক্রয় করিয়াও চোটার মহাজন টাকা আদায় করিবেন। যাহার কিছু নাই, তাহার আর কি করিবে? বরং তিনি কিছু মারিবেন। সুদ বেশী অর্থাৎ চুটিয়ে ব্যাজ লওয়া হয় বলিয়াই এ কাজের নাম বোধ হয় "চোটার কাজ" হইয়াছে।

ময়ূরভঞ্জ।

মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের মধ্যে অনেকগুলি করদ-রাজ্য আছে। তাহাদের প্রায় সকলেরই ভাষা উড়িয়া। তন্মধ্যে কতক-গুলি মধ্যপ্রদেশের অধীন, কতকগুলি ছোটনাগপুরের অধীন এবং অবশিষ্ট-গুলি উড়িষ্যার অধীন। উড়িষ্যার অধীন রাজ্যগুলির সংখ্যা ১৯; তন্মধ্যে ময়ূরভঞ্জ সর্ব্ববিষয়ে প্রধান।

অতি অল্প বয়সে বর্ত্তমান মহারাজার পিতামাতার মৃত্যু হয়। তখন বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট রাজ্য পরিচালন এবং নাবালকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইনি রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুশিক্ষা ও পৈত্রিক মহত্ত্বগুণে মহা-রাজা উড়িষ্যার করদরাজাদের মধ্যে আদর্শ রাজা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইঁহার নাম মহারাজ রামচন্দ্রভঞ্জ বাহাদুর। জাতিতে ক্ষত্রিয়। ইনি ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যা ভাষা জানেন। করনেশনের পর ইনি মহারাজ হইয়াছেন। ইঁহার বিবাহের প্রথম সম্বন্ধ হয়, পরলোক-গত স্বর্গীয় কেশব-চন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার সহিত। তাহাতে মহারাজের সম্মতি ছিল। কিন্তু ইঁহার তখনকার কর্ত্তৃপক্ষের কাহার কাহার অমতে, বিশেষতঃ ইঁহার মাতা

ঠাকুরাণীর অমতে তাহা হয় নাই। তৎপরে স্ব সমাজেই বিবাহ হয়। ইঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান। বিগত বর্ষে ইঁহার স্ত্রী বসন্তরোগে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এজন্য মহারাজ স্বরাজ্যে টীকা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন। করনেশনের সময় মহারাজ দিল্লীর দরবারে গমন করিয়াছিলেন। সঙ্গে দুই গ্ল্যাসকেশ পুস্তক ছিল। ইঁহার পুস্তক-পাঠ-লিপ্সা অপূর্ব্ব! প্রায় সমস্ত রাত্রি মস্তকের নিকট বাতি জ্বলে এবং ইনি পুস্তক পাঠ করেন। করনেশনের পর কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় ইঁহার সহিত আলাপ পরিচয় হয়। কলিকাতায়ও সেই সকল পুস্তক আনিয়াছিলেন। রাত্রিতেও পুস্তক পাঠের বিরাম ছিল না। ইনি বাঙ্গালীর মত বস্ত্রাদি পরিধান করেন। ইঁহার অমায়িক ব্যবহারের কথা আমরা এ জীবনে ভুলিব না। পরমেশ্বর আমাদের এই মহারাজাকে দীর্ঘজীবী করুন।

ময়ূরভঞ্জ আয়তনে ৪,২৪৩ বর্গমাইল। ১৩০৮ সালে আয় ৮,০০,৪৫১৲ এবং ব্যয় ৭,৪৯,১৪৮৲ হইয়াছে। শিক্ষাকার্য্যে ১৯,১১৯৲ টাকা ব্যয় হয়। ৫,২৫২ জন ছাত্র বিদ্যালয়ে পড়িতেছে। তন্মধ্যে ২৩৬ জন বালিকা, ৪৩৪ জন সাঁওতাল, ১৩৮ জন ভূমিজ, ১১৪ জন কোল, ৮৮ জন বাথুরি এবং ৫৮৩ জন অন্যান্য আদিম জাতীয় লোক। মহারাজার রাজ্যে ছোট বড় অনেক জাতি শিক্ষালাভ করিতেছে।

মহারাজার রাজ্যে ৬টী ডাক্তারখানা। তন্মধ্যে ৫টীতে রোগীর রাত্রিতে বাসের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১৩০৯ সালে ২১০ জন রোগী হাঁসপাতালে থাকিয়া এবং ১৪,৮২২ জন রোগী হাঁসপাতালে আসিয়া ঔষধ ও পথ্য পাইয়াছে। এই বৎসর ১০,৮৬৭৲ টাকা রোগীর সেবায় ব্যয় হইয়াছে। ইংরাজী চিকিৎসার উপর মহারাজা কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে এ বৎসর ১,১১১ জন রোগীর চিকিৎসা এবং ১,০৯১ জন উপশম লাভ করিয়াছে। রাজ-চিকিৎসক রায়গুরু যে আশীর্ব্বাদের পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। ময়ূরভঞ্জে সাংঘাতিক রোগ বসন্ত।

ময়ূরভঞ্জে অনেক সরকারী জঙ্গল আছে; কিন্তু তাহাতে প্রজাপীড়ন হয় না। গৃহ হইতে দুই মাইল মধ্যে যদি কেহ কোন সরকারী বনে গবাদি চারণ করে, তবে কোন মাশুল দিতে হয় না। জ্বালানী কাষ্ঠ এবং নিজের গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠের জন্য কোন মাশুল নাই। এমন কি, সামান্য কাষ্ঠ বাজারে গিয়া বিক্রয় করিলেও মাশুল দিতে হয় না।

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, ময়ূরভঞ্জের আয়তন ৪,২৪৩ বর্গমাইল। তন্মধ্যে—

১,৭৬২ মাইল সরকারী জঙ্গল।

১,৩২৭ মাইল আবাদ।

১,১৫৪ মাইল আবাদ-যোগ্য, কিন্তু পতিত।

রাজ্যমধ্যে গুলমারা ও বামনঘাটীতে অতি উত্তম তসর কাপড় প্রস্তুত হয়। বামনঘাটী হইতে লক্ষাধিক টাকার তসর-গুটি প্রতি বৎসর রপ্তানি হয়। চাঁইবাসা বা ঘাটশীলা হইতে অতি সহজে বামনঘাটী যাওয়া যায়। গুলমারা বালেশ্বরের নিকট।

রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে অর্থাৎ বামনঘাটী ও সিমলীপালে লোহার খনি আছে। নদীতে সোনা ধোওয়া হয়। তাম্র, অভ্র প্রভৃতি থাকা সম্ভব। জিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ময়ূরভঞ্জে খনি পরীক্ষার জন্য যাইবেন, শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। ময়ূরভঞ্জে যে লোহার ফাল, সাবল, দা, টাঙ্গি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়, বালেশ্বর, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় তাহার বিশেষ আদর।

কুলি মজুরের বেতন প্রত্যহ ৵০ আনা। আসাম প্রভৃতি যে সকল দেশে দাস-কুলি আইন প্রচলিত, মহারাজা সে সকল দেশে কোন প্রজাকে যাইতে দেন না। তবে দার্জ্জিলিং, শিলিগুড়ি প্রভৃতি যে সকল দেশে কুলির দাসত্ব-প্রথা নাই, তথায় প্রজাদিগকে যাইতে বাধা দেন না। স্বদেশে ৪৲ টাকা পাইলে, কেহ কি বিদেশে ৫॥০ টাকার জন্য যায়?

বারিপদা রাজধানী। তাহা বেঙ্গল নাগপুর কোম্পানির "বারিপদা রোড" নামক ষ্টেসন হইতে ৩২ মাইল। মহারাজা এই কয় মাইল ব্যাপিয়া রেলওয়ে করিতেছেন। যদি ক্ষতি না হয়, তবে বামনঘাটী দিয়া চাঁইবাসার সঙ্গে যোগ করিতে পারেন। অনেক মহাজন রাজধানীতে এবং রাইবংখ, বহনদা ও কাপ্তিয়াতে বড় বড় কারবার খুলিয়াছেন। চাউল, সচ্ছগুঞ্জা, সরিষা, লা, তসরগুটী, হরিতকী প্রভৃতি রপ্তানি হয়। নিম্নে চাউলের দর প্রদত্ত হইল।

১৩০৫ সালে	প্রতি টাকায়	॥৪	সের।
১৩০৬ সালে	,,	॥০	,,
১৩০৭ সালে	,,	৷৹	,,
১৩০৮ সালে	,,	।৬	,,

১৩০৮ সালে অনাবৃষ্টিবশতঃ চাউল মহার্ঘ হইয়াছিল।

এ বৎসর ৪৩৫ জন কয়েদীর মধ্যে ২ জনের মৃত্যু হয়। কয়েদী রোগীর সংখ্যা একশতের মধ্যে গড়ে আড়াই জন মাত্র। ইহা হইতে জেলের সুব্যবস্থা অনায়াসে কল্পনা করা যাইতে পারে।

ময়ূরভঞ্জে তিন সব্‌ডিভিসনে সিনিয়র ৭ জন উকীল ও ১৮ জন মোক্তার। রাজধানী বিভাগে আদালতের জন্য ২০,০৬৩৲ টাকা ব্যয়, এবং ১২,৭৭৯৲ টাকা আয় হইয়াছে। ইংরেজ-রাজ্যের অবস্থা কিন্তু ইহার বিপরীত।

রাজ্যমধ্যে ১০ জন হেড কন্‌ষ্টেবল, তন্মধ্যে ৪ জন বরখাস্ত এবং অবশিষ্ট ৬ জন দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং ১৯২ জন কন্‌ষ্টেবলের মধ্যে ২১ জন বরখাস্ত এবং ৫২ জন দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পুলিসের উপর মহারাজার যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহার অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই।

আমরা বার্ষিক বিবরণী হইতে আর কোন কথা উদ্ধৃত করিতে চাহি না। যে সকল লোক ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত, তাহাদিগকে অনুরোধ করি যে, একবার বারিপদা রোড ষ্টেসন হইয়া চক্রধরপুর বা ঘাটশীলায় গমন করিবেন, তাহা হইলে ময়ূরভঞ্জে কোন কারবার খোলা যাইতে পারে কি না, তাহা বুঝিতে পারিবেন। অশ্বারোহণে বা শকটারোহণে বারিপদা হইতে বহনদা পর্য্যন্ত একশত মাইল অনায়াসে যাতায়াত করা যায়। তবে ময়ূরভঞ্জের সীমা হইতে ঘাটশীলা বা চাঁইবাসা পর্য্যন্ত ইংরেজ-রাজ্যের পথের অবস্থা ভাল নয়। তাহাতে অশ্বারোহণ বা গো-শকট অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা মহারাজা বাহাদুরের সম্বন্ধে আর কি বলিব? তিনি অনেকেরই আদর্শস্থল।

সঞ্জীবনী।
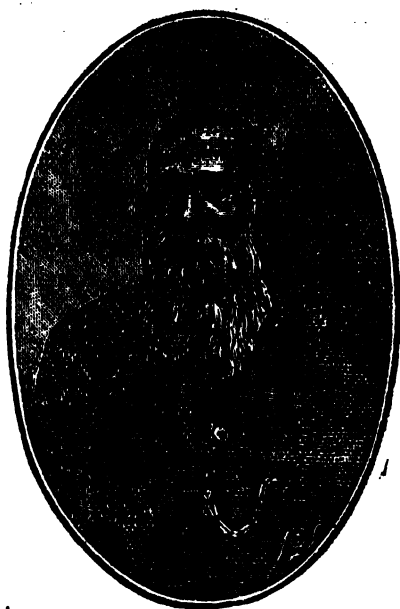
শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র।

আমরা উপরিস্থিত ব্যক্তির সহিত বিশেষ পরিচিত। ইনি অপর কেহই নহেন, ভারতমাতার এক কৃতবিদ্য সন্তান, ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের পরম হিতৈষী। যাহাতে এই কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে প্রকৃষ্টরূপে উন্নত প্রণালীতে শস্য ও কৃষিজাত, মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে স্বল্পব্যয়ে উৎপন্ন হইতে পারে, এই মহাত্মাই সে বিষয়ের পথপ্রদর্শক—একজন প্রধান নেতা। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাশীপুর-কৃষিশালা ইঁহা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ঐ কৃষিশালা ভারতবর্ষের একটী অভিনব কৃষি ও উদ্যান সম্বন্ধীয় বিদ্যালয়। ইহাতে এদেশীয় কৃতবিদ্য ভদ্রসন্তানেরা বিনাব্যয়ে উদ্ভিদ, কৃষি ও উদ্যানতত্ত্ব বিদ্যায় বিশেষরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বিনা-খরচায় তথায় থাকিতে পান, উপযোগিতা অনুসারে মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তিও পাইয়া থাকেন। এইরূপে শত শত যুবক এই স্বাধীন, অর্থকরী, দেশহিতকরী বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে আপন আপন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ

করিতেছেন। তন্মধ্যে অনেকে স্থানে স্থানে নর্শরী স্থাপন পূর্ব্বক তত্তৎ-প্রদেশে ভাল ভাল গাছ বীজ বিস্তার করিতেছেন ; অনেকে বড় বড় রাজা, মহারাজা ও সাহেবদিগের বাগানের কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক ষ্টেটের ও দেশের উন্নতিসাধন করিতেছেন। বাবু হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই কাশীপুর-কৃষিশালার স্বত্বাধিকারী ও প্রেসিডেণ্ট। ইনি কৃষি ও উদ্ভিদসম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিস্তৃতির জন্য বহুব্যয়ে একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন। সেই পুস্তকালয়ে নানা-বিধ বহুমূল্য পুস্তক রক্ষিত হইয়াছে। কাশীপুর-কৃষিশালার ছাত্র ও মেম্বর-গণ সেই অমূল্য রত্নস্বরূপ পুস্তকগুলি ব্যবহার করিতে পারেন। যাহাতে সাধারণে কৃষি ও উদ্ভিদ-বিদ্যার ফলাফল দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন, সেজন্য হেমবাবু একটী আদর্শ পরীক্ষাক্ষেত্রের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যাহাতে সকলে নানা শ্রেণীর ও নানা জাতীয় বৃক্ষগুল্মলতাদির তত্ত্বে বিশেষ-রূপে পরিচিত হইতে পারেন এবং কৃষিশালার ছাত্রেরাও যাহাতে অনায়াসে সেই সব উদ্ভিদবিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারেন, সেজন্য পৃথিবীর নানা দেশ হইতে দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান্ উদ্ভিদাদি সংগৃহীত, রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য বিস্তর আয়াস স্বীকার ও ব্যয়-স্বীকার করিতেও হেমবাবু কুণ্ঠিত হইতেছেন না। তাঁহার যত্নে ও ব্যয়ে এতদ্দেশবাসীগণ আবর্জ্জনার মধ্য হইতে উপার্জ্জন করিবার উপায় দেখিতে পাইয়াছেন ও পাইতেছেন ; ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। যাহাতে এদেশীয় লোকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কৃষিজাত ফসল, শাক্-সবজী, ফল-মূল, ফুল, ঔষধের গাছ-গাছড়া এবং নূতন প্রণালীর দেশীয় বিদেশীয় আবশ্যকীয় ও মনোহর শ্রীসম্পন্ন গাছ, লতা প্রভৃতি দেখাইয়া যোগ্যতা অনুসারে পারিতোষিক প্রাপ্ত হন, সেজন্য বর্ষে বর্ষে পুষ্প ও কৃষি-প্রদর্শনী করিয়া হেমবাবু দেশের মঙ্গলসাধন ও লোকের উৎসাহবর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গিনীঘাসরিয়া নামক ঘাঁসের গাছ, লতা-কস্তুরী, বেড়েলা, ট্যাপিওকা, নানাবিধ তুলা, তামাক, নানাবিধ ব্যবসায়ের উপযোগী দ্রব্য বিশেষ আদরের সহিত এই নির্জীব ভারতকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আরও একটী মহদনুষ্ঠান করিয়া হেমবাবু সকলের আশীর্ব্বাদ-ভাজন, যশোভাজন ও খ্যাতিভাজন হইয়াছেন। যাহাতে অস্মদ্দেশীয় আয়ু-র্ব্বেদশাস্ত্র-ব্যবসায়ী ছাত্রেরা অনায়াসলভ্য, এদেশীয় ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্যপ্রদ, আয়ু-র্ব্বেদোক্ত গাছ-গাছড়া চিনিয়া ও তাহার গুণাগুণ শিখিয়া আসিতে পারেন, সেজন্য হেমবাবু বিশেষ যত্নে ও বহুব্যয়ে নানাবিধ আয়ুর্ব্বেদোক্ত ওষধিও সংগ্রহ

করিয়া রাখিয়াছেন। সাধারণে যাহাতে নিরক্ষর ও স্বার্থপর বেদিয়া বা বেণিয়ার উপর বিশ্বাস করিয়া পরিণামে অর্থনাশ ও স্বাস্থ্যনাশের জন্য মনোকষ্ট না পান, তাহার উপায় করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। সকলেই বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত এই সমস্ত বৃক্ষাদিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিনাব্যয়ে পরিচিত হইতে পারিবেন। সাধারণে যে সকল ঔষধের গাছ লইতে বা চাষ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা অনায়াসে এখান হইতে অকৃত্রিম গাছ বা বীজ লইতে পারেন। নানাবিধ অকৃত্রিম ফল, ফুল, লতা, গুল্মাদি ও আয়কর বৃক্ষাদির চারা, বীজ, নানাবিধ শাক সবজীর বীজ ও মরসুমী ফুলের বীজ, যাহাতে সাধারণে যথাসম্ভব স্বল্পমূল্যে পাইতে পারেন, সেজন্য বৎসর বৎসর ক্যাটালগ প্রকাশিত ও বিনাব্যয়ে বিনামাশুলে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহার সংগ্রহের নিকট গবর্ণমেণ্টের বোটানিকাল গার্ডেন অনেক পরিমাণে নিম্নশ্রেণীস্থ বলিয়া বোধ হয় না। আমরা এই কাশীপুর-কৃষিশালার কার্য্যকারিতা দেখিয়া বেশ আশা করি যে, ভবিষ্যতে কৃতবিদ্য যুবকবৃন্দ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিলে, অল্প মূলধনে স্বাধীনভাবে মনের ও স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

আমাদের বিশ্বাসের বিষয় এই যে, হেমবাবু এতাবৎকাল রেলীব্রাদার্সের পাটের খরিদ-সম্বন্ধে সর্ব্বময় কর্ত্তা থাকিয়া, অসীম পরিশ্রমে চাকরী বজায় রাখিয়াও অবকাশ মত এই কৃষিশালার সুবন্দোবস্ত করিয়া, ইহাকে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিদ্যাগারস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। যাহাতে কৃষির উন্নতির মূল গোজাতির উন্নতি হয়, সেজন্য ভাল ভাল ষাঁড় রাখিয়া দিয়াছেন ও নানাবিধ কৃষি-যন্ত্রাদির প্রচলন ও তদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ সার ও শস্যাদির হানিকর কীটপতঙ্গাদি-নাশের যেরূপ উপায় ও ব্যবস্থা করিয়াছেন, পরিদর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

এই ভারতবর্ষে বার্ষিক লক্ষ লক্ষ মুদ্রার উপস্বত্ব-ভাগী লোক আছেন বটে, কিন্তু হেমবাবু যেরূপ পরিশ্রমলব্ধ আয় অকাতরে ব্যয় করিয়া, নিস্বার্থ-ভাবে দেশের সাধারণের ধনবৃদ্ধির উপায় দেখাইয়া দিতেছেন ও তিনি যেরূপ দেশের জন্য চিন্তাশীল, সেরূপ উদারচেতা স্বার্থশূন্য পরিশ্রমী লোক অতি বিরল। দেশের মঙ্গলের জন্য এই কৃষিশালা স্থাপনার্থ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইলেও, তিনি কাহারও নিকট এক কপর্দ্দক বা কাহারও সহানুভূতি

গ্রহণ করেন নাই। কাশীপুর, উল্টাডিঙ্গি ও মধুপুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ বাগানগুলি সকলের বিশেষরূপ দেখিবার, বুঝিবার ও শিখিবার জিনিষ। দেখিলে স্পষ্টই বুঝিবেন, একজনের জীবনকালের মধ্যে একের দ্বারা এই বৃহৎ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব।

কেবল বাঙ্গালায় কৃষির উন্নতি লইয়াই হেমবাবু চিন্তিত নহেন; সমস্ত হিন্দুস্থানে যাহাতে কৃষির সবিশেষ উন্নতি হয়, তিনি সেজন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। বাঙ্গালায় কৃষি-সম্বন্ধে কতিপয় মাত্র পুস্তক আছে বলিয়া ও কৃতকার্য্যে বাঙ্গালীর ততদূর উৎসাহ নাই দেখিয়া, তিনি তাঁহার কৃষিশালা হইতে "সব্জীর চাষ" নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তক এবং দেবনাগরাক্ষরে হিন্দী-ভাষায় কৃষিশিক্ষা, কৃষিদর্পণ ও বৃক্ষরোপণ প্রণালী নামক তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া, হিন্দুস্থানী কর্ম্মঠদিগের উৎসাহ দ্বিগুণিত করিয়াছেন। আমাদের ইচ্ছা যে, সকলেই এইরূপে কৃষিকার্য্যে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে দেশের অবস্থা আশু পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আমাদের আরও অনুরোধ এই যে, কাশীপুর-কৃষিশালা হইতে বহু অর্থব্যয়ে যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ও ফলাফল নির্ণীত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে একখানি পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত হয়।

এই কৃষিশালা ১৮৮৩ অব্দে সংস্থাপিত। ইহা গবর্ণমেণ্টের বিশেষরূপ পরিচিত ও দেশের গৌরবের জিনিষ। যাঁহারা এই কৃষিশালা-সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন, আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা একবার দর্শন, পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়া স্ব স্ব চিত্তের তুষ্টিসম্পাদন করেন। তাঁহাদের ইহা দেখা ও জানা উচিত।

শ্রীহরিদাস মিত্র বি, এ।

সংবাদ।

লবণ। বিগত জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে কলিকাতা হইতে ২৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৩ শত ৩১ মণ লবণ বিক্রয় হইয়াছিল। গত বৎসর ঐ কয় মাসে ২৮ লক্ষ ২৯ হাজার ৫ শত ২৭ মণ

লবণ বিক্রয় হইয়াছিল। অর্থাৎ এ বৎসর মণকরা আট আনা মাশুল কমাইয়া দিয়াও তবু কাটতি বৃদ্ধি হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর লবণের ওজন এবং ডিউটীর যেমন সুন্দর বাঁধা বাঁধি নিয়ম করিয়াছেন, ঐরূপ লবণ বিক্রেতাদিগের খরচা ধরিয়া একটা বাঁধি লাভ ১০ পয়সা বা ৫ পয়সা মণকরা করিবে, এই ভাবে একটা দর বাঁধিয়া দিতে পারেন। কেন না, লবণকেও আবগারী বিভাগে ধরা হইয়াছে; আবগারী বিভাগের অহিফেন, গাঁজা, চরস ইত্যাদির বিক্রয়ের যেমন খাতা দেখা হয়, লবণের কাজে বিক্রেতার খাতা কেন দেখা হয় না?

ভারতের কাপড় চীনে। বিগত বৎসর বোম্বাই নগরের কাপড়ের কলগুলির কাপড় অনেক মজুত ছিল, এজন্য ক্ষতি হইয়াছিল। এই বৎসর হইতে বোম্বে কলের কাপড় চীন দেশে চালান যাইতেছে, অতএব কাটতি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে শুনা ছিল, ভারতের সুতা চীনে যায়; এখন কাপড় যাইতেছে, বড়ই আনন্দের কথা। কলিকাতার বাঙ্গালী তুমি চাকরী কর এবং চীনে বাদাম খাও।

কংগ্রেসের শিল্পমেলা। এই বৎসর লইয়া বুঝি তিন বৎসর হইল। গত বৎসর এই মেলা আহম্মদাবাদে হয়। উন্মুক্ত করেন, বরদা-রাজ গুইকুমার। এ বৎসর এই মেলা মান্দ্রাজে বসিবে। শুনিতেছি, মহীশূরের মহারাজ এবার এই প্রদর্শনী খুলিবেন। এতদিন লোকে প্রজাদের হাট দেখিয়াছে, কংগ্রেসের কল্যাণে না হয়, আমরা রাজা মহারাজার হাট দেখিব। বৎসর বৎসর একবার করিয়া নূতন-বাজার বসাইলে যে দেশোদ্ধার হইবে, ইহা আমাদের ধারণাতীত। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি ইংরাজরাজের প্রাত্যহিক মেলা। এই সকল মহানগরীর সমুদয় দ্রব্যের দোকানগুলি দেখিলে, মহামেলা দর্শনের ফল হয়, অথচ টিকিট লাগে না। কিন্তু কংগ্রেসের মেলা দেখিতে গেলে টিকিটের মূল্য লাগে, ইহাই যাহা দুঃখ। এবার কত দামের টিকিট? আমরা ঐ সকল রাজা মহারাজাদিগকে করযোড়ে বলি, ভারতের রেল বিস্তারের দিকে তাঁহারা লক্ষ্য করুন। এ কার্য্যে ক্ষতি নাই, বরং এক একটা লাইন দ্বারা এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের আয় হয়। এজন্য ভারতের বহু লোহ এবং

কয়লা, কাষ্ঠ ইত্যাদি ব্যবহৃত হইবে, ইহার আয় বিদেশে চলিয়া যাইবে না; প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলে যাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার, রেলের মাল গুদামের অত্যাচার কমিয়া যাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি! পারলাখেমিডির রাজা স্বদেশে নিজে রেল করিয়াছেন।

লর্ড কার্জ্জনের সৎকীর্ত্তি। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ভারতের পঞ্চপুত্র, (প্রতি বৎসর কিনা, ঠিক বুঝিলাম না) প্রত্যেককে ১৫০ পাউণ্ড বৃত্তি দিয়া বিলাতে শিল্পশিক্ষার জন্য প্রেরণ করিবেন। ইহার মধ্যে ৩টী যুবক বঙ্গের, ২টী বোম্বায়ের হওয়া চাই। বঙ্গের ৩টীকে খনি-বিদ্যা এবং বোম্বায়ের ২টীকে কাপড়ের কলের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। চিকিৎসা-শাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা অন্য কোন বিদ্যার জন্য ইহা দেওয়া হইবে না। শিক্ষার্থী নির্ব্বাচনে প্রতিযোগী পরীক্ষার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হইবে না। কার্য্যকরী শিক্ষায় বিশেষ অনুরাগী, সুগঠিত চরিত্র এবং ইংরাজী কথা-বার্ত্তা বলিতে সক্ষম, এমন যে কেহ এই বৃত্তির প্রার্থী হইতে পারিবেন।

বিলাত হইতে সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মিঃ গ্রোভার মহোদয় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কলের চিমনীর ধূম দেখিতে! কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যাহাতে উত্থিত ধূম পুড়িয়া নষ্ট হয়, এইরূপ ভাবে বয়লারের নিম্নস্থ উনানের মুখ বড় কর; তাহা হইলে অধিক বায়ু প্রবেশ করিয়া কয়লাকে শীঘ্র জ্বালাইয়া দিবে। আমরা বলি, তাহা হইলে কয়লা অন্ততঃ তিনগুণ বেশী পুড়িবে, এজন্য কলের দ্রব্যের পড়তা বাড়িবে। মিল ওয়ালাদের জয় জয় পড়িবে!! মিলে এবং কলে প্রভেদ আছে। দশটা কলে যাহা না হইবে, একটা মিলে তাহা হইবে।

শুনিতেছি, বর্দ্ধমানের নূতনগঞ্জের কয়েকজন ব্যবসায়ী তথায় একটা থিয়েটার খুলিয়া ব্যবসায় করিবেন। যেন তেন প্রকারেণ অর্থার্জ্জন করিতে গেলে, প্রথমটা অনেকের মতামত বাহির হয়, শেষে কিন্তু সহিয়া যায়। অর্থের অর্থ বুঝা ভার! চলিলেই ভাল।

কল।

আজ বয়লার এঞ্জিনের কথা বলিব। মানুষের যেমন শিরা আছে, এই এঞ্জিন ও বয়লারের গাত্রে নানাবিধ নল শিরার মত আছে। এই সকল যন্ত্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে নানামুনির নানামত। ফলে কিন্তু মোটামুটি ইতিহাসের কথা অনেক পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলে সে সকল আখ্যান গল্পের মতও লাগে। এক দিনে এক জনের দ্বারা এই সকল যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই। কাজ আট্‌কাইলে বুদ্ধি যোগায়, এইরূপ ভাবে অনেকেই সময় সময়ে নিজেদের সুবিধামত ইহার পরিবর্ত্তন বা নূতন গঠন ইত্যাদিও করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। এইজন্য প্রত্যেক কল হইতে ষ্টীম দেখা ঘড়িটী পর্য্যন্তের আবিষ্কার-কর্ত্তা অনেককেই দেখা যায়। তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মোটামুটি কাজের কথাগুলি সহজ ভাষায় সরল ভাবে ক্রমান্বয়ে বলিয়া, অগ্রে ইহাকে সাধারণের মস্তকে উঠাইয়া দিব।

প্রত্যেক কলে ৪ প্রকার কল আছে। (১) বয়লার, (২) এঞ্জিন, (৩) চাকা, (৪) কাজের কল। বয়লারকে জলতপ্তের হাঁড়ি বলা যাইতে পারে। ইহা বহু প্রকারের আছে। ছোট, বড়, মাঝারি, খুব বড়, খুব ছোট এবং গঠনের নানামূর্ত্তির আছে। যথায় কয়লা দিয়া আগুন করা হয়, সেইটা উনান। উহার চারি দিকে লোহার নলের ভিতর ফাঁপা স্থানে জল পূর্ণ থাকে, উক্ত জল অগ্নিতাপে বাষ্প হইয়া যায়। এই বাষ্পকে ষ্টীম বলে। যে ব্যক্তি উনানে কয়লা দেয়, তাহাকে "টেণ্ডেল" বলে। ধরুন, একটা ৫০ ইঞ্চি লৌহপাতকে পিটিয়া দুমড়াইয়া নল করিলাম, জোড়ের মুখে ঘন ঘন শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রূপ আঁটিয়া এই নল করা হইল। তৎপরে ঐ মাপের একখানি ৫ ইঞ্চি লৌহ পাত লইয়া ঐরূপ ভাবে আর একটী নল করিয়া, পূর্ব্বোক্ত নলকে খাড়াই

দাঁড় করাইলাম ; উহার ঠিক মধ্যস্থলে এই ৫ ইঞ্চি পরিমিত নলটী দাঁড় করাইয়া, উহার এক মুখে লোহঢাকনি আঁটিয়া দিলাম ; তৎপরে ইহাকে আড়ে এইরূপ ভাবে ক্ল্যাংক করিয়া দিলাম,—
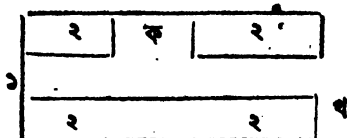
এইবার দেখুন, ১ চিহ্নিত স্থান ঢাকনি-আঁটা। ২, ২, ২, ২ দুই লিখিত স্থান গুলি ৫০ ইঞ্চি লোহপাতের বড় নল। উহার ভিতর "খ" চিহ্নিত স্থানের নিকট হইতে ১ চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত ৫ ইঞ্চি পরিমিত লোহপাতের নলটী প্রবেশ করান হইয়াছে। এই নলটী উনান। "খ" চিহ্নিত স্থান দিয়া কয়লা দেওয়া হয়, "ক" চিহ্নিত স্থান দিয়া দগ্ধ কয়লার ধুম চিম্‌নী দিয়া উড়িয়া যায় এবং বিশুদ্ধ বায়ুও চিম্‌নি দিয়া আসিয়া আগুণ ধরাইবার সাহায্য করে। পরন্তু ২, ২, ২, ২ স্থানের ভিতর জলপূর্ণ থাকে। খ হইতে ১ চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত উনান ; উহার প্রবল অগ্নিতে ঐ স্থানগুলির জল ধুম হইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু পথ পায় না ; পথ না দিলে বোধ হয় লোহ বয়লারেরও নিস্তার নাই ; কেননা, উক্ত বয়লার ফাটিয়া চটিয়া যাইতে পারে। কাজেই জলের অন্তাবস্থা বাষ্পকে কৌশলে একটী পথ দিয়া, অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। এই বার যে স্থানে ইহাকে আনা হইল, সেখানে আনিয়াও সহজে তাহাকে ছাড়া হইল না। এই স্থানকে "এঞ্জিন" বলে। এখানে বাষ্প আসিয়া থাকিবার জন্য একটা পিপার মত লোহপাতের গর্ত্ত বিশেষ দেওয়া হইয়াছে। তাহার ভিতর আসিয়া বাষ্প বাহিরে যাইতে চায় ; নচেৎ উপদ্রব করিবার চেষ্টা করে। "আচ্ছা এস" বলিয়া মানুষ এই স্থান হইতে তাহাকে অপর একটা নলে পুরিয়া দিল। এই নলটা কৌশলে যেন পিচ্‌কারির ভাবে বসান। বাষ্প আসিয়া ইহার ভিতর হইতেও বাহিরে যাইবার চেষ্টা করে, এই জন্য আল্‌গা, কৌশলে বসান এই নল বাষ্পের সঙ্গে নিজেও বাহির হইয়া পড়ে ; বাহিরে আসিয়া তাহার সীমায় একটা ধাক্কা পায়। এই ধাক্কা খাইয়া সে পুনরায় তাহার ঘরের ভিতর যায়, সেখানেও বাষ্প থাকিতে দেয় না, তাহাকে পুনরায় বাহিরে বাহির করে। এ বেচারি আবার ধাক্কা খায়, স্বস্থানে যায়, আবার বাষ্প ইহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়। এই ধাক্কা খাওয়া

এবং বাষ্প ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেওয়া, এইরূপ ক্রমাগত হইলেই "চলার" কাজ হয়। এই নলের সংযোগে একখানি বড় চাকা থাকে; নলের চলাচলে চাকাখানি ঘুরিয়া পড়ে; তখনই অচল কল "চলিয়া পড়ে।" এ নল বোধ হয়, আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন, এবং এই চাকাও না দেখিয়াছেন, এমন নহে। রেলগাড়ির এঞ্জিনের মাঝের বড় চাকাই এই চাকা এবং যে নল বাহির হয় এবং ধাক্কা খাইয়া ভিতরে যায়, তাহাও রেলগাড়ির এঞ্জিনের চাকার নিকটেই আছে। রেলের এঞ্জিনের চাকার দুইদিকেই এই নল আছে, অতএব রেলের এঞ্জিন মাত্রেই "ডবল এঞ্জিন" জানিবেন। রেলগাড়ির বয়লার উপরে, এঞ্জিন পথের নিকট—চাকায়। ময়দার কল, তেলকল, চটকল, কাপড়-বুনা কল, ধানভানা কল প্রভৃতির বয়লার একস্থানে, তৎপরে অন্যস্থানে এঞ্জিন। এই এঞ্জিনে চাকা ঘুরিলে, সেই চাকায় চামড়ার ফিতা দিয়া অন্য একখানি চাকায় সেই ফিতা সংযোজিত করা হয়। ইহাতে সেই চাকাখানিও ঘুরে। পরন্তু এই চাকার বৃহৎ রডের গাত্রে যত ইচ্ছা চাকা দিয়া, (ইহাকেই আমরা চাকা কল বলিয়াছি) কাজের কলের চাকার সঙ্গে চামড়ার ফিতা যোগ করিয়া দিলেই কাজের কলে কাজ হইতে থাকে।

"কাজের কল কি বুঝিলাম না।" বয়লার, এঞ্জিন যেমন বুঝিলেন, উহাতে অর্থাৎ বয়লার এঞ্জিনে গম ভাঙ্গা, চাউল কাঁড়ান, চটবুনা বা কাপড় বুনা হয় না। এই সকল কাজের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কল আছে। তাহা স্বতন্ত্র ভাবে ক্রয় করিতে হয়। ইহা একটার স্থলে ১০টা হইতে ৫০টা বা যত ইচ্ছা বসাইয়া কাজ চালাইতে পারেন। ঐ চাকা কলের চামড়ার ফিতার সঙ্গে এই কাজের কলের ফিতার যোগ করিতে পারিলেই কাজ চলিবে, সেই ফিতা যত ইচ্ছা যোগ করিবেন, কাজ ততই অধিক চলিবে।

ষ্টীমের পরিমাণ আছে। এই জন্য বয়লারের সম্মুখে ঘটিকার ন্যায় যন্ত্র আছে। বয়লার শীতল হইয়া গেলে, উহা তাতাইতে বয়লার-বিশেষে দুই দিন হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত সময় লাগে। অনেক বয়লারে কয়লা বেশী পুড়ে। ষ্টীমার এবং রেলগাড়িতে কাজের কল নাই; নচেৎ এই এক যন্ত্রই স্থলে বাড়ীর ভিতর থাকিলে কল বলে, বোটের উপর তুলিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেই তাহাকে ষ্টীমার বলে, এবং রেল লাইনে ছাড়িয়া দিলেই তাহাকে রেলের গাড়ী বলে। ষ্টীমারের এঞ্জিনের সঙ্গে বরং কাজের যন্ত্র অর্থাৎ জল কাটা চাকা আছে, কিন্তু রেলের এঞ্জিনে কিছুই নাই। এই জন্যই রেলগাড়ীর কলকে

কেবল "এঞ্জিন" বলে। এ প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়লার ও এঞ্জিনের কিছু পরিচয় দেওয়া হইল। সময়ান্তরে একটী "কাজের কলের" কথা বলা হইবে।

কল ও তাহার কার্য্যকারিতা।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের কি স্থাবর কি জঙ্গম সমস্ত পদার্থেই প্রকাশ্যভাবেই হউক, কি অপ্রকাশ্যভাবেই হউক, অবিনশ্বর শক্তিপুঞ্জ নিহিত রহিয়াছে। এই শক্তি অসীম এবং অপরিমেয়। যে সূর্য্যকিরণ হইতে আমরা প্রতিনিয়ত আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইতেছি, ইহার অভ্যন্তরে কতশক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, কে বলিবে! এই যে বায়ুস্রোত অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইতেছে, ইহাই বা কতশক্তির আধার, কে তাহার নির্ণয় করিবে! এই নৈসর্গিক শক্তি আকর্ষণ করিয়া মানবের কার্য্যে নিয়োগ করাই ইঞ্জিনিয়ার-দিগের কার্য্য। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বজন-হিতকারী বৈজ্ঞানিকগণের বিজ্ঞানা-লোচনার ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। এই কার্য্যে যে জাতি যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, মানব-সমাজে তাহারা ততদূর উন্নত বলিয়া পরিচিত। আধুনিক আমেরিকা ও ইয়ুরোপই ইহার সাক্ষীস্থল। এই নৈসর্গিক শক্তি, জগতে নানা আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা—উত্তাপ-শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি প্রভৃতি। মানবের কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইলে এই শক্তি সমূহকে সময় সময়ে রূপান্তরে পরিণত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। মনে কর, এক স্থলে দহমান কয়লারাশি রহিয়াছে; উহাতে উত্তাপ-শক্তি যথেষ্ট আছে। কিন্তু উত্তাপে নৌকা, শকট প্রভৃতি চলে না; তাই এই উত্তাপ-শক্তি দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করাইতে হইলে ইহাকে "চালনা-শক্তিরূপে" পরিণত করিতে হইবে। শক্তির এই প্রকার রূপান্তর সাধনের নিমিত্ত নানাবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। এই সকল যন্ত্রকে সাধারণতঃ "কল" বলে। বাষ্পীয় কল (Steam Engine), তাড়িতোৎপাদক কল (Dynamo) প্রভৃতি এই জাতীয়। বাষ্পীয় কলে উত্তাপ-শক্তি চালনা-শক্তিতে পরিণত হয় এবং তদ্দ্বারা নৌকা ও শকট-চালন, ভূমিকর্ষণ, জলোত্তোলন প্রভৃতি তজ্জাতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। তাড়িৎযন্ত্রে "চালনা-শক্তি" বৈদ্যুতিক-শক্তিতে

পরিণত হয় এবং এই বৈদ্যুতিক শক্তিই আবার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র-সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণত হইয়া আলোক-প্রদান, শকট-চালন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

উপরোক্ত জাতীয় কল ব্যতিরেকে আর এক প্রকারের কল আছে, যাহাতে প্রযুক্তশক্তি রূপান্তরিত না হইয়াই কার্য্য সম্পাদন করে। এই জাতীয় কলের সহিত পূর্ব্বোক্তজাতীয় কলের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; কারণ ঐ জাতীয় কলে রূপান্তরিত শক্তি এই সকল কলে প্রযুক্ত হইয়াই কার্য্যকারক হয়। এতদ্ভিন্ন মানুষ কিংবা পশ্বাদির শক্তিতেও এই জাতীয় কল পরিচালিত হইয়া থাকে। এই জাতির অন্তর্ভুক্ত কল বহুবিধ, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

১ম শ্রেণী—প্রযুক্ত শক্তিতে দিক্‌বিশেষে, কি ভাব-বিশেষে পুনঃ প্রয়োগ করা এই শ্রেণীর কলের কার্য্য। মনুষ্যপদচালিত কুঁদ কল (Lathe) ইহার উদাহরণস্থল। এস্থলে কলে প্রযুক্ত মনুষ্য-শক্তি ঊর্দ্ধাধঃ পরিচালনশীল, কিন্তু তৎসাহায্যে সৃষ্ট গতি ঘূর্ণীগতি, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

২য় শ্রেণী—দুর্ব্বল-শক্তির প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত প্রবল-শক্তিসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য এই শ্রেণীর কলের আবশ্যক হয়। ক্ষীণশক্তি প্রয়োগে দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহা মনে করিতে হইবে না যে, এই সকল কলে স্বতঃ শক্তি উৎপন্ন হইয়া কার্য্যে সহায়তা করে। ইহাতে অল্পশক্তি দ্বারা কঠিন কার্য্য সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু উহা সম্পন্ন করিতে অত্যধিক সময়ের আবশ্যকতা হয়। যে স্থলে প্রবল শক্তিপ্রয়োগ সম্ভব, সেরূপ স্থলে এই শ্রেণীর কলের কোনও প্রয়োজন হয় না। যেখানে প্রযুক্তশক্তি ক্ষীণ, কিন্তু কার্য্য কঠিন, সেই স্থলেই এই শ্রেণীর কল ফলোপদায়ক হয়। মনে কর, এক জন মনুষ্যকে গুরুভার কোনও পদার্থ নিম্নভূমি হইতে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতে হইবে। শুধু হাতে চেষ্টা করিলে কখনও সে এই কার্য্যে সফলকাম হইতে পারিবে না। কিন্তু কয়েকটী কপিকল ও এক গাছি শক্ত রজ্জুর সাহায্য লইলে, সে স্বকীয় দৈহিক শক্তিতেই ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে, তবে তাহাকে একটু অধিক সময় ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে। দীর্ঘদণ্ডের সাহায্যে অতি গুরুভার দ্রব্যও স্থানান্তরিত করা যায়,

ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ষ্টিমার প্রভৃতিতে নোঙ্গর তুলিবার জন্ত যে ক্যাপস্তান্ (Capstan) এবং হাল ঘুরাইবার জন্ত যে চক্র ব্যবহৃত হয়, সে সকলও এই জাতীয় যন্ত্রের সহজ উদাহরণস্থল।

উপরে যে বিবরণ প্রদত্ত হইল, আশা করা যায়, উহা হইতে সকলেই "কল" যে কি পদার্থ, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিবেন। কল বহুবিধ এবং উহাদের নির্ম্মাণ-কৌশলও অসংখ্য। সে সকল বিষয়ের আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অনেকের ধারণা যে, কলের স্বকীয় কার্য্যকরী শক্তি আছে এবং সেই জন্তই সকল কলে কার্য্য শীঘ্র সুসম্পন্ন হয়। বাস্তবিক কলে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা উহাতে প্রযুক্ত নৈসর্গিক শক্তি বলেই সাধিত হইয়া থাকে; কল ঐ শক্তির যথাবিহিত প্রয়োগে সহায়তা করে মাত্র। অধিকন্ত এই প্রযুক্ত শক্তিরও কিয়দংশ অযথা ব্যয় হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির প্রয়োগে যে কল হইতে যত অধিক কাজ পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে কলে শক্তির অপচয় যত কম হয়, সেই কল তত উৎকৃষ্ট।

এতৎপ্রসঙ্গে আর একটী বিষয়ের অবতারণা করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কিছুদিন হইল, কোনও সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, টালিগঞ্জে প্রোফেসর বসু এক কলের লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা চালাইবার জন্ত কোনরূপ বাষ্পীয় কিংবা বৈদ্যুতিক যন্ত্র অথবা গবাদি পশুর প্রয়োজন হইবে না। মানুষের শারীরিক শক্তিতে পরিচালিত হইয়াই এই লাঙ্গল শীঘ্র ও সহজে ভূমিকর্ষণ সম্পন্ন করিবে। এই বিবরণ কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সহজে বুঝা যায়। যে কোন কার্য্য করিতেই শক্তির প্রয়োজন; শক্তিপ্রয়োগ ভিন্ন কার্য্য হয় না। কার্য্য যত কঠিন হইবে, তৎসাধনে নিয়োজিত শক্তিও তদনুরূপ প্রবল হওয়া আবশ্যক; সুতরাং মানুষের সামান্ত শক্তির প্রয়োগে প্রবলশক্তিসাধ্য কর্ষণ-কার্য্য শীঘ্র এবং সহজে সম্পন্ন হইবে, ইহা কথনও সম্ভব নহে। আমাদের দেশে গরু কিংবা মহিষে যে সময় মধ্যে যে পরিমাণে ভূমি কর্ষণ করে, সেই সময়ে তৎপরিমিত কিংবা ততোধিক ভূমি কর্ষণ করিতে হইলে, হয়, প্রাগুক্ত প্রথম-জাতীয় কোনরূপ কলের সাহায্য লইতে হইবে, নতুবা কলচালনকারী ব্যক্তিকেই গবাদির সদৃশ পরিশ্রম করিতে হইবে। প্রোফেসর বসুর লাঙ্গলে যখন শুধু মানবের শারীরিক শক্তিতেই দ্রুত ভূমিকর্ষণ হইবে,

তখন কর্ষণকারী ব্যক্তিকে যে সর্ব্বতোভাবে গরুর স্থান অধিকার করিতে হইবে, সে বিষয়ে বোধ হয় কোনও সন্দেহ নাই। গবাদির কার্য্যভার মানুষের স্কন্ধে চাপাইলে কি লাভ হইবে, তাহা আবিষ্কর্ত্তাই বলিতে পারেন। আমাদের দেশে নূতন-আবিষ্কার-চেষ্টায় কাহারও মনোযোগ দেখা যায় না। প্রোফেসর বসু যদি প্রকৃত কার্য্যোপযোগী কোনও রূপ যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে তাহা নিতান্তই সুখের বিষয় হইবে।

মানব-সমাজের শৈশবাবস্থায় সর্ব্বত্র সকল কার্য্যই হস্ত-সাহায্যে সম্পন্ন হইত। ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত আয়াসসাধ্য কার্য্যে গবাদি পশুর প্রয়োগ প্রচলিত হয়। ইহাদের সাহায্যে শ্রমসাধ্য কার্য্যগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা কতকটা সহজে সম্পাদিত হইত। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব-লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত যন্ত্রই মানবের অথবা গবাদির শক্তি সাহায্যেই চালিত হইত। মানুষ অনেক দিন পর্য্যন্ত অপর কোনও নৈসর্গিক শক্তি কার্য্যে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, ঐ সময়ে উচ্চশ্রেণীর শিল্পকার্য্যাদি হইত বটে, কিন্তু ঐ সকল সম্পন্ন করিতে প্রচুর সময় ও রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইত। তৎপরে ইয়ুরোপীয়গণ এ বিষয়ে যুগান্তর আনয়ন করেন। তাঁহারাই প্রথমে নৈসর্গিক শক্তি আকর্ষণ করিয়া মানবের কার্য্যে নিয়োগ করিবার পন্থা প্রদর্শন করেন। মানুষের শারীরিক শক্তি অতি সামান্য, কিন্তু ইহার মূল্য অধিক। অপরন্তু নৈসর্গিক শক্তি অতি প্রবল এবং ইহা একরূপ বিনামূল্যে পাওয়া যায় বলিলেও চলে। এই জন্যই মনুষ্যহস্তচালিত যন্ত্রে নির্ম্মিত দ্রব্যাদি অপেক্ষা বাষ্পীয় অথবা বৈদ্যুতিক কলে নির্ম্মিত জিনিষ অনেক সুলভ। মার্কিন রাজ্যে কোনও স্থলে জল-প্রপাতের প্রচণ্ড বেগশালী জলরাশির সাহায্যে তাড়িৎ যন্ত্র পরিচালিত করিয়া, প্রবল-তাড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা হয়। ঐ তাড়িৎপ্রবাহ তার সাহায্যে বহুদূরে চালিত হইয়া নানারূপ কার্য্যে নিয়োজিত হয়। এই তাড়িৎশক্তি সংগ্রহে ব্যয় খুব অল্প, সুতরাং ইহা দ্বারা নিষ্পন্ন কার্য্যসমূহও সামান্য ব্যয়ে নির্ব্বাহ হয়। এইরূপ বিনামূল্যে লভ্য বায়ুপ্রবাহের সাহায্যেও নানাস্থানে নানারূপ কল পরিচালিত হইয়া থাকে। এই সকল কলের নির্ম্মাণব্যয় অধিক বটে, কিন্তু এতৎসাহায্যে নৈসর্গিক শক্তি প্রয়োগে কার্য্য যেরূপ সহজে সম্পন্ন হয়, তাহাতে পরিণামে প্রচুর লাভ দাঁড়ায়। আমাদের দেশে নৈসর্গিক শক্তির অভাব নাই, কিন্তু

তাহা মানুষের কাজে লাগাইতে কাহারও বড় দেখা যায় না। অর্থাভাবেই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে কল কারখানার একান্ত অভাব। দেশে যাহা কিছু শিল্পকার্য্য আছে, তাহাও শুধু কায়িকশ্রমেই সম্পন্ন হয়; সুতরাং বিদেশীয় কল কারখানার প্রতিযোগিতায় উহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশবাসী কেহ কেহ কারখানা স্থাপন করিয়া দেশে সুপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। দেশীয় ধনবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই উঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে যে শুধু দেশের উপকার হইবে, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও অর্থাগমের পথ পরিষ্কৃত হইবে। হায়! আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, পরিধেয় বস্ত্রখণ্ডের জন্যও বিদেশীয় মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়!

শ্রীবিমলাচরণ সেন গুপ্ত, — শিবপুর কলেজ।

টমাস লিপ্‌টন।

টমাস্ লিপ্‌টন স্কট্‌লণ্ডের অন্তর্গত গ্লাস্‌গো নগরে দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। লিপ্‌টন্ অতি বাল্যে গ্লাস্‌গো নগরের এক দোকানে যৎকিঞ্চিৎ বেতনে, সংবাদবাহক ভৃত্যের পদে নিযুক্ত হইয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে পিতা মাতাকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য হন। পিতা মাতাকে সুখী করিবার জন্য তিনি পঞ্চদশবর্ষ বয়সে আমেরিকায় গিয়া, কোন কারখানায় কাজ করিয়া অল্পকাল মধ্যে তিন হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। পরে গ্লাস্‌গো নগরে প্রত্যাগমন করিয়া খাদ্য দ্রব্যাদির একখানি ক্ষুদ্র দোকান খুলিয়া বসেন। সেই সামান্য দোকানই ক্রমে বৃহৎ গোলদারী দোকানে পরিণত হয়। পরে স্কট্‌লণ্ডের অন্যান্য নগরেও দোকান স্থাপন করেন। ক্রমে ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড এবং অন্যান্য দেশে তাঁহার ব্যবসায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এখন তাঁহার কারবার পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চলিতেছে।

লোকের খাদ্যপেয়াদির সুবিধা করিয়া দেওয়াই লিপ্‌টনের কারবারের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যবসায়ের দ্রব্য যাহাতে সুলভ হয়, সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি। সকল দ্রব্যই তাঁহার কারখানায় অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয়;

এই জন্যই তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে জিনিষ পত্র কিনিতে পান; সুতরাং সকল দ্রব্যই সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেও পারেন। তাঁহার নানাস্থানের নানাবিধ কারখানায় নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট চা সুলভে বিক্রয় করিবার জন্য লিপ্টন সিংহলে চা-বাগিচা করিয়াছেন। এই জন্যই লিপ্টনের চা উৎকৃষ্ট হইয়াও দুর্ম্মূল্য নহে। উৎকৃষ্ট ফলমূলের জন্য তিনি দেশ বিদেশে বৃহৎ বৃহৎ উদ্যান করিয়াছেন। তাঁহার কারবারের অনেক দ্রব্যই তাঁহার নিজের কারখানায় প্রস্তুত হয়। নানাবিধ কাগজ, টীনের পাত ও চাদর তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। নানাবর্ণের লেবেল, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি তাঁহার নিজের ছাপাখানাতেই মুদ্রিত হয়। পৃথিবীর প্রায় প্রধান প্রধান সকল নগরের রাজপথে লিপ্টনের নানাবিধ শকটাবলী তাঁহারই দ্রব্য সামগ্রী বহন করিতেছে; প্রায় সমস্ত রেলে লিপ্টনের স্বতন্ত্র গাড়ী যাতায়াত করিতেছে; জলপথে লিপ্টনের বহুসংখ্যক অর্ণবযান তাঁহার দ্রব্যাদি লইয়া ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীর সকল স্থানের উৎকৃষ্ট ও সুলভ দ্রব্যজাত তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন কারবার স্থানে প্রেরিত, সঞ্চিত ও বিক্রীত হইতেছে। তাঁহার কারবারের আনুষঙ্গিক দ্রব্যই বা কত? চার পুলিন্দা ও বাক্সের আবরণ খুলিয়া যে টীন বাহির হয়, তাহা বিক্রয় করিয়া প্রতি বৎসর ৭৫ হাজার টাকা খাতায় জমা হয়। কি বিরাট ব্যাপার! বস্তুতঃ তাঁহার কারবারের তুলনা নাই। লিপ্টনের এক একটি কারবার দেখিলে বোধ হয়, যেন এক একটী সহরের এক একটী হাটবাজার। এক কথায় লিপ্টন মহাজনের মধ্যে সম্রাট্।

লিপ্টনের অনন্য-সাধারণ হৃদয় ও মস্তিষ্ক এই অভূতপূর্ব্ব উন্নতির মূল। বিশাল কার্য্যক্ষেত্রের অসংখ্য কর্ম্মচারীকে আয়ত্ব, অনুরক্ত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রাখিয়া লিপ্টন বাণিজ্য রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। অসাধারণ লোক-চরিত্রাভিজ্ঞতা নিবন্ধন কর্ম্মচারি-নির্ব্বাচনে যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় ব্যবসায়ের অদ্ভুত উন্নতি করিয়াছেন। কপর্দ্দক-শূন্য হইয়াও সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মবলে কোটীশ্বর হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণ আছে বলিয়াই এইরূপ বিস্ময়কর কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন। তিনি নিজের সমস্ত কর্ম্মচারীকেই ব্যবসায়ের অংশী করিয়াছেন। অল্পদিন হইল, তাঁহার ব্যবসায় "লিপ্টন-কোম্পানি" নামে যৌথকারবারে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক অংশের মূল্য ১৫৲ টাকা করিয়া স্থিরীকৃত হয়। প্রথমে ১৫ সিকা মাত্র দিলেই অংশী হওয়া যাইত; কিন্তু অংশের

ধর দিন দিন বাড়িয়াছিল। এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় ৭৫ কোটি টাকার অংশীদার উপস্থিত হইয়াছিল।

লিপ্টন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরার্থপরতা প্রদর্শন করিয়া বহুলোকের ধনাগমের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। স্বীয় ব্যবসায়ের জন্য নানাবিধ শিল্পাগারের প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্পের উন্নতি উপলক্ষে অসংখ্য শিল্পীর অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন।

উপার্জ্জিত ধনের সদ্‌ব্যয় করিতেও ইনি কুণ্ঠিত নহেন। কথায় কথায় লক্ষাধিক টাকা পরার্থে ব্যয় করিয়া থাকেন। মহারাণীর জুবিলি-দিবসে দরিদ্র-ভোজনের টাকার অভাব দেখিয়া লণ্ডনের মেয়রপত্নীর হস্তে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সমর্পণ করেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরে দীন হীনদিগের সুলভ ভোজনাগার প্রতিষ্ঠা-কল্পে যুবরাজ-মহিষীর হস্তে ১৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। দানের গুণে টমাস্ লিপ্টন 'নাইট' উপাধি লাভ করিয়া "স্যার টমাস্ লিপ্টন" হইয়াছেন এবং রাজা ও রাজমন্ত্রিদিগের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছেন। এখন জন-সমাজে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির ইয়ত্তা নাই।

"অকাতরে পরিশ্রম কর, সাধুপথে থাকিয়া সাহসী হও; ক্ষুদ্র বৃহৎ, সাধারণ অসাধারণ, সকল-বিষয়ই বুদ্ধির চালনা দ্বারা সাধন করিতে তৎপর হও, আর অকাতরে কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন দিতে থাক; তাহা হইলেই কার্য্য সফল হইবে। ব্যবসায় বাণিজ্যের ইহাই স্পর্শমণি।" এই উপদেশই লিপ্টনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র অনুসারে কার্য্য করা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর অবশ্য-কর্ত্তব্য। ফলতঃ ইহা মানব মাত্রেরই মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিশ্বাস।

গুজরাতি ভাষা।

সংস্কৃত ভাষা এখন ভারতের মৃত ভাষা। কিন্তু এই ভাষা হইতে তেলেগু, হিন্দি, গুজরাতি, বাঙ্গালা, উড়িয়া, সিন্ধী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষার উৎপত্তি। কচ্ছপ্রদেশের মুসলমানদিগের ভাষা গুজরাতি। ইহারা কলিকাতায় কাথোদা নামে পরিচিত। পরন্তু দ্বারকা প্রভৃতি হিন্দুস্থানের ভাষাও গুজ-

রাতি। পার্সীজাতির ভাষাও গুজরাতি ভাষা; কিন্তু মুসলমান এবং হিন্দু-দিগের গুজরাতি ভাষায় অধিকাংশ স্থানে অনৈক্য। এ প্রবন্ধে দ্বারকার হিন্দুদিগের গুজরাতি ভাষার কথা বলা যাইতেছে। এই ভাষার সহিত হিন্দি ও বাঙ্গালার অনেক শব্দের সৌসাদৃশ্য আছে। কোন কোন শব্দ অবিকল বাঙ্গালার সঙ্গে মিল আছে; তাহা পরে দেখাইতেছি। "এই" গুজরাতি ভাষা শিক্ষা করা বাঙ্গালীর পক্ষে তত কঠিনকর নহে।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের বাঙ্গালাভাষার ভিতর গদ্য প্রবন্ধ যেমন ছিল না, এই গুজরাতি ভাষাও ঐরূপ ছিল। কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, গোবিন্দ-দাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম হইতে ইদানীং দাশুরায় পর্য্যন্ত বাঙ্গালার পদ্যের কবি; এই গুজরাতি ভাষাতেও সেইরূপ নরসিংহ, প্রেমানন্দ, অখোভক্ত, শামলভক্ত, ব্রহ্মানন্দ, দয়ারাম হইতে মীরাবাই পর্য্যন্ত গুজরাতি ভাষার পদ্যের কবি। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্য যেমন রাজা রামমোহন, অক্ষয়-কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণের কৃপায় গঠিত, সেই রূপ এই গুজরাতি সাহিত্যের গদ্যও নর্ম্মদাশঙ্কর, নীলকণ্ঠ, করসনদাস, গোবর্দ্ধনরাম, মাধবরাম, মণিলাল প্রভৃতি মহাত্মাগণের কৃপায় গঠিত। আজ কাল বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরাজী, ফ্রান্স, পার্সি প্রভৃতি ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তকাদি যেমন ভাষান্তরিত হইতেছে; এই গুজরাতি সাহিত্যেও তেমনি আজকাল বাঙ্গালা, ইংরাজী, প্রভৃতি ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল ভাষান্তরিত হইতেছে। বাঙ্গালীরা যেমন এম-এ, বি-এ, পাস করিতেছেন, বিলাত যাইতেছেন, ইহারাও সেইরূপ করিতেছেন।

মালা লইয়া নাম জপ করিয়া—
মালগ্রহী নামলীধে।
করে, করিয়া—লীধে, থকী।
সব—সহু।
না দেখা—জোয়ো।
ছেলেবেলা—নানাপণে।
যৌবন—জোবন।
বৃদ্ধ—ঘড়।
অবস্থা—পণ।
কে—কৈনে।
পাঠাইল—মোকল্যু।
ভাবিতাম—জাণ্যুঁ।
চিরকাল—সোকান।
যাহা—নোতুঁ।
চাহিতাম—জোইতুঁ।
তাহা এল—আবিয়ুঁরে।
ইহার জন্য—নোতি।
অভিলাষ ছিল না—জোই তারী বাট।
যে পর্য্যন্ত—জ্যাঁরী।
সে পর্য্যন্ত—ত্যাঁরী।

চিন্—চিন্তো।
না—নহীঁ।
মিথ্যা—ঝুঠা।
তোমার—তারো।
এরূপ—এম।
বৃথাগেল—এয়েরো।
যেমন—যাবৎ শী।
খায়া—জেম।
কোঁটা—বৃটী।
কি হইল—ও থযঁ।
হইতে—থকী।
করিয়া—বাঁধে।
রাখিয়া—কাঁধে।
বড়—বাঁল।
জটা—লোচন।
তপতীর্থ করে—
তপনেতিরথ-কীধাথকী।
দূর হউক—এবটেব।
অল—হজে।
কাঁপে—ধ্রজে।

বাঙ্গালার সহিত গুজরাতি মিলিত শব্দ।

সাধনা—সাধনা।
মানুষ—মানুষ।
সেই—সেহ।
বৃষ্টি—বৃষ্টি।
স্নান—স্নান।
সেবা—সেবা।
পূজা—পূজা।
দান—দান।
এলাচ—এলাচ।
জটা—জটা।
লেপন—লেপন।
জন্ম—জন্ম।
গঙ্গাজল—গঙ্গাজল।
ভেদ—ভেদ।
জন্ম—জন্ম।
আত্মাতত্ত্ব—আত্মাতত্ত্ব।
সব—সর্ব্ব।
থেকে—রহি।
পান—পান।
জানে, জানিয়া—জেনে।
রাগ বা রাগিনী—রাগনে।
হারাইল—খোয়া।
ঘরের—ঘরমা।
প্রত্যহ—রোজ।
রাবড়ী (খাদ্য বিশেষ)—রাবড়ী।
চক্ষে—আঁখেতে।
শরীর—কায়া।

কটকে চাউলের কাজ।

উড়িষ্যা বিভাগের প্রধান কৃষি হইতেছে,—চাউল। বঙ্গের মত উড়িষ্যা-চাউলের বীজ-ধান্য ভাল নহে, বঙ্গে যেমন খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চাউল হয় এবং তাহার বর্ণ পরিষ্কার সাদা হয়, উড়িষ্যা বিভাগের চাউলে এরূপ যদিও আছে, কিন্তু পরিমাণে বেশী নহে। মোটা চাউল, তাহার বর্ণ লোহিত, ইহাকে "কাজলা" চাউল বলে। কটকের কাজলাকে বালেশ্বরে "কারবা" বলে। ইহার সাদা জাতিকে "সাফি কাজলা" বলা হয়। ইংরাজীতে ইহাকে "কুলিরাইস্" বলে; অর্থাৎ এই চাউল দরিদ্র কুলিরা খাইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা মদ হয়। এই চাউল রাশি রাশি বিদেশে সিপ্‌মেণ্ট হয়। ইহার গ্রাহক অনেক। মহাজনবন্ধু সম্পাদক যখন মান্দ্রাজ যাত্রা করেন, তখন মেদিনীপুর, বারিপদা, বালেশ্বর, রেমুনা, জাজপুর, কটক, গঞ্জাম, বহরমপুর, নৌপদা, পারলাখেমিডি প্রভৃতি দেশ-গুলি পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলেন যে, এই কাজলা চাউল ঐ সকল দেশ হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদেশী জাহাজে রপ্তানী হয়। ইংরাজ, লাখদার এবং গুজরাতি বেণিয়ারা এই চাউল ঐ সকল দেশ হইতে ক্রয় করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে গঞ্জাম, বহরমপুর হইতে এই শ্রেণীর চাউল স্থানীয় সমুদ্রপোতে রপ্তানি হয়; অর্থাৎ গঞ্জাম, বহরমপুর, নৌপদা প্রভৃতি স্থানগুলি সমুদ্রতীর হইতে বেশী দূর ব্যবহিত নহে; এজন্য ঐ সকল প্রদেশে লাখদাগণ কারবার খুলিয়া উহা ক্রয় করিয়া কলম্বো, এডেন প্রভৃতি দেশে, সময় সময়ে মরিশস্ দ্বীপেও এই চাউল চালান করিয়া থাকেন। এই জন্য এই দেশগুলির চাউল কলিকাতায় আনিয়া বিদেশে বিক্রয় করিবার সুযোগ সুবিধা প্রায় হয় না, তবে বাজার দর নরম গরম অনুসারে সময়ে সময়ে উহা কলিকাতা হইতে বিক্রয় হইতে পারে। কটকের অবস্থা এ সম্বন্ধে মাঝামাঝি অর্থাৎ কটক হইতে লাখদারেরা উহা ক্রয় করিয়া বিদেশে পাঠান এবং কটকের ঐ চাউল কলিকাতায় আনিয়াও বিক্রয় করা চলে। বেঙ্গল নাগপুর রেলের ভাড়ারও স্থানে স্থানে বিলক্ষণ ইতর-বিশেষ আছে। এই ইতর-বিশেষের কারণ উক্ত রেল কোম্পানীর দোকানদারী মাত্র, অর্থাৎ যে সকল স্থানে দেখিবেন, জাহাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, সে সকল স্থানে উক্ত রেল কোম্পানীর ভাড়াও শস্তা। যে সকল স্থানে জাহাজী প্রতিযোগিতা

নাই, তথায় রেলের ভাড়াও বেশী। যেমন কটক হইতে ১৭০ বস্তা এক ওয়াগান চাউলের ভাড়া ৪৯৲ টাকা। কিন্তু জেনাপুর কটক ষ্টেষণের বহু নিম্ন স্থানে হইলেও উহার এক ওয়াগন ১৭০ বস্তা চাউলের ভাড়া ৮৪৷৶০ আনা মাত্র। অর্থাৎ কটকে বোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তাই ভাড়া কম; জেনা-পুরে উহা নাই, অতএব ভাড়া বেশী। রেল ভাড়ার প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে ইহার পড়তা বেশী হইবে। কটকের নিম্ন ষ্টেষণ গুলির চাউল কলিকাতায় আসিয়া বিক্রয় হয়। কটক বলুন, গঞ্জাম বলুন, আর বহরমপুরই বলুন, প্রবল ধনী না হইলে ঐ সকল স্থান হইতে মাল ক্রয় করিয়া বিদেশে পাঠাইবার সুবিধা হয় না; কেননা ঐ সকল প্রদেশে ব্যাঙ্কের সুবন্দোবস্ত নাই, এবং সমুদয় ব্যবসায়ী প্রবল ধনী নহেন। যাঁহারা প্রবল ধনী নহেন, অথচ উঁহাদের সমকক্ষ ভাবে কার্য্য চালাইতে হইলে ব্যাঙ্কের আশ্রয় লইতে হয়। নিম্ন শ্রেণীর ধনবানেরা মাল জাহাজে বোঝাই দিয়া, উক্ত চালান আনিয়া ব্যাঙ্কে মাল বন্ধক দিয়া টাকা লয়েন। পরে ব্যাঙ্ক-ওয়ালারা সেই জাহাজী চালান বা রসিদ এবং হুণ্ডি লইয়া কলম্বো, এডেন প্রভৃতি দেশের চালান কর্ত্তার আদেশে সেই স্থানীয় মহাজনের নিকট হুণ্ডির টাকা লইয়া, মালের রসিদ দিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কাজ কলিকাতা হইতে যেমন হয়, অন্য স্থান হইতে তত সুবিধা নয়। কাজেই এই সকল কারণের জন্য অনেক বিদেশী গ্রাহক কলিকাতা হইতে মাল লইতে বাধ্য হয়েন। ইহার সবিশেষ তাৎপর্য্য মহাজনবন্ধু সম্পাদক অবগত হইয়া আসিয়া, সম্প্রতি ২রা মাঘ ইনি দুইজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে পরামর্শ দিয়া এবং নিজে তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া কটকে লইয়া গিয়া, তথায় প্রবল ভাবে এক চাউলের কার্য্য খুলিয়া দিয়াছেন, এবং কলিকাতার নিকট রামকৃষ্ণপুরে B. N. Ry. সালিমার ষ্টেষণের নিকট (এমন কি সালিমারে যে ভাড়া, রামকৃষ্ণপুরের ভাড়াও তাই; পরন্তু এইস্থান হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই চাউল বিদেশ যায়।) চাউলের এক বৃহত আড়ত খুলিয়াছেন। এই আড়তে কেবল কাজলা চাউল নহে, সর্ব্বপ্রকার, সর্ব্বদেশের চাউল বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। মহাজনবন্ধু সম্পাদক প্রায়ই বলিয়া থাকেন, যে কাজে সিপ্‌মেণ্ট নাই, সে কাজ এদেশের মরা কাজ। চাউলের সিপ্‌মেণ্ট আছে, কাজেই ইহা তাঁহার বড়ই মনোমত কাজ।

কাজলা চাউলের কাজ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ১ম, যে চাউল হস্ত দিয়া দেখিলে ঠাণ্ডা বোধ হইবে, অথবা

বস্তার ভিতর হস্ত পুরিয়া দিলে গরম বোধ হইবে, তাহা ভিজা চাউল। উহার জল শুকাইলে পরিণামে ওজন কমিবে। ২য়, কাজলা চাউল মাত্রেই প্রায় ধান মিশান থাকে, তবে ভাল কাজলায় অল্প, নচেৎ কম দরের কাজলায় ধান বেশী। ধান যত কম হইবে, ততই দর বৃদ্ধি হইবে। সাফি অর্থাৎ সাদা কাজলার দর, কাল বা লালবর্ণের কাজলা অপেক্ষা দর অনেক বেশী। ৩য়, কলিকাতার ওজন ৮০ শিক্কা অর্থাৎ ৮০ টাকায় /১ সের। কটক প্রদেশ গুলির স্থানে স্থানের ওজন ১০৫ শিক্কা অর্থাৎ ১০৫ টাকায় /১ সের হয়। ওজন খতাইয়া কলিকাতার সঙ্গে দরের পড়্‌তা করিবে। কটকের ওজন ১০৫ শিক্কা। ইহা ভিন্ন আরও প্রতি বস্তায় মনকরা /২ সের বাদ পাওয়া যায়। এই বাদ বা যাহা বেশী ধরিয়া পাওয়া যায়, তাহা কলিকাতার গ্রাহককে ধরিয়া দিতে হয়। এ সম্বন্ধে অপরাপর অনেক কথা অন্য প্রবন্ধে শেষ করিব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পাল।

সব্-মেরিণ।

সমুদ্রের জলের ভিতরে রাখিয়া লুক্কায়িতভাবে চালান যাইতে পারে, এরূপ জাহাজকে "সব-মেরিণ" (Sub-marine) বলে। মার্কিণেরা ঐরূপ যে যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করেন, তাহা শুশুকের মত জলের ভিতর ঢুকিয়া যায়। ইংরাজেরাও ঐ ধরণের জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজদিগের সামুদ্রিক যুদ্ধ সম্বন্ধে অপরকে আক্রমণ করাই স্থির ব্যবস্থা—নিজেদের উপকূলে শত্রুকে আসিতে দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা উহাঁরা করেন না। সুতরাং উহাঁদের জাহাজ যাহাতে অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, এরূপ হওয়ার প্রয়োজন। উহাঁরা মার্কিণ আদর্শ হইতে নিজেদের প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। উহাঁদের এখনকার নূতন ধরণের "সব্‌মেরিণ" অন্য জাহাজের ন্যায় সমুদ্রের উপরেই চলে। শত্রুর সমীপস্থ হইলে তবে জলে ঢুকিয়া গিয়া, উহার জাহাজের দু'হাজার গজের মধ্যে পৌছিয়া টরপিডো ছুঁড়িতে পারে। দু'রকম কল আছে। জলের ভিতরে লুক্কায়িত অবস্থায় ব্যবহৃত কল তাড়িতে চলে; উপরে যাতায়াত

সময় ব্যবহৃত কল পেট্রোলিয়মে চলে। ক্রমেই এই জাহাজগুলি বৃহৎ ও বৃহত্তর করা হইতেছে।

ফরাসিরাও ইংরাজদিগের ধরণের জাহাজ করিতেছেন। উহাঁরা প্রথমে আত্মরক্ষার উপযোগী শত্রুর জাহাজ আসিলে নিকটস্থ বন্দর হইতে বাহির হইয়া জলের ভিতরে ভিতরে উহাদের আক্রমণ করিতে যাওয়ার উপযুক্ত ছোট ছোট সবমেরিণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এখন উহাঁরা চরবার্গের বন্দরে যে সকল সবমেরিণ রাখিতেছেন, তাহারা অনায়াসে ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী ইংলণ্ডের পোর্টস মাউথ বন্দরে পৌছিয়া টরপিডো ছুঁড়িয়া জাহাজ ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে। জর্ম্মণ এখনও "সবমেরিণ" প্রস্তুত করেন নাই। রুষিয়া এ পর্য্যন্ত উহার "বল্টিক জাহাজ প্রস্তুতের কারখানা" হইতে একখানি মাত্র ঐরূপ জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ যে, ঐ জাহাজ কয়েক দিন পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখা যায় এবং জলের ভিতরে ঘণ্টায় ৮ নট বেগে যাইতে পারে। উহার সম্বন্ধে সকল কথা ঠিক জানা যায় নাই।

ফরাসীরাই এই নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। ফাসোদা লইয়া যখন ইংরাজের সহিত বিবাদ হয়, তখন ফরাসীদিগের একান্তই ইচ্ছা হইয়াছিল যে, যদি কোন উপায় এমন বাহির করা যায় যে, ইংরাজের সামুদ্রিক প্রাধান্যের উপর একটা দারুণ আঘাত করিতে পারে, তাহা হইলে উহারা বড়ই সুখী হয়। জীবনীশক্তিসম্পন্ন জাতির মধ্যে একটা প্রবল জাতীয় ইচ্ছা উদ্রেক হইলেই উহার মধ্যে বুদ্ধিমান ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তিগণ তৎসম্বন্ধে একাগ্রতা সহকারে যত্ন করিয়া থাকেন। ফরাসি শিল্পী ও পণ্ডিতেরা ঐ সময়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া মাথা ঘামাইয়া অর্থ ব্যয় করিয়া সবমেরিণের আবিষ্কার করিলেন। এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ জাহাজ প্রস্তুত হইবে এবং যুদ্ধকালে জাহাজ চড়া একটা বড়ই আতঙ্কের জিনিস হইয়া পড়িবে। দিন নাই, রাত্রি নাই—চারিদিকে কোথাও কিছুই দেখিতে না পাওয়া গেলেও সবমেরিণ ভিতরে ভিতরে হয়ত আসিতেছে, এই আশঙ্কায় নাবিকদিগের উপর বড়ই একটা কু-ভাবনার চাপ ক্রমাগত থাকিবে। আসলে ক্ষতি যত না করুক, যোদ্ধাদিগকে দিনরাত্রি সশঙ্কিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে একটুও নিদ্রা যাইতে না দিয়া "সবমেরিণ" বিশেষ ক্ষতি করিবে।

এডুকেশন গেজেট।

টাইমপিস্ ঘড়ি মেরামত।

ইহাকে আমেরিকান টাইমপিস্ কিংবা পেণ্ডুলেন-ওয়ালা ঘড়ি কহে। ইহাকে সাধারণে বাজা ঘড়ি বলিতে পারেন। সময় পিস্ করে অর্থাৎ রক্ষা করে বলিয়া ইহার নাম টাইমপিস্।

আমেরিকা, সুইজারলণ্ড, লণ্ডন হইতে আমদানী হয়। মার্কা, ম্যানসেলিয়া ও ইন্‌গ্রেহাম ইত্যাদি। দাম ৮৲ হইতে ১১৲ টাকা।

এ প্রবন্ধ একটী ঘড়ি লইয়া খুলিবার সময়, অথচ কেহ ঘড়ি মেরামত করিতেছেন—সেই সময়, কিংবা যিনি ইহা বুঝেন, তাঁহার ভাল লাগিবে। এক্ষণে শ্রবণ করুন,—

চূড়াওয়ালা ক্লক্—ইহার গ্লাসম্বার। এই গ্লাসম্বারকে ইংরাজীতে ভিজিল বলে। চূড়াওয়ালা ঘড়িতে কাষ্ঠ সার্সির দরজা থাকে। সার্সির কাচের মূল্য।০ লাগে।

ডায়েলের কাঁটার উপর একটী চাবি পিন দ্বারা আবদ্ধ। উহা প্লাস দ্বারা খুলিবে। ইহা খুলিয়া চাবিখানি তুলিবে। চাবি উঠিবে সোন্না দ্বারা। এই সোন্নাকে পিঞ্চ কহে। তৎপরে মিনিটের কাঁটা পিঞ্চ বা প্লাস দ্বারা উঠাইবে, তৎপরে ঘণ্টার কাঁটা তুলিবে।

ডায়েল ৩।৪টী স্ক্রু দ্বারা আবদ্ধ থাকে। তাহা স্ক্রু ড্রাইভার দ্বারা খুলিবে। পেণ্ডুলেন রড বা শিখ গাছটী যাহাতে আবদ্ধ আছে, তাহা ছুরি বা স্ক্রু ড্রাইভার দ্বারা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দিয়া উক্ত শিখ্ গাছটী তুলিয়া লইবে। তৎপরে ঐ শিখের সঙ্গে আবদ্ধ পালেটের সঙ্গে যে অপর একটী পিত্তলের তার লাগান আছে, সেই তারটী খুলিয়া লইবে। পালেটখানি যে পিনেতে আবদ্ধ আছে, তাহার পার্শ্বস্থিত অপর একটী তার চাপা আছে, সেই চাপাটী প্লাস দ্বারা সরাইয়া দিবে; তৎপরে পালেটখানি তুলিয়া লইবে। ইহা লইলে ঘড়ির সমস্ত দম অর্থাৎ স্প্রিং গাছটী খুলিয়া যাইবে।

ডায়েলের উপর দুইটী ছিদ্র আছে; উহার দক্ষিণ পার্শ্বের (যন্ত্রাদি সময় রাখিবার জন্ত) দম খোলা হইল। এইবার বাজিবার দিকের দম খুলিবার প্রথা,—

এই দিকের দম খুলিবার পূর্ব্বে স্প্রিং গাছটী দড়ি দিয়া বাঁধিবে।

ইহাতে বাজিবার যাট হুইল আছে। এই হুইলের উপর একটী কোদালের ন্তায় যন্ত্র আছে, ইহাকে "গ্যাজন পিস" কহে। গ্যাজন পিস্ অঙ্গুলির দ্বারা ক্রমাগত উচ্চে তুলিয়া ধরিবে। তাহা হইলে ক্রমাগত দম খুলিয়া যাইবে। দম

প্লেট হইলে দেখিবে, উহার খুঁটার মাথায় ৫টী পিন দ্বারা কিংবা ৫ খানি স্ক্রুওয়ালা চাকিগুলি বদ্ধ আছে। ক্রমান্বয়ে উক্ত পিন ও চাকি প্লাস দ্বারা এক একটী করিয়া খুলিবে। বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখিবে, যেন কিছুমাত্র উভয় পার্শ্বের দম খুলিতে বাকী না থাকে ; কারণ যদি দম খুলিতে বাকি থাকে, তাহা হইলে হস্তে আঘাত লাগিবার খুব সম্ভাবনা। এই উভয় পার্শ্বের হুইল দেখিতে প্রায় একই রূপ। যিনি ইহা ভাল না বুঝিবেন, তিনি যেন ঘড়ি খুলিবার পূর্ব্বে চলিবার এবং বাজিবার হুইলগুলিতে আপন ইচ্ছামত চিহ্ন করিয়া রাখিবেন ; তাহা হইলে আঁটিবার সময় সহজ হইবে। সমুদয় হুইল খোলা হইলে হুইলগুলি শিরিষ কাগজ দিয়া কেবলমাত্র উহার লোহা গুলি মাজিবে। এবং প্রত্যেক হুইলের মুখে একটী করিয়া পিনিয়ন অর্থাৎ যাহাতে ৮।১০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তার বেষ্টিত আছে, তাহা ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা বেশ করিয়া পরিষ্কার করিবে, তাহা হইলে নূতনের মত হইবে। তৎপরে নীচে ও উপরের ২ খানি প্লেটে অর্থাৎ যাহা দ্বারা কলগুলি আবদ্ধ ছিল, উক্ত প্লেট দুইখানিতে যতগুলি ছিদ্র আছে, প্রত্যেকটী সরু ন্যাকড়া পাকাইয়া সলিতার মত করিয়া উহার ভিতর দিয়া পরিষ্কার করিবে। বেশ পরিষ্কার করা হইলে আলোকের দিকে ধরিয়া দেখিবে, সমস্ত ছিদ্রগুলি পরিষ্কার হইল কিনা। পিত্তলের অংশ ব্রুস্ ও কাপড় দ্বারা বিশেষরূপে পরিষ্কৃত করিবে, যেন তৈল বা ময়লা না থাকে।

স্প্রিং পরিষ্কার। স্প্রিংয়ের যে অংশ খুঁটিতে আবদ্ধ ছিল, সেই অংশের মধ্যে এক গাছি দড়ি দিয়া কোন স্থানে বন্ধন করিবে। বামহস্ত দ্বারা স্প্রিং সংযুক্ত হুইলখানি ধরিয়া ক্রমান্বয়ে স্প্রিং খুলিতে থাকিবে এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহার ময়লানুসারে শিরিষ কাগজ, ন্যাকড়া কিংবা তৈল দিয়া পরিষ্কার করিবে এবং শুষ্ক কাপড় দ্বারা রীতিমত পরিষ্কার করিবে। সাবধান, আস্তে আস্তে ইহা করিবে, নচেৎ হস্তে লাগিবে। পূর্ব্বে সেই পরিষ্কৃত প্লেট দুই খানির মধ্যে নিম্নের প্লেটে বাজিবার ও চলিবার স্প্রিং দুইখানি বসাইবে। বসাইয়া উপরের প্লেটখানি চাপা দিয়া পিন বা চাকি, যাহা পূর্ব্বে খোলা ছিল, তাহা পুনরায় বদ্ধ করিবে। এবং ঘড়িতে যেরূপ দম দিতে হয়, সেইরূপ ভাবে দমের স্থানে চাবি দিয়া এক হস্তে হুইল ধরিবে এবং এক হস্তে দম দিবে কিন্তু সতর্ক হইবে। সমান বল না থাকিলে হস্তে লাগিবার সম্ভাবনা। দম পূরা দেওয়া হইলে ঐ হুইলের পার্শ্ব দিয়া লৌহশলাকা ইত্যাদি দ্বারা

আটকাইয়া রাখিবে। তৎপরে এক গাছি দড়ি দ্বারা স্প্রিং বাঁধিবে। এইরূপ দুই ধারেই করিবে। তৎপরে শলাকা আস্তে আস্তে খুলিবে। এইবার পিন্‌ গুলি খুলিয়া পুনরায় উপরের প্লেটখানি খুলিবে; খুলিয়া পূর্ব্ব চিহ্নিত চাকাগুলি যথাস্থানে পর পর সাজাইয়া প্লেটখানি পিন বা চাবি দ্বারা বদ্ধ করিবে এবং সমস্ত পিন আঁটা হইলে অঙ্গুলি দ্বারা হুইলগুলি ঠেলিয়া দেখিবে, চলে কিনা।

বাজিবার দিকে হস্ত দ্বারা দেখিবে। পূর্ব্বোক্ত কোদালের মত যন্ত্রটা, যাহাকে বাজাঘাট বলিয়াছি, তাহা বাজাইয়া দেখিবে, পর পর ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি বাজে কি না। যদি না বাজে বা বিশৃঙ্খলরূপে বাজে, তাহা হইলে পুনরায় সমুদয় চাকা খুলিতে হইবে। পালেটখানি যথাস্থানে বসাইবে, ক্রমে পালেটের উপর যে চাপাখানি ছিল, তাহাও যথাস্থানে চাপা দিবে। তৎপরে পেণ্ডুলেনের শিখটী বসাইয়া উহা প্ল্যাস দ্বারা বদ্ধ করিয়া দিবে, যেন না নড়ে। সমস্ত আঁটা হইলে চিম্‌টা ইত্যাদির দ্বারা সমস্ত হুইল পরীক্ষা করিবে।

তৎপরে অয়েলক্রস দ্বারা প্রত্যেক হুইলের দুই ধারে অর্থাৎ প্লেটের প্রত্যেক বিধে সামান্য সামান্য তৈল দিবে। এই তৈল যেন উপরে না থাকে, ছিদ্রে প্রবেশ করা চাই। এবং উহা যেন উপরে না বাহির হয়, এমন ব্যবস্থা করিবে। পরে ঘড়ির কেস পরিষ্কার করিয়া উহাতে কল আঁটিয়া দিবে।

এইবার সমতলভূমে রাখিয়া পেণ্ডুলেন লাগাইয়া ঘড়ি চালাইয়া দিবে, এবং ঘড়ি চলিলে কাণ দিয়া শুনিবে যে, বাম ও দক্ষিণদিকে দুলিবার কালীন উভয় দিকের শব্দ সমান হইতেছে কি না। যদি সমান না হয়, তাহা হইলে ঘড়ির কেসটি একবার বামদিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উচু করিবে, ইহাতে দোষ সংশোধন না হইলে ঐ ভাবে দক্ষিণে উচু করিবে। ইহাতে দেখিবে যে, যদি দক্ষিণে উচু করিলে উভয় শব্দ সমান হয়, তাহা হইলে পালেটের সংযুক্ত যে পিত্তলের তারটি আছে, উহাকে প্ল্যাস দ্বারা ঈষৎ বামদিকে বাঁকাইবে, আর যদি বামে উচু করিলে শব্দ সমান হয়, তাহা হইলে ঐ তারটী ঈষৎ দক্ষিণদিকে বাঁকাইবে, তৎপরে কেসে আঁটিয়া দিবে।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনাপনি ২।৩টী ঘড়ি খুলিয়া আঁটিলেই ঘড়ি মেরামত সহজেই শিক্ষা করিতে পারেন। ঘড়ির চাকাদি এদেশে উহার কিছুই তৈয়ারী হয় না। কোন হুইলের "দাঁড়" এমন ভাঙ্গিয়াছে যে, তাহা বদলাইতে হইবে, এইরূপ স্প্রিং ডায়েল ইত্যাদিও বদলাইতে হয়। এ সম্বন্ধে নমুনা

ত্যাদি কলিকাতা রাধাবাজারে ঘড়িওয়ালাদিগের নিকট পাওয়া যায়। ঘড়ি খুলিবার ও পরাইবার জন্ত ২।৩টী সরু ও মোটা স্ক্রু ড্রাইভার (Screw-drivor), একটি চিমটা (Trouzer), একটী ক্ষুদ্র সাঁড়াশী (Plus) ও একটী আইগ্লাস (Eyeglass) আবশ্যক। তাহার পর চুণ, গ্লিসিরিণ, এমারি কাগজ ইত্যাদি বহু দ্রব্যের আবশ্যক, তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে অন্ত শিরোনামা দিয়া বলিব। আমি ঘড়ি মেরামতের কাজ বহুদিন করিতেছি। একাজে আর সুখ নাই। কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় ঘড়ি মেরামত করা লোক দুই এক-জনকে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এ কাজে বিলক্ষণ অর্থোর্জ্জন হইত।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ আশ।

আমাদের বর্ষ-শেষ।

ভগবানের কৃপায় মহাজনবন্ধু তৃতীয় বর্ষ অতিক্রম করিল। ফাল্গুনে ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করিবে। বর্ষশেষে স্ব স্ব কাজের ফলাফল দেখিতে হয়। প্রথমবর্ষাপেক্ষা, দ্বিতীয়বর্ষে এবং দ্বিতীয়বর্ষাপেক্ষা তৃতীয়বর্ষে ইহার গ্রাহক ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথম বর্ষের পত্রিকা আদৌ আর মজুত নাই, দ্বিতীয়বর্ষের পত্রিকা ১০০ শত এবং তৃতীয় বর্ষের পত্রিকা ২০০ শত খণ্ড মাত্র মজুত আছে। এই তিন বৎসর নিয়মিত কাগজ লইতেছেন, এমন গ্রাহক খুব অল্প। এই জন্য প্রতি বর্ষের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও তিন বৎসরের খাতায় দেখিবেন, প্রতিবর্ষের নামের পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে; সংখ্যার ঠিক আছে, বরং বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইতেছে। একজ বোধ হয়, একেলী সংবাদ-পত্র নিয়মিত কেহ বহুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া পাঠ করিতে চাহেন না। আমাদের দোকানে এমন অনেক গ্রাহক আছেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের এবং তাঁহাদের তিন পুরুষের কারবার চলিতেছে। মহাজনবন্ধুর এমন গ্রাহক কেহ হইতেছেন কি?

বিগত বর্ষের আটমাস কাগজ লইয়াছেন, মহাজনবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিয়া টাকার আগাদা করা হইয়াছে; ভিঃ পিঃ যাইতেছে, তাহাও বলা হইয়াছে। তৎপরে ভিঃ পিঃ গিয়াছে, ইহার মধ্যেও শতকরা পাঁচ জন তাহা ফেরত দিয়াছেন। "ভিঃ পিঃতে কাগজ পাঠান" এই অনুমতি দিয়াও দুই ব্যক্তি

ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়াছেন। ইহাদের অভদ্র ব্যবহারে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। "কাগজ চাই না" ইহা আমরা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে, আনন্দের সহিত আমরা মহাজনবন্ধুর গ্রাহক-শ্রেণী হইতে তাঁহার নাম কর্ত্তন করি। আমাদের ধারণা গুণেই মানুষ পূজা পায়। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—পরিশ্রম আমাদের সঙ্গের থাকুক, তাহা হইলে আমাদের ভাবনা কি? তখন আমরা শত শত মহাত্মার কৃপাপাত্র হইয়া সাহায্য পাইব।

মহাজনবন্ধুর এই তিন-বৎসর মধ্যেই এদেশী রাজা, মহারাজা, জমিদার এবং গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত অনেক ধনবান, বিদ্বান, সাজ্জন মহাত্মাগণ কৃপা করিয়া ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। ইহা এদেশী সংবাদ-পত্রের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এদেশীয় স্বদেশহিতৈষী ও যথার্থ যাঁহারা স্বার্থপর নহেন, এমন সমুদয় সংবাদ-পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরাও সরল মনে মহাজনবন্ধুর অতি উচ্চাদের সমালোচনা এবং মহাজনবন্ধুর অনেক প্রবন্ধও স্ব স্ব পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক ইহাদের কৃপাতেই ক্ষুদ্র মহাজনবন্ধু সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহাদের আমরা পূজা করিতেছি। বেরজাবাপর সম্পাদক না থাকিলে সেদেশে সত্যের আলোক জ্বলে না। যদি এদেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতি পরিণামে আরও বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ঐ সকল মহাত্মাদের কৃপাতেই হইবে। এই সময় মহাজনবন্ধুর আকার বৃদ্ধি করিবার সুযোগ আসিয়াছে, এবং আমরাও এজন্য অর্থব্যয়ে প্রস্তুত আছি; কিন্তু মহাজনবন্ধুতে যে শ্রেণীর লেখা বাহির হয়, সে শ্রেণীর লেখক এদেশে প্রায় নাই বলিলেই হয়। জন কয়েক বিলাত-ফেরত কৃষি-শিল্পের অধ্যাপক সদাশয় মহাত্মা এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের ছাত্রেরা ও জন কয়েক দেশী মহাজন ভিন্ন এ শ্রেণীর পত্রে প্রবন্ধ লিখিবার উপযুক্ত লেখক পাওয়া যায় না। যাঁহাদের কথা বলা হইল, তাঁহারাও স্ব স্ব কাজে সময়ে সময়ে বড়ই ব্যস্ত থাকেন, এজন্য তাঁহারাও রীতিমত ভাবে লিখিতে পারেন না। এমন কি এই জন্য অনেক "ক্রমশঃ" প্রবন্ধ শেষে সম্পূর্ণ হয় না। আমরা আগামী বর্ষ হইতে নিয়ম করিতেছি যে, ক্রমশঃ প্রবন্ধ আর মুদ্রিত করিব না। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইলে প্রতিমাসে নূতন শিরোনাম দিয়া লিখিত হইবে। এই সকল কারণে চতুর্থ বর্ষেও ইহার আকার বৃদ্ধি করিলাম না।

প্রতিমাসে নমুনার গ্রাহক অনেক, ইঁহারা অবাধে নমুনা চাহেন। এক সংখ্যা পাঠেই ইহাদের প্রবল তৃপ্তি শান্তি লাভ করে; কিন্তু বুঝেন না যে,

নমুনা পাঠাইতে ডাকটিকিট লাগে। আমরা স্বদেশের পয়সা খরচ করিয়া পত্রিকা মুদ্রিত করিব, শেষে পাঁচটির কড়ি দিয়া বিদায় করিব। দেশের লোক, দেশের লোকের এই দুর্দশা করাইতে ভালবাসেন, তাই বেহায়ার মত বোকা সাজিয়া কেবল নমুনা চাহেন। সর্বদা স্বদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যে কোন কাজ করিতে অভ্যাস করা উচিত, তাহা হইলে পরিণামে আমাদের দেশের কল্যাণ হইবে। নমুনা চাহিলেন, ডাকটিকিটও দিলেন না, এইরূপ সহস্র সহস্র ব্যক্তিরা যদি আপনার মত কেবল 'বিনা-ডাকে' নমুনা চাহেন, তাহা হইলে পরিণামে এদেশী সংবাদ-পত্রের কি দুর্দশা হয়, ভাবুন দেখি? এই সকল কারণে আমরাও ইচ্ছানুসারে এ বৎসর নমুনা অনেক দিয়াছি এবং অনেক দিই নাই। কেন না, সকলেই যে মন্দ উদ্দেশ্যে নমুনা চাহেন, তাহাও নহে।

এই বৎসর মহাজনবন্ধুর প্রবন্ধ-সংগ্রহের জন্য অনেক স্থান ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, এজন্য অনেক টাকা রেল কোম্পানীকে দিতে হইয়াছে। কাজেই এ বৎসর ছবি প্রায় দেওয়া হয় নাই। ইহার ঠিকানা ১নং চিনিপটী, পোষ্ট বড়বাজার ছিল। এই ঠিকানায় আমাদের বহুদিনের চিনির কারবার রহিয়াছে। এ বৎসর হইতে আমাদের বাড়ীর ঠিকানা ২৫ নং গোলোকদত্তের লেন, পোষ্ট হাটখোলা, কলিকাতা; এই ঠিকানায় মহাজনবন্ধুর ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ পাল এবং ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ পাল পূর্ব্বের মত সোৎসাহে কার্য্য করিতেছেন। এই মাস হইতে মহাজন বন্ধু ৫ পয়সার পোষ্টে যাইবে; তাহার ব্যবস্থা জেনারেল পোষ্ট মাষ্টার কৃপা করিয়া দিয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। আগামী বর্ষে আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিব। মহাজনবন্ধু যাহাতে প্রতিমাসে সুনিয়মে বাহির হয়, সে পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিব।

এই পত্রের মূল্য সাধারণ সংস্করণ প্রতি বর্ষে ১৲ টাকা হিসাবে, রাজ-সংস্করণ প্রতিবর্ষে ২৲ টাকা হিসাবে; অসমর্থপক্ষে ১৲ টাকা হিসাবে। মূল্য অগ্রিম দিতে হয়। এদেশে এমন অনেক কাজের লোক আছেন, তাঁহারা অবসরে সুন্দর কাজ করেন; যথা কৃষক বা কল কারখানার সর্দার বা টেণ্ডেল ইত্যাদি। ইহাদের নিকট বসিয়া যদি কেহ এদেশী লেখক প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের নিকট পাঠান, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতি প্রবন্ধের নিমিত্ত ৫৲ করিয়া পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

সংবাদ-পত্র পরিচালনা করা আমাদের উপজীবিকা নহে—স্বদেশসেবার জন্য এই রোগে আমরা পড়িয়াছি। এজন্য যাহা খরচ হয়, যথা একজন লোকের বেতন, প্রেস ও কাগজ ইত্যাদির খরচা উঠিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা ইহার উন্নতিকল্পেই ব্যয়িত হয়। অতএব আমাদের করযোড়ে নিবেদন এই যে, স্বদেশে এই শ্রেণীর পত্রিকা আরও ২।১০ খানা বাহির হউক, এই কামনা করিয়া ইহার গ্রাহক থাকিবেন, নচেৎ উপরোধে বা অনুরোধে যেন কেহ ইহা না লয়েন। যিনি এ পত্র পছন্দ না করিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পত্র দ্বারা জানাইবেন; ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া অনর্থক আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

সংবাদপত্র প্রাপ্তি-স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা হৃদয়ে জানাইতেছি যে, তৃতীয়বর্ষ মহাজনবন্ধুর পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত সংবাদ-পত্রগুলি পাওয়া গিয়াছে।

সাপ্তাহিক পত্র। (১) হিতবাদী (২) বঙ্গবাসী (৩) বসুমতী (৪) সঞ্জীবনী (৫) সময় (৬) এডুকেশন গেজেট (হুগলী হইতে) (৭) পল্লীবাসী (কালনা) (৮) New India (৯) মেদিনীবান্ধব (১০) নীহার (কাঁথি হইতে) (১১) মানভূম (১২) রঙ্গপুর দিক্‌-প্রকাশ (১৩) রংপুর বার্ত্তাবহ (১৪) হিন্দুরঞ্জিকা (রাজসাহী) (১৫) বিকাশ (বরিশাল হইতে) (১৬) উড়িয়া ও নব সংবাদ (উড়িয়া ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত, বালেশ্বর হইতে) (১৭) যশোহর (১৮) রত্নাকর (আসানসোল হইতে)।

মন্তব্য। হিতবাদী, বঙ্গবাসী, বসুমতী ইহারা গ্রাহকের বলে খুবই বড়। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ে এই তিন পত্র দ্বারা বঙ্গভাষার গ্রাহক বৃদ্ধি যথেষ্ট হইয়াছে। ইহাদের উপহার সুখে থাকুক এবং ইঁহাদের জয় জয় হউক। এই তিনের মধ্যে হিতবাদী, বঙ্গবাসী কুলীন; বসুমতী মৌলিক বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে লেখার সুন্দরত্ব, প্রবন্ধের নূতনত্ব এবং গভীর গবেষণার লেখা যদি কেহ পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, সম্পাদকের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব যদি কেহ শিখিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এডুকেশন গেজেট, সঞ্জীবনী এবং পল্লীবাসীর গ্রাহক হইতে হইবে। "সময়" ঠিক পাই না। New India কি জানি

এত সংখ্যা কেন দিয়াছিলেন? মেদিনীবান্ধব ও নীহার এ বৎসর স্থানীয় দুর্ভিক্ষের ও চোর ডাকাতের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এই দুই পত্রের সম্পাদকদ্বয়ের লেখার ধরণে বেশ জানা যায়, ইহারাও উপযুক্ত সম্পাদক। মানভূম গত বর্ষাপেক্ষা একটু চাঙ্গা হইয়াছেন। রংপুরের সংবাদপত্রদ্বয়ের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। হিন্দুরঞ্জিকা ধর্ম্মের সাপ্তাহিক। বিকাশ পূর্ব্ববর্ষের ন্যায় নিয়মিত পাই পাই। উড়িয়া ও নব সংবাদ এ বৎসর হইতে অর্দ্ধাঙ্গ ইংরাজীতে হইয়াছে, নচেৎ অবস্থা পূর্ব্ববৎ। যশোহর সংপ্রতি পাইয়াছি, লেখা ভাল। রত্নাকরের ভিতর হিংসায় হাঙর কুম্ভীরের কথা পড়িলে সম্পাদক মহাশয়কে যুবক বলিয়া বোধ হয়; রত্নাকরের কয়লার খনির কথা পড়িতে ভাল লাগে। আমাদের মফঃস্বলের সহযোগী হুজুরদিগকে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি যে, দোহাই প্রভুরা কৃপা করিয়া স্ব স্ব স্থানীয় সংবাদ এবং সেই জেলার কৃষি, শিল্প, কল কারখানা ও স্থানীয় বাজার দর ইত্যাদির প্রবন্ধ যেন অধিক পরিমাণে দেন। কারণ, ইহাতে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। রাজনীতিতে আর কিছু হবে না। রাজা নিজের নীতি বেশ বুঝেন, আমরা রাজা না হইলে, আমাদের রাজনীতি রাজাকে শিখাইতে যাওয়া বৃথা।

পাক্ষিক পত্র। (১৯) প্রচার (২০) ফরিদপুর হিতৈষিণী (২১) ছাত্র (২২) শান্তি—মাদারিপুর হইতে।

মন্তব্য। প্রচার সংপ্রতি পাইয়াছি, ইহা খৃষ্টানী কাগজ, সম্পাদক বাঙ্গালী। লেখায় খুঁৎ ধরিয়া প্রচার বেশ স্পষ্ট কথা বলিতে পারেন। সম্পাদকের ক্ষমতা প্রতি কথায় প্রকাশ পায়। "বঙ্গবাসীর" হরি বল ভাই! পল্লীবাসীর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ! সঞ্জীবনীর ওঁ তৎসৎ বা জয় ব্রহ্ম নিরাকার অথবা সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা এবং প্রচারের যীশু এই চারিসুরের চারি তার আমাদের কাণে "এক রকম" কন্‌সার্টপার্টীর নানা বাঁশীর মত এক সুরে লাগে ভাল। তবে পূর্ব্বোক্ত তিনজনে নিজেদের ইষ্ট নাম আর বেশী ফুঁকরান না। প্রচার নিজের ইষ্ট নাম প্রচারের জন্যই বোধ হয় জন্মিয়াছেন। হিন্দু আমরা, ইষ্ট নামই হইল আমাদের গুরুমন্ত্র; গুরুমন্ত্র মুখে বলিতে নাই। এডুকেশন গেজেটে কি ভাব দেখেন? ফরিদপুর হিতৈষিণী, ছাত্র ও শান্তির লেখা মন্দ নহে; কাগজ খুলিলেই পাঠ শেষ হয়।

মাসিক পত্র। (২৩) প্রবাসী (২৪) নবপ্রভা (২৫) পূর্ণিমা (২৬) ভিষক্‌দর্পণ (২৭) ভারত সুহৃদ (হিন্দিতে) (২৮) তত্ত্বমঞ্জরী (২৯) দারোগার

দপ্তর (৩০) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (৩১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (৩২) বার্ত্তা (৩৩) প্রকৃতি (৩৪) উৎসাহ (৩৫) ইস্‌লাম প্রচারক (৩৬) বঙ্গভাষা (৩৭) পল্লিসুহৃদ (৩৮) পন্থা (৩৯) অন্তঃপুর (৪০) সনাতন ধর্ম্মপতাকা (হিন্দিতে) (৪১) বসুধা (৪২) জন্মভূমি (৪৩) তাম্বুলি-সমাজ।

মন্তব্য। প্রবাসী এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত, ইনি মাসিক পত্রের রাজা। ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিষ; পরিণামে এই মাসিক পত্র এই শ্রেণীর সমুদয় মাসিক পত্রের গ্রাহক টানিয়া লইবে। এই পত্রিকার গ্রাহক হিতবাদী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রের মত হওয়া উচিত, তবে ত বাঙ্গালীর মান বৃদ্ধি হইবে! বাঙ্গালী মাত্রেরই ইহার প্রচারে যত্নবান হওয়া উচিত। প্রবন্ধে, চিত্রে, মুদ্রাঙ্কণে এবং আকারে প্রবাসী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। নবপ্রভার কোন কোন প্রবন্ধ পাঠ করিতে মস্তিস্কের বিলক্ষণ পরিশ্রম হয়। পুর্ণিমার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ভাল। দারোগার দপ্তর একাদশ বর্ষকাল নিয়মিত রূপে বাহির হইয়া এক বর্ষকাল বিশ্রামানন্তর পুনরায় ১৩১১ সালের বৈশাখ হইতে নূতন উৎসাহে বাহির হইবে, এরূপ আশা পাইয়াছি। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা বড়লোক মহাপ্রভুদের কাগজ, সমস্ত পাই না; প্রাচীন সাহিত্য সংগ্রহে ইহা অদ্বিতীয়। ভিষক-দর্পণ বঙ্গভাষায় ডাক্তারি সম্বন্ধীয় অদ্বিতীয় পত্র; ইহা না পড়িলে জীবন অসম্পূর্ণ থাকে। তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ পাঠে শান্তি পাওয়া যায়, অসৎবৃত্তি কিছুতেই জাগে না। বার্ত্তা দুই এক সংখ্যা পাইয়াছি। প্রকৃতি দুই তিন মাস পরে সমস্ত পাই বটে, প্রবন্ধের নূতনত্ব দেখি না; সমালোচনা প্রবন্ধটী একবার কিছু নূতন ধরণের দেখিয়াছিলাম। উৎসাহ বহুদিন পাই নাই। ইস্‌লাম প্রচারক মুসলমানধর্ম্মের ভাল কাগজ; মুসলমান সম্পাদক মহাশয়েরা এবং শুনিলাম, আরও অনেক সদাশয় জ্ঞানবান বিদ্বান্ মুসলমান মহাত্মারা লেখক আছেন,—তাঁহারাও বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে মুক্তহস্ত। এই সকল মহাপুরুষদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। মুসলমান এক সময় আমাদের রাজা ছিলেন। আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালা ত আমরা লিখিবই! ইহারা যে এক সময়ের প্রজার বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে অদ্যাপি অকাতরে পরিশ্রম করিতেছেন, এজন্য বঙ্গভাষা অবশ্য ইহাদের নিকট চিরঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের নিকট আমরা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পার্সী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ দেখিতে ইচ্ছা করি। নচেৎ সত্যপীরের সিন্নি আমরাও দিয়া থাকি, খোদা আল্লাকে আমাদের ইষ্টমন্ত্রেও পাই।

বঙ্গভাষা ও পল্লিসুহৃদ আমরা এক সংখ্যা করিয়া পাইয়াছি। পন্থার প্রবন্ধ চিন্তা করিয়া পড়িতে হয়। এই পত্রে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি সুন্দর সুন্দর যোগ-যাগের প্রবন্ধ লিখিত হয়। অন্তঃপুর মাঝে মাঝে পাই। তত্ত্ব-মঞ্জরী ভগবান রামকৃষ্ণ ধর্ম্মের পত্রিকা। ভারত সুহৃদ্ এবং সনাতন ধর্ম্ম পতাকায় হিন্দুস্থানী কবিদিগের কবিতা পাঠ করিতে বেশ লাগে। বসুধা এবং জন্মভূমি পড়িতে কষ্ট নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাসী কল্পতরু; ইহারা ঘাস। বঙ্গবাসীর কি এই জন্মভূমির পরিণাম! তাম্বুলি-সমাজ মাসিক পত্র ঠিক নিয়মিত পাইয়াছি; এ পত্রে কেবল জাতি-বিশেষের কথা লিখিত হয়। ইহা পাঠে সম্পাদকের স্থির কর্ত্তব্য বুঝা গেল না। দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম সম্পাদক বলিয়া দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা বারইয়ারী দ্বারা পরিচালিত বোধ হইল। অতএব সম্পাদক-দ্বয়ের নাম তুলিয়া দিয়া, উহাকে তাম্বুলি-সভা হইতে সম্পাদিত, লেখা উচিত।

কৃষি শিল্প সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। (৪৪) কৃষক, ৫৬ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (৪৫) Gardener's Magazine, Gopal Nagore Road, Alipore, Calcutta. (৪৬) শিবপুর কলেজ, P. O. Sibpur. Calcutta. (৪৭) শিল্প ও সাহিত্য, ১৭ নং শ্রীনাথদাসের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা। (৪৮) কমলা, বেচু চাটুর্জ্জের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভগবান করুন, এই শ্রেণীর পত্রিকা যেন এদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এই শ্রেণীর কাগজের পাঠক যত বৃদ্ধি হইবে, এদেশে ততই মঙ্গলের সুবাতাস বহিবে। ধর্ম্ম প্রচার এদেশে খুবই হইয়াছে। আত্মনিগ্রহ বা ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া, উর্দ্ধবাহু, শলাকার কণ্টকে শয়ন, অনাহার, কদাহার প্রভৃতি করিয়া দেহকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়া, "ঈশ্বর দেখা দাও" বলিয়া তন্ময় হইয়া "তাঁহাকেও" এদেশের অনেক লোকে পাইয়াছেন। এখন আমাদের পয়সার জন্য ঐরূপ উর্দ্ধবাহু, অনশন, অর্দ্ধাশন, কদাহার, সত্য-বাদী ইত্যাদি ব্রতগুলি "হা পয়সার" "যো পয়সার" ভিতর প্রবেশ করাইয়া ঐরূপ আত্মনিগ্রহ করিতে হইবে। তবে ত আমরা "মহাজন" হইব। শিল্প ও সাহিত্য এবং কমলা আমরা একখানা করিয়া পাইয়াছি।

পরিশেষে আমরা এই বলিতেছি যে, যে সকল পত্র পত্রিকা আমরা একখানা বা সময়ে সময়ে পাইয়াছি, তাঁহাদিগকেও আমরা মহাজনবন্ধু ঠিক সেই কাঁটার মাপেই দিয়াছি।